# এগ্রোবেসড ফুড-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম ভাষণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন -'বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# এগ্রোবেসড ফুড-১
# Agrobased Food-1

## প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

## নবম ও দশম শ্রেণি


**লেখক**

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
মোহাম্মদ রহিদুল আলম
মো: জসিম উদ্দিন মুজাহিদ
প্রকৌশলী মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
মো: নুরুজ্জামান
মনিরা শিকদার (সমন্বয়কারী)

**সম্পাদক**

ড. মো: আসলাম আলী
অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত


---


**[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]**



(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

**ডিজাইন**

**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড**


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---


মুদ্রণে:

# প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

**প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম**
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# সূচিপত্র

## এগ্রোবেসড ফুড-১


| প্রথম পত্র (নবম শ্রেণী) | | | দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণী) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অধ্যায় | শিরোনাম | পৃষ্ঠা | অধ্যায় | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
| প্রথম | এগ্রোবেসড ফুড কাজে নিরাপত্তা অনুশীলন | ১-২৭ | প্রথম | গম ও ভুট্টার পরিচিতি, পুষ্টিমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ১৩৩-১৮২ |
| দ্বিতীয় | কৃষি ফসল, খাদ্য ও পুষ্টি | ২৮-৪০ | দ্বিতীয় | আখের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও উৎপাদিত খাদ্য | ১৮৩-১৯৪ |
| তৃতীয় | ধানের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ৪১-৭২ | তৃতীয় | মশলার পরিচিতি, পুষ্টিমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ১৯৫-২১০ |
| চতুর্থ | ডালের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ৭৩-৯২ | চতুর্থ | মাশরুমের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও উৎপাদিত খাদ্য | ২১১-২২৯ |
| পঞ্চম | তেল বীজের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ৯৩-১১৪ | পঞ্চম | তাল ও নারিকেলের পুষ্টিমান ও উৎপাদিত খাদ্য | ২৩০-২৫৩ |
| ষষ্ঠ | আলুর পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ১১৫-১৩০ | | | |

# এগ্রোবেসড ফুড-১

# Agrobased Food-1

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড: ৬১১৩

# প্রথম অধ্যায়

# এগ্রোবেসড ফুড কাজে নিরাপত্তা অনুশীলন

# Safety Practices in Agrobased Food Processing

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে একটি নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবনযাপনের কামনা প্রতিটি মানুষের। আর স্বচ্ছলতার জন্য প্রয়োজন কাজ, করা। যেকোনো কাজ শুরু করার আগেই প্রয়োজন কাজের পরিবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিল্পকারখানায় নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার পূর্বশর্ত হলো নিরাপত্তা বিধিগুলোর যথাযথ অনুশীলন ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। দুর্ঘটনা কখনও বলে কয়ে আসে না, অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হয়। ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। পূর্ব থেকে নিরাপত্তা বিধিগুলো জেনে যথাযথভাবে পালন করলে অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে আমরা সহজেই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি।

### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ করতে পারব।
- জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব।
- বিপদ ও ঝুঁকি বিষয়ে রিপোর্ট করতে পারব।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভাতে পারব।

## ১.১ কার্যক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা নীতিমালা

কর্মক্ষেত্রকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেক কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে কর্মীরা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যথা-

- যথাযথ আসন, আলোক ও ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- যথাযথ বহির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে হবে।
- মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট এবং লকার সুবিধা থাকতে হবে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বা ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

## কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নীতিমালা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো কার্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে থাকতে হবে। যথা-

- কারখানার অভ্যন্তরে নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক চিহ্ন/চিত্র দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে।
- কারখানার বিভিন্ন বর্জ্য নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।
- কাজ শেষে মেশিন ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে যথাস্থানে রাখতে হবে।
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (Occupational Safety and Heath বা OSH) বিধিসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

### ১.১.১ ওএসএইচ (OSH) বিধিসমূহ

- কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- কর্মীদের অনিরাপদ কাজ প্রত্যাখান করার অধিকার নিশ্চিত করা।
- কর্মীদের যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করার ব্যবস্থা করা।
- কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বা Personal Protective Equipment (PPE) সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে কোন ধরণের ঝুঁকি না থাকার বিষয় নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে OSH সম্পর্কে কর্মীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

### ১.১.২ ওএসএইচ (OSH) নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা

- কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রাখা।
- কর্ম পরিবেশের কারণে কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ করা।
- কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম পরিবেশ তৈরি করা।
- সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় কমিয়ে আনা।

### ১.১.৩ কার্যক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

প্রত্যেক কর্মীরই কাজের পূর্বে কর্মক্ষেত্রে তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি সম্পর্কে ভালোমত ধারণা থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মীর দায়িত্ব সম্পর্কে যে সকল প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক তা নিচে উল্লেখ করা হল-

- কাজ শুরুর আগে কার্যক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল নিয়ম কানুন জেনে নেওয়া।
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে নির্ধারিত নির্দেশনা যথাযথভাবে জানা ও মানা।
- কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানা না থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দক্ষ/অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জেনে নেওয়া।
- কাজের সময় যথাযথ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা এবং ব্যবহার শেষে যথাস্থানে রেখে দেওয়া।
- জরুরি চলাচলের রাস্তা, বহির্গমণ রাস্তা ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেওয়া।
- ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি লক্ষ্য করা মাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।

- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা।
- কর্মক্ষেত্রে ধূমপান না করা।

### ১.১.৩ রেজিস্টার মাফিক কর্ম

কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রতিদিনের কর্ম তালিকার একটি লগ বুক রেজিস্টার মেনে কাজ করার পদ্ধতিকে রেজিস্টার মাফিক কর্ম বলে। এই রেজিস্টার বুকে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজের তালিকা দেওয়া থাকে। এছাড়াও সকল কাজের জন্য মান সম্পন্ন কর্ম পদ্ধতির তথ্য সম্বলিত কর্মতালিকা (Job Sheet) দেওয়া থাকে। কর্মীদের এই কর্মতালিকা দেখে তাদের নিজ নিজ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হয়। প্রতিটি কাজ সম্পাদনের জন্য তথ্যের শীটে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ, প্রয়োজনীয় PPE ও কাজের ধারা উল্লেখ থাকে।

## ১.২ বেসিক সেফটি এবং সিকিউরিটি

কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তি, যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত পণ্যসহ সব কিছুকে সম্ভাব্য বিপদ, ঝুঁকি বা হুমকি থেকে নিরাপদে রাখার জন্য পূর্বপ্রস্তুতিমূলক সকল কর্মকান্ডকে উক্ত কর্মক্ষেত্রের সিকিউরিটি বলে। অন্যদিকে, সেফটি হল উক্ত কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরণের সম্ভাব্য বিপদ বা হুমকি থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা বা পূর্বপ্রস্তুতি।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোন কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের প্রত্যেককে সম্ভাব্য বিপদ বা ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার জন্য যে কর্মপরিকল্পনা থাকে সেটাই ঐ কর্মীদের জন্য সেফটি। আর সিকিউরিটি হল কর্মক্ষেত্রের বাইরে থেকে সম্ভাব্য যে কোন ধরণের আক্রমণ বা সংঘর্ষ থেকে পুরো কর্মক্ষেত্র ও কর্মীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। অতএব, সিকিউরিটি হল কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেক কর্মীর সেফটি নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত সকল ধরণের পূর্বপ্রস্তুতি।

### ১.২.১ বেসিক সেফটি ট্রেনিং

বেসিক সেফটি ট্রেনিং মূলত কর্মীদেরকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া। কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নিয়মিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেসিক সেফটি ট্রেনিং এর প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে-

**দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য:** দেশে শিল্প কারাখানাসমূহের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

**স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য:** পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকসহ সকলকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা এবং এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা।

## ১.২.২ ফায়ার বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ট্রেনিং

আগুন নিভানোর জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার পদ্ধতির ধাপসমূহ দেওয়া হল -

চিত্র ১.১: অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

- ন্যূনতম ১.৮ মিটার দূর থেকে আগুনের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

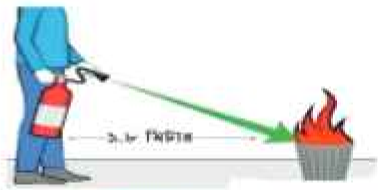


- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি শক্ত করে ধরতে হবে এবং লক পিন খুলতে হবে।

- আগুনের উৎসের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

- একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঘুরিয়ে স্প্রে করতে হবে।

**কর্মক্ষেত্রে আগুন লাগলে যা করতে হবে-**

- আগুন দেখার সাথে সাথে ফায়ার ফাইটিং এর যে সরঞ্জাম আছে তা দিয়েই দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে হবে।

২০২৪

- কর্মক্ষেত্রের সকলকে যত দ্রুত সম্ভব আগুন লাগার কথা জানিয়ে দিতে হবে অথবা আগুন লাগার সাথে সাথে ফায়ার এলার্ম বাজাতে হবে।
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে এবং স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

### ১.২.৩ হ্যাজার্ড ও হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন

**হ্যাজার্ড (Hazard):** হ্যাজার্ড বা আপদ হলো এমন কোনো উৎস বা বস্তু যার মাধ্যমে অসুস্থ হওয়া ও সম্পদ বা পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এককথায় হ্যাজার্ড হলো উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত পণ্যে ক্ষতিকর দ্রব্যাদির সম্ভাব্য উৎস।

**হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন:** হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন হচ্ছে এক ধরণের কর্মসূচী যা প্রধানত কর্মক্ষেত্রে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কিত ক্ষতি ও অসুস্থতা থেকে কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা। এই পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রের সকল কর্মীকে সম্ভাব্য বিপদের উৎস বা বস্তু ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ও বোঝার অধিকার নিশ্চিত করে।

### ১.২.৪ ঝুঁকি (Risk)

ঝুঁকি হলো সেই পরিস্থিতি, যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীর শারীরিক ক্ষতি করতে সক্ষম। ঝুঁকি ধারণাটি প্রায়শই বিপদের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

### ১.২.৫ ঝুঁকির ধরণ

কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকির ধরণগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-

ক) **পরিবেশগত ঝুঁকি:** কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণে কর্মীদের যে ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় তাকেই পরিবেশগত ঝুঁকি বলে। পরিবেশগত ঝুঁকি আবার তিন ধরণের হতে পারে, যেমন- ভৌত ঝুঁকি, রাসায়নিক ঝুঁকি ও জৈবিক ঝুঁকি।

খ) **শারীরিক ঝুঁকি:** সাধারণত কর্মক্ষেত্রে কর্মীরা শারীরিকভাবে যেসব হ্যাজার্ডের সম্মুখীন হয়, সেসব হ্যাজার্ডকে ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড বলে। যেমন- অত্যধিক তাপ বিকিরণ, উচ্চ শব্দ, উচ্চ তাপমাত্রা, ভাইব্রেশন, অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন, অপর্যাপ্ত আলো ইত্যাদি।

গ) **রাসায়নিক ঝুঁকি:** যে সকল রাসায়নিক উপাদান একজন মানুষের শরীরে ক্ষতি বা বিপদ ঘটাতে, পারে তাদেরকে রাসায়নিক হ্যাজার্ড বলে।-যেমন হালকা কুয়াশা বিষাক্ত গ্যাস্ বাষ্প ধুলা উগ্র বা ঝাঁঝালো গন্ধের ধোঁয়া ইত্যাদি শরীরে প্রবেশ করলে বা ত্বকে লেগে গেলে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

ঘ) **জৈবিক ঝুঁকি:** জীবন্ত বস্তু থেকে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় সেটি হলো জৈবিক ঝুঁকি।- যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, ছত্রাক, পোকামাকড়, উদ্ভিদ, প্রাণী বা পাখির সাথে সম্পকযুক্ত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি। এসবের সংস্পর্শে বা আক্রমণের ফলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

ঙ) **কর্মদক্ষতার ঝুঁকি :** কর্মক্ষেত্রে সাধারণত কর্মদক্ষতার যে সকল ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয় তা হলো- কর্মক্ষেত্র বা যন্ত্রপাতির অনুপযুক্ত ডিজাইন, অসঙ্গত লিফটিং, দুর্বল দৃশ্যমান অবস্থা, অসামঞ্জস্যপুর্ণ বা অকওয়ার্ড অবস্থা, দুর্বল ফার্নিচার ডিজাইন, অতিরিক্ত কম্পন এবং গতির পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি।

চ) **নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি:** এগুলো এমন ধরনের ঝুঁকি যা কর্মস্থল থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা উচিত। ব্যক্তির নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে এমন অনিরাপদ দড়ি, ক্যাবল বা তার, ক্রটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি, অনিরাপদ উচ্চতা ইত্যাদির কারণে যেসব ঝুঁকির সৃষ্টি হয় সেগুলোকেই নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বলে।

### ১.২.৬ হ্যাজার্ড চেকলিস্ট

কার্যক্ষেত্রের প্রত্যেকটি অবস্থানের অনিরাপদ ও বিপদসংকুল অবস্থার এবং উক্ত স্থানের যন্ত্রপাতিতে কাজ করার সময় যার দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; সম্ভাব্য দুর্ঘটনার এমন সব কারণকে ধারাবাহিকভাবে তালিকাবদ্ধ করাকে কর্মস্থলের আপদ তালিকা (Hazard checklist) বলে। সাধারণত আপদ তালিকা প্রণয়নে যেসব বিষয়ে সমীক্ষার প্রয়োজন হয় সেগুলো হল-

- হাউজকিপিং
- মেশিন হ্যাজার্ড
- আগুন বা ফায়ার হ্যাজার্ড
- প্রটেকটিভ ডিভাইস
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
- টুলসমূহ

### উৎপাদনশীল শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি আপদ তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

প্লান্ট বা বিভাগের নাম : ..................... তারিখ : .............

এ বিবরণীতে সন্নিবেশিত কার্যকলাপ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যবলির মধ্যে যেগুলো সন্তোষজনক সেগুলোর জন্য নির্ধারিত স্থানে টিক (√) চিহ্ন এবং যেগুলো অসন্তোষজনক সেগুলোর জন্য নির্ধারিত স্থানে ক্রস (×) চিহ্ন দিয়ে বিপজ্জনক কর্মবিবরণী মুল্যায়ন করতে হবে।

| বিবরণী | ফলাফলের চিহ্ন | বিবরণী | ফলাফলের চিহ্ন | বিবরণী | ফলাফলের চিহ্ন |
|---|---|---|---|---|---|
| **১. অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা** | | **২. হাউস কিপিং** | | **৩. মালামাল স্থানান্তরের** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **যন্ত্রপাতি** | |
| ক. নির্বাপণী যন্ত্রসমূহ | | ক. যন্ত্রপাতির আশপাশ, মেঝে, রাস্তা, উঁচু স্থান | | ক. এলিভেটর | |
| খ. হোজ পাইপ, স্প্রিংকলার হেড | | খ. মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ | | খ. ক্রেন | |
| গ. প্রবেশ পথ, সিঁড়ি | | গ. আলো-বাতাস | | গ. কনভেয়রস্ | |
| ঘ. দাহ্য বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ | | ঘ. বর্জ্য অপসারণ | | ঘ. ক্যাবল, রোপ, চেইন | |
| **৪. টুলস** | | **৫. বিজ্ঞপ্তি ফলক** | | **৬. প্রেসার ইকুইপমেন্ট** | |
| ক. পাওয়ার টুলস | | ক. পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় | | ক. স্টিম ইকুইপমেন্ট | |
| খ. হ্যান্ড টুলস | | খ. নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন | | খ. এয়ার রিসিভার অ্যান্ড কম্প্রেসর | |
| গ. টুলস সংরক্ষণ | | গ. পর্যাপ্ত আলোক ব্যবস্থা | | গ. গ্যাস সিলিন্ডার ও হোজ পাইপ | |
| **৭. যন্ত্রপাতি সমূহ** | | **৮. অনিরাপদ কার্যকলাপ** | | **৯. প্রাথমিক চিকিৎসা** | |
| ক. ঘূর্ণায়মান ও চলমান যন্ত্রাংশের গার্ড | | ক. যন্ত্রপাতির অনিরাপদ গতি | | ক. ফাস্ট এইড বক্স এবং কক্ষ | |
| খ. বেল্ট, পুলি, গিয়ার, শ্যাফট্ | | খ. বিপজ্জনক স্থানে ধূমপান | | খ. রোগী বহন খাট/ট্রলি | |
| গ. অয়েলিং, ক্লিনিং | | গ. হাসি ঠাট্টা ও রঙ্গ ব্যঙ্গ | | গ. প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র | |
| ঘ. মেইনটেন্যান্স | | ঘ. মেশিন গার্ড অকার্যকরকরণ | | | |
| **১০. ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম** | | | | | |
| ক. গগল্‌স, | | গ. গ্লাভস | | ঙ. নিরাপত্তামূলক | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| হ্যান্ডশিল্ড, হেলমেট | | | | পোশাক | |
| খ. নিরাপত্তামূলক জুতা | | ঘ. গ্যাস মাস্ক/বায়ু ফিল্টার মাস্ক | | | |

## ১.২.৭ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

**পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH):** পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা হলো কাজ বা চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণবিষয়ক নিয়ম-শৃঙ্খলা বা নিয়মনীতি। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্তকরণ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রদান করা। অর্থাৎ যারা কর্মপরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া OSH এর প্রধান উদ্দেশ্য।

## ১.২.৮ জরুরি প্রস্থান পদ্ধতি

- সকল কার্যক্রম দ্রুত বন্ধ করতে হবে।
- নিকটস্থ জরুরি প্রস্থান চিহ্ন দেখে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হবে।
- হ্যাজার্ড ও ঝুঁকি থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে।
- দূর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিপূর্ণ বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় প্রবেশ করা যাবে না।

## ১.২.৯ ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট

ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মীর স্বাস্থ্যগত বিষয়, যা কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- অতিরিক্ত শব্দ, ক্ষতিকর রাসায়নিক ধোঁয়া ইত্যাদি। এই সকল ক্ষতিকর পরিবেশ একজন কর্মীর স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই এই সকল ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকেই বলা হয় ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট। ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট এর ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হল-

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম ধাপ | : | ক্ষতিকর ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা। যেমন- শারীরিক, মানসিক, রাসায়নিক, জৈবিক ইত্যাদি। |
| দ্বিতীয় ধাপ | : | কর্মীদের মধ্যে কারা এবং কিভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা। |
| তৃতীয় ধাপ | : | ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। |
| চতুর্থ ধাপ | : | পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ফলাফল সংরক্ষণ করা। |
| পঞ্চম ধাপ | : | ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা। |

## ১.২.১০ অকুপেশনাল সেফটি এর প্রয়োজনীয়তা

- নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রাখা।
- কাজের যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখা।

- কাজের পরিবেশের কারণে কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধ করা।
- বিপদজ্জনক কাজ বা ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে কর্মীদের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।
- কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অনুসারে পেশাগত পরিবেশ তৈরি এবং ব্যবস্থা করা।

## ১.৩ সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীক

কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীকের নির্দেশনা অত্যন্ত আবশ্যক। সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীক মূলত একটি চিত্র, যা নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনাকে নির্দেশ করে। লিখিত শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে সুরক্ষা চিহ্ন বা প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করতে ব্যবহার করা হয়। একটি ছবি শব্দের চাইতে বেশি তথ্য প্রদান করে থাকে। তাছাড়া ছবি সব শ্রেণি পেশা ও ভাষাভাষী মানুষের নিকট বোধগম্য হয়।

### ১.৩.১ নির্দেশনামূলক (প্রস্থান, জরুরি প্রস্থান) চিহ্ন, প্রাথমিক চিকিৎসার চিহ্ন, বিপদ চিহ্ন, সুরক্ষা ট্যাগ, সতর্ক সংকেত ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা

ও চিহ্ন

**নির্দেশনামূলক চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা**

- কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়াদি দ্রুত বুঝতে সাহায্য করবে।
- সকল ব্যক্তি সুরক্ষা চিহ্ন বুঝতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে কর্মীরা দ্রুত ধারণা লাভ করবে।
- দ্রুত বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করতে পারবে।
- প্রাথমিকভাবে আগুন নিভানোর কাজে অংশগ্রহণ সহজ করবে।
- কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হাইজিন ও স্যানিটেশন সম্পর্কে দ্রুত ধারণা লাভ করবে।
- ধূমপানমুক্ত এলাকা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সহজ হবে।

নির্দেশনামূলক চিহ্ন

### ১.৩.২ বিভিন্ন দিক নির্দেশনার সাইন সমূহ

| নির্দেশনামূলক চিহ্ন | বিবরণ | নির্দেশনামূলক চিহ্ন | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| | কর্মীদের নির্দিষ্ট দিক দিয়ে প্রস্থান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | 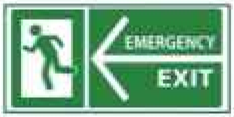 | কোন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হলে এই দিক দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। |
| | কোন কর্মী কর্মক্ষেত্রে আহত হলে 'এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যাবে' এটা নির্দেশ করে। | | তাৎক্ষণিক বিপদ ঘটতে পারে এমন ধরণের ঝুঁকিপূর্ন পরিস্থিতি বুঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | উচ্চ ভোল্টেজ এলাকা বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। | | এই চিহ্ন সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ/বিষাক্ত এলাকা বা বস্তু নির্দেশ করে। |
| | আসন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতি নির্দেশ করতে এটা ব্যবহার করা হয়। | | এটি সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্দেশ করে। |
| | এটা 'বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ' নির্দেশ করে। | | 'এটা ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকা' নির্দেশ করে। |
| | ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তি দূর করতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। | | 'এটা ক্ষয়কারক রাসায়নিক উপাদান' নির্দেশ করে। |
| | এটা 'অতিমাত্রায় শব্দযুক্ত এলাকা' নির্দেশ করে। | | এটা সংক্রামক জৈব উপাদান যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি নির্দেশ করে। |

## ১.৪ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

Personal Protective Equipment (PPE) বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম হলো এক ধরণের পোশাক বা সরঞ্জাম যার ব্যবহার মানুষকে আহত হওয়া অথবা অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। যেমন- ইয়ার মাফস, ইয়ার প্লাগস, আপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি।

### ১.৪.১ পিপিই নির্বাচন

পিপিই এর নকশা বা ডিজাইন এবং গঠন নিরাপদ হতে হবে। পিপিই এর ব্যবহার সহজ হতে হবে। মানানসই ও আরামদায়ক হওয়ার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সকল পিপিই একই সঙ্গে পরার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম এ যা থাকে-

- মাথা সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- হেলমেট, হেয়ার নেট, সান হ্যাট।
- হাত সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- গ্লোভস।
- চোখ ও মুখ সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- গগলস, মাস্ক।
- শ্বাসতন্ত্র সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- রেসপিরেটরস।
- কানের সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- ইয়ার মাফস, ইয়ার প্লাগস।
- পায়ের সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- নিরাপদ জুতা।
- শরীর সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- অ্যাপ্রন, ইউনিফর্ম, ভেস্ট, লাইফ জ্যাকেট।
- উচ্চতা সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- Body harnesses, Fall-arrest systems, Lowering harnesses, Rescue lifting, Body belt, Energy absorbers.

## ১.৪.১ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার

| পিপিই এর সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল- | | |
|---|---|---|
| **ধাপ-১** | **ধাপ-২** | **ধাপ-৩** |
| ১. পিপিই পরিধান করার জন্য পরিকল্পনা করা। | ১. নিরাপদ জুতা পরিধান করা অথবা শু কভার (Shoe cover) পরিধান করা। | ১. অ্যাপ্রন পরিধান করা। |
| ২. কাজের সাথে সম্পৃক্ত পিপিই শনাক্ত করা এবং সংগ্রহ করা। | | |
| **ধাপ-৪** | **ধাপ-৫** | **ধাপ-৬** |
| ১. মুখ ঢাল পরিধান করা। | ১. মাথায় হেলমেট/হেয়ারনেট পরিধান করা। | ১. হাত ধোয়া সম্পাদন করা। |
| ২. মাস্ক পরিধান করা। | | ২. গ্লোভস পরিধান করা। |
| ৩. গগলস পরিধান করা। | | |
| **পিপিই খুলে ফেলার পদ্ধতি :** | | |
| **ধাপ-১** | **ধাপ-২** | **ধাপ-৩** |
| ১. প্রথমে গ্লোভস খুলে ফেলা এবং নির্দিষ্ট স্থানে রাখা। | ১. হেয়ার নেট/হেলমেট/ক্যাপ খুলে ফেলা। | ১. মাস্ক অপসারণ করা। |
| ২. হাত ধোয়া সম্পাদন করা। | ২. নিরাপদভাবে মুখ ঢাল অপসারণ করা। | ২. গগলস অপসারণ করা। |
| **ধাপ-৪** | | ৩. পুনরায় প্রসেসিং এর জন্য পৃথক কন্টেইনারে গগলস রাখা। |
| ১. অ্যাপ্রন খুলে ফেলা। | | |
| ২. পুনরায় হাত ধোয়া সম্পাদন করা। | | |

## ১.৪.১ পিপিই ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

নিচে পিপিই ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হল-

- পিপিই রাসায়নিক ক্ষতি হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারেনা।
- একবার ব্যবহারযোগ্য পিপিই কোনক্রমেই পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।
- পিপিই পুরোপুরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনা।
- মৌলিক নিরাপত্তা যেমন- সচেতনতা, গৃহ পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক।
- পিপিই অনেক সময় কর্মীর স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন- শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, মাথাব্যাথা, ত্বকের জ্বালা-পোড়া ইত্যাদি।

## ১.৫ দুর্ঘটনা

কর্মক্ষেত্রে কোন অনিরাপদ কাজ বা অবস্থার কারণে যদি এমন কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যার ফলে কোন কর্মী আহত বা নিহত হয় অথবা হওয়ার আশংকা থাকে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তাহলে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অবস্থাকে দুর্ঘটনা বলে। আমেরিকান "The National Safety Council" এর মতে "কলকারখানায় সংঘটিত কোন ঘটনা বা দ্রুত সংঘটিত ঘটনাসমূহ যা অনিরাপদ কাজ ও অনিরাপদ অবস্থা হতে সৃষ্টি হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কোন কর্মীকে আহত বা নিহত করে তাকে শিল্প দুর্ঘটনা বলে"।

### ১.৫.১ দুর্ঘটনার প্রকারভেদ

দুর্ঘটনা সংঘটনের মাধ্যম এবং এর ক্ষয়ক্ষতির উপর ভিত্তি করে সকল ধরনের দুর্ঘটনাকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

**শারীরিক দুর্ঘটনা:** শারীরিক দুর্ঘটনা বলতে অনাকাংখিত কোন অবস্থা বা ঘটনার কারণে কোন কর্মীর শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বোঝায়। যেমন-যানবাহনজনিত দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, আগুনজনিত দুর্ঘটনা, রাসায়নিক সংস্পর্শজনিত দুর্ঘটনা, অনুপযুক্ত বিল্ডিং ডিজাইনজনিত দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা।

**অভ্যন্তরীণ দুর্ঘটনা:** অভ্যন্তরীন দুর্ঘটনা বলতে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া, ভুল তথ্য দেওয়া, কোন ফাইল হারিয়ে ফেলা বা ডাটাবেস থেকে মুছে ফেলা, নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে ভূলে যাওয়া ইত্যাদিকে বোঝায়।

### ১.৫.১ দুর্ঘটনা সংঘটনের কারন ও প্রতিকার

দুর্ঘটনা কখনই বলে কয়ে আসেনা। কিন্তু এর পরিণতি হয় নেতিবাচক। তবে আগে থেকে সতর্ক থাকলে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। দুর্ঘটনার প্রধান ২ টি কারণ হচ্ছে-

**অনিরাপদ কাজ:** অনিরাপদ কাজের কারণ হচ্ছে-

- অসংগত মনোভাব
- জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব
- শারীরিকভাবে খাপ না খাওয়া
- অনুপযুক্ত যান্ত্রিক বা শারীরিক পরিবেশ

**অনিরাপদ পরিস্থিতি:** অনিরাপদ পরিস্থিতি বলতে কর্মক্ষেত্রে বস্তু, মেশিন, পরিবেশের ফিজিক্যাল বা রাসায়নিক অবস্থার ফলে সংঘটিত দুর্ঘটনাকে বোঝায়।

## ১.৬ জরুরি করণীয়সমূহ

কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মীকে জরুরি করণীয় বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা বাধ্যতামূলক। জরুরি করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে কর্মক্ষেত্রে

কর্মীরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন- দ্রুত প্রস্থানের অবস্থান, জরুরি মুহূর্তে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করার প্রক্রিয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তির স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। জরুরি করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-

- জরুরি প্রস্থানের অবস্থান চিহ্নিতকরণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তির স্থান চিহ্নিতকরণ
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান চিহ্নিতকরণ
- উদ্ধার পদ্ধতি এবং মাস্টার স্টেশন চিহ্নিতকরণ
- কর্মক্ষেত্রে হ্যাজার্ড বা বিপদের উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ

**প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি:** ডাক্তার আসার পূর্বে অথবা ডাক্তারের কাছে স্থানান্তর করার পূর্বে আকস্মিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে জরুরি ভিত্তিতে যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- রোগীর জীবন রক্ষা করা
- রোগীর অবস্থার অবনতি প্রতিরোধ করা
- রোগীর অবস্থার উন্নতিসাধন করা

**জরুরি ধৌতকরন স্থান:** অনেক সময় কর্মীরা অ্যাসিড বা বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হলে দ্রুত পানি প্রবাহের সাহায্যে ধুয়ে ফেললে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব। তাই কর্মীদের জরুরি চক্ষু ধৌতকরণ স্থান, ঝরনা, বেসিন এর স্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে হবে।

**অগ্নি নিরাপত্তা পদ্ধতি ও রেগুলেশন:** কর্মক্ষেত্রে আগুন সৃষ্টির প্রধান ৩ টি উপকরণ হচ্ছে-

- জ্বালানী পদার্থ যেমন- পেট্রোল, শুকনো কাগজ বা কাপড়, অন্য কোন দাহ্য পদার্থ
- তাপ
- অক্সিজেনের উপস্থিতি

চিত্র ১.২: আগুন সৃষ্টির উপকরণ

**প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতি:** আগুন বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই হাতের কাছে থাকা যে কোন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নেভানোর প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপন বলে। প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা ব্যবস্থার তালিকা নিচে দেওয়া হল-

**ক. ওয়াটার টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র-**

- সোডা এসিড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- স্টোরড প্রেসার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- গ্যাস প্রেসার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

ধৌতকরন

**খ. ফোম টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র-**

- রাসায়নিক ফোম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- মেকানিক্যাল ফোম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

**গ. $CO_2$ টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র**

**ঘ. শুষ্ক রাসায়নিক টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র-**

- গ্যাস কার্টিজ অপারেটেড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- স্টোরড প্রেসার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

**ঙ. হ্যালন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র**

**চ. স্প্রিং কলার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র-**

**আগুনের শ্রেণীবিভাগ :** আগুন নেভানো যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আগুন কে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

| আগুনের ধরন ও প্রতীক | চিত্র | বর্ণনা | নির্বাপন যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|---|
| 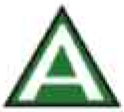 | | সাধারণ আগুন (কাগজ, কাপড়, কাঠ, রাবার, প্লাস্টিক ইত্যাদি জনিত)। | তাপ শোষনকারী তরল বা রাসায়নিক। |
| 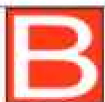 | | দাহ্য তরল বা দাহ্য বাষ্পজনিত আগুন। | ফোম টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। |
| | | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দ্বারা সৃষ্ট আগুন। | অপরিবাহী এজেন্ট অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। |
| | | দাহ্য ধাতুজনিত আগুন (ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়াম )। | তাপ শোষনকারী উপাদান। যা জলন্ত উপাদানের সাথে ক্রিয়াশীল নয়। |
| | | উচ্চ তাপমাত্রার তেল বা রান্না সংশ্লিষ্ট আগুন। | ভেজা পটাশিয়াম এসিটেট, কম pH ভিত্তিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। |

**অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা**

- সকল দাহ্য বস্তু এবং দাহ্য বস্তু রাখার এলাকা চিহ্নিত করে ট্যাগ লাগাতে হবে।
- সকল দাহ্য বস্তুর কন্টেইনার ঢাকনাযুক্ত হতে হবে।
- কোথাও দাহ্য বস্তু ছড়িয়ে গেলে দ্রুত তা বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

২০২৪

- দাহ্য বস্তুর এলাকায় খোলা আগুন/জ্বলন্ত সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে সকল কর্মীদের অগ্নি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- নিজ প্রতিষ্ঠানের ফায়ার সার্ভিস টিম গঠন করতে হবে।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত যন্ত্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

## ১.৭ গৃহ পরিচ্ছন্নতা

গৃহের পরিবেশকে সুন্দর আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য ভিতরের ও বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ পরিবেশে মশা-মাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশ কম থাকে। ফলে রোগজীবাণু সহজে ছড়াতে পারে না। সেজন্যে গৃহের সব জায়গাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। গৃহের অভ্যন্তরীণ স্থানে যেসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক তা হলো।

- মেঝে ঝাড়ু দেওয়া, মোছা বা লেপা।
- দরজা জানালার গ্রিল এবং কাঁচ পরিষ্কার করা।
- দেয়াল, সিলিং, বৈদ্যুতিক পাখা পরিষ্কার করা।
- সিঙ্ক ও বেসিন পরিষ্কার করা।
- যন্ত্রপাতিসমূহ পরিষ্কার করা।
- বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা।
- বাথরুম বা টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার করা।

### ১.৭.১ গৃহ পরিচ্ছন্নতার সংজ্ঞা

শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে গৃহ "পরিচ্ছন্নতা" বলতে কারখানা গৃহের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশকে বুঝায়। পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কর্মক্ষেত্রে কর্মীর শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং কর্মীর কাজের মনোভাবকে প্রফুল্ল করে। গৃহ পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতিকে 5S দ্বারা অভিহিত করা হয়। 5S হলো ওয়ার্কপ্লেস পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার একটি উচ্চ মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া।

**5S এর উদ্দেশ্য**

- ভালোভাবে কাজ করার জন্য কর্মক্ষেত্রকে সংগঠিত করা, আইন, মানদন্ড এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- 5S অনুশীলন করলে কর্মীদের ভেতর ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- কাজকে সহজ, দ্রুত, স্বল্প খরচ, নিরাপদ এবং আরো অধিক কার্যকরী করতে 5S গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**5S হচ্ছে-**

S = Sort (বাছাই করা)

S = Set in order (সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো)

S = Shine (দৃষ্টিগোচর হওয়া)

S = Standardize (মান সম্পন্ন করা)

S = Sustain (অব্যাহত রাখা)

## ১.৭.২ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণ

নিম্নে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

- কারখানার লে-আউট সঠিক ও বাস্তবসম্মত না হওয়া।
- শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাঝে সচেতনতা না থাকা।
- নিরাপদ বিধি বা কারখানা আইন যথাযথভাবে পালন না করা।
- কারখানায় মাত্রাতিরিক্ত তাপ উৎপাদন।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখা।
- কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য ও অন্যান্য টুলসমূহ যত্রতত্র ফেলে রাখা।
- ধুলা ও ধোঁয়া বের হওয়ার ব্যবস্থা না থাকা।
- বর্জ্য ও তরল পদার্থসমূহ অপসারণের সুব্যবস্থা না থাকা।
- উপযুক্ত টয়লেট বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা।
- নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণের অভাব।

## ১.৭.৩ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিকারী মাধ্যম

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিকারী মাধ্যমগুলো হচ্ছে -

- **রাসায়নিক মাধ্যম:** যেমন- বাষ্প, ফিউম (ধুম), গ্যাস (কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস) ইত্যাদি।
- জৈব মাধ্যম: যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর উৎপত্তি।
- **ভৌত মাধ্যম:** যেমন- সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি, অতি উচ্চ মাত্রার শব্দ, এক্সরে ইত্যাদি।

## ১.৭.৪ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

শিল্প কারখানায় কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

- প্রত্যেক কারখানাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- টয়লেট বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে হবে।
- বায়বীয় পদার্থ নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অবাধ বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

- পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের আলাদা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং পোশাক পরিবর্তন রুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ১.৭.৫ স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশের উপকারিতা

শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপকারিতা নিচে দেওয়া হল-

- কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়
- দুর্ঘটনা কম হয়
- দ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিত হয়
- যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়
- উৎপাদন ব্যয় কম হয়

### ১.৭.৬ বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারক যন্ত্রপাতি

নিচে বিভিন্ন ধরণের পরিষ্কারক যন্ত্রপাতির তালিকা দেওয়া হল-

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, পলিশার, ড্রায়ার, স্কুইজার/হুইপার, বালতি, মপ, ব্রুম, সিলিং ব্রুম, ডাস্ট প্যান, ব্রাশ, প্যাড, ডাস্টার, ডাস্টবিন, প্লাস্টিক লাইনার, ক্লিনিং/সেইফটি সাইন, ওয়েট এবং ড্রাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি।

### ১.৭.৭ বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিং এবং সেনিটাইজিং এজেন্ট

নিচে বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিং এবং সেনিটাইজিং এজেন্ট এর তালিকা দেওয়া হল-

- পানি
- সাবান
- ডিটারজেন্ট
- ক্লোরিন ট্যাবলেট
- আয়োডিন
- ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি।

### ১.৭.৮ প্লান্ট মেঝে পরিষ্কারকরণ কৌশল

প্লান্ট মেঝে বিভিন্নভাবে পরিষ্কার করা যায়, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- সুইপিং বা ঝাড়ু দেয়া
- মপিং
- ভ্যাকুয়ামিং
- স্ক্রাভিং ও পলিশিং
- স্কুইজিং
- ওয়াটার স্প্রে

- স্ক্র্যাপিং
- এয়ার ব্লোয়িং

### স্যানিটাইজিং-এর পদ্ধতি

প্লান্ট মেঝে স্যানিটাইজ করার কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো-

- কেমিক্যাল বা স্যানিটাইজার প্রয়োগের মাধ্যমে।
- গরম পানি ব্যবহার করে।
- স্টিম বা গরম বাষ্প ব্যবহার করে।
- উচ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে।

কার্যকর স্যানিটাইজিং প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে।

- স্যানিটাইজিং কেমিক্যালের সঠিক মাত্রা ও ঘনত্ব।
- কেমিক্যাল প্রয়োগের পর জীবাণু ধ্বংস হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া।
- কেমিক্যাল সলিউশন বা দ্রবণের কার্যকারিতার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা।

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

### জবের নাম: OSH (Occupational Safety and Health) নীতিমালা এবং নিরাপদ পদ্ধতিগুলো চিহ্নিতকরণ

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

১.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।

১.৩ OSH নীতিমালা অনুসরণ করবে।

১.৪ সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীকগুলো চিহ্নিত এবং অনুসরণ করবে।

১.৫ আকস্মিক দুর্ঘটনায় করনীয় বিষয়গুলো সরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে।

১.৬ প্রাথমিক নিরাপত্তার উপকরণসমূহ চিহ্নিত করবে।

১.৭ ফায়ার বা আগুন নির্বাপক দ্রব্যসমূহ চিহ্নিত করবে।

১.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৯ চেকলিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

১.১০ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

## প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক
- গ্যাস নিরোধক মাস্ক
- কানের প্লাগ

## প্রয়োজনীয় উপকরণ

- OSH পলিসি এবং পদ্ধতি সমূহ
  ক. OSH এর জন্য বাংলাদেশের মান
  খ. অগ্নি নিরাপত্তা বিধি
  গ. অনুশীলন কোড
  ঘ. শিল্প নির্দেশিকা
  ঙ. শ্রম আইন-২০১৮
- সুরক্ষা লক্ষণ এবং প্রতীক
  ক. দিক নির্দেশাবলী (প্রস্থান, জরুরি প্রস্থান ইত্যাদি)
  খ. প্রাথমিক চিকিৎসার ট্যাগ
  গ. বিপদ ট্যাগ ও লক্ষণ
  ঘ. সুরক্ষা ট্যাগ
  ঙ. সতর্ক সংকেত।

## কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- তারপর সকল নির্দেশিকা ভালো করে পড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানবে।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে।**

## সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করবে।
- সকল নির্দেশিকা ভালোমত পড়বে।

২০২৪

## জব নং-০২

### জবের নাম: ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরিধান অনুশীলন।

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড**

২.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

২.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।

২.৩ পিপিই শনাক্ত করবে।

২.৪ কাজের উপযোগী পিপিই পরিধান করবে।

২.৫ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

২.৬ চেকলিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক
- গ্যাস নিরোধক মাস্ক
- কানের প্লাগ

**কার্যপদ্ধতি**

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- তাত্ত্বিক **১.৪.১ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার অংশ** অনুসরণ করে কাজ করবে।

**এই জবটি চার বার অনুশীলন করতে হবে ।**

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করবে।
- সকল নির্দেশিকা ভালোমত পড়বে।

## জব নং-০৩

### জবের নাম: প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ অনুশীলন।

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

৩.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৩.২ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ অনুশীলনের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৩.৩ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগের উপকরণ সংগ্রহ করবে।

৩.৪ হ্যাজার্ড এর উৎস চিহ্নিত করবে।

৩.৫ বৈদ্যুতিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করবে।

৩.৬ শক, কাটা, পোড়া ইত্যাদির উপর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করবে।

৩.৭ দুর্ঘটনার সময় তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করবে।

৩.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

৩.৯ চেক লিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

### প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

- প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স।

### কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- রোগীর দূর্ঘটনার কারণ বা রোগ নির্নয় করে যত দ্রুত সম্ভব তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার দেওয়ার পর পরিস্থিতি অনুযায়ী রোগীর অবস্থার উন্নতি কল্লে রোগীকে ডাক্তারের কাছে, হাসপাতালে বা তার বাড়ীতে নিরাপদে স্থানান্তর করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে সচরাচর যে সকল দুর্ঘটনা/অসুস্থতা ঘটে সে সকল দুর্ঘটনা/অসুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার বিবরণ নিচে ছক আকারে লিপিবদ্ধ করা হল-

২০২৪

| দুর্ঘটনা/অসুস্থতার বিবরণ | প্রাথমিক চিকিৎসা |
| --- | --- |
| শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া। | ১. কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে।<br>ক. মুখ থেকে মুখে অথবা মুখ থেকে নাকে।<br>খ. কার্ডিয়ো পালমোনারী রিসাসিটেশন (CPR)।<br>**মুখ থেকে মুখে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি**<br>ক. রোগীর চিবুক তুলে ধরে গলা সোজা করতে হবে এবং মুখ খুলতে হবে।<br>খ. এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক চেপে নাক বন্ধ করতে হবে।<br>গ. বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিতে হবে।<br>ঘ. রোগীর মুখের উপর মুখ চেপে ধরে আস্তে আস্তে তার মুখের ভেতরে শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে।<br>ঙ. ৩০ সেকেন্ড বিরতি দিয়ে এভাবে মুখের ভিতরে শ্বাস দিতে হবে। |
| শরীরের কোন অংশ কেটে যাওয়া। | ক. দ্রুত ক্ষতস্থান অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল তরল দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করতে হবে।<br>খ. কেটে যাওয়া অংশ কাপড় বা ব্যান্ডেজ দিয়ে চেপে ধরতে হবে।<br>গ. কেটে যাওয়া অংশ যতসম্ভব উপরে উঠাতে হবে। |
| স্নায়বিক আঘাত বা শক বা অজ্ঞান হওয়া। | ক. রোগীর কাপড়ের বাঁধন ঢিলে ঢালা করতে হবে বা অতিরিক্ত কাপড় অপসারণ করতে হবে।<br>খ. রোগীকে আরামদায়ক ভাবে শুইয়ে দিতে হবে।<br>গ. রোগীর শরীর গরম রাখার জন্য গরম পানির বোতল ব্যবহার না করা বা হাত-পা ঘষা যাবে না।<br>ঘ. কোন অবস্থাতেই অজ্ঞান রোগীর মুখে কোন তরল অর্থাৎ পানীয় জাতীয় কিছু দেয়া যাবে না।<br>ঙ. রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে পানি, দুধ, চা ইত্যাদি খেতে দেওয়া যেতে পারে।<br>চ. রোগীকে ঠান্ডা লাগলে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।<br>ছ. অত্যাধিক গরমে জ্ঞান হারালে, রোগীকে বাতাস করতে হবে, মাথায় পানি ঢালা যেতে পারে, শরীর ঠান্ডা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে।<br>জ. রোগী যদি সে শ্বাস নিতে না পারে, তবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। |
| বৈদ্যুতিক আঘাত | ক. মাটিতে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে।<br>খ. শরীর গরম রাখার জন্য কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।<br>গ. রোগী পিপাসার্ত হলে ঠোঁট ভিজিয়ে দিতে হবে। |

| | |
|---|---|
| | ঘ. শ্বাস-প্রশ্বাস না চললে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। |
| বিষক্রিয়া | ক. বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক হতে পারে।<br>খ. রোগী যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তাহলে-<br>* বমি করানো যাবে না।<br>* শক্ত বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে যাতে পেটে চাপ না পড়ে।<br>* মাথা এমনভাবে কাৎ করে দিতে হবে যেন শ্বাস নিতে কষ্ট না হয়।<br>* রোগী যদি নিজে থেকেই বমি করে তবে তাকে আরামদায়ক পজিশনে শুইয়ে দিতে হবে, যাতে করে তার বমি কণ্ঠ নালীতে আটকে না যায়।<br>* শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে।<br>গ. রোগী সজ্ঞান অবস্থায় থাকে তাহলে-<br>* রোগীকে বমি করাতে হবে। প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পানি খাইয়ে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করাতে হবে।<br>* বিষ যদি দাহ্য পদার্থ হয় তবে বমি করানো যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। |
| অতিরিক্ত তাপে শরীরের ক্ষয় | ক. আহত রোগীকে ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে।<br>খ. আহত রোগীকে ওর স্যালাইন অথবা এক গ্লাস পানিতে চা চামচের অর্ধেক লবণ ও এক চামচ চিনি মিশ্রিত করে পানি পান করাতে হবে। |
| পুড়ে যাওয়া।<br>১ম মাত্রা- চামড়া ঝলসে যাওয়া।<br>২য় মাত্রা-পুড়ে ফোসকা পড়ে যাওয়া।<br>৩য় মাত্রা- পুড়ে গিয়ে চামড়া ও মাংস গলে যায় বা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া। | ক. পুড়ে যাওয়া অংশে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং জ্বালা পোড়া ভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ঠান্ডা পানি বা বরফে ডুবিয়ে রাখতে হবে।<br>খ. ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে পোড়া স্থানে বার্ণ অয়েন্টমেন্ট লাগাতে হবে।<br>গ. তারপর জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ দিয়ে হালকা করে বেঁধে দিতে হবে।<br>ঘ. ৩য় মাত্রা পোড়া হলে কোন ওষুধ লাগানো যাবে না।<br>ঙ. ফোসকা পড়লে তা গলানো যাবে না।<br>চ. ৩য় মাত্রার পোড়া হলে লেগে থাকা কাপড় টেনে উঠানো যাবেনা। অতিরিক্ত কাপড় কেটে নেওয়া যেতে পারে।<br>ছ. ৩য় মাত্রার পোড়া রোগীকে প্রচুর স্যালাইন খাওয়াতে হবে। |
| হাড় ভেঙে গেলে | ক. ক্ষতস্থানে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।<br>খ. অবস্থার অবনতি রোধে আঘাত প্রাপ্ত অংশ উপরে উঁচু করে রাখতে হবে।<br>গ. আঘাত প্রাপ্ত অংশ টুকরা কাঠের সাহায্যে সংযোগ করতে হবে। |
| নাকে রক্ত আসলে | ক. বেসিনের সামনে নিয়ে নাক চেপে রাখতে হবে।<br>খ. রক্ত ভিতরে টেনে নেওয়া যাবে না।<br>গ. ভেজা কাপড় দিয়ে নাক ২-৩ মিনিট চেপে রাখতে হবে।<br>ঘ. নাক খোঁচানো বা পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। |

| | |
|---|---|
| চোখে ময়লা পড়লে | ক. চোখে পানির ঝাঁপটা দিতে হবে। |
| | খ. ময়লা বের করার জন্য চোখের পাতা টেনে পাতলা নরম কাপড় সরু করে ময়লা বের করতে হবে। |
| খিচুনি বা গিড়ার টান পড়লে | ক. রোগী যেভাবে আরাম বোধ করে সেভাবে রাখতে হবে।<br>খ. বরফ/ঠান্ডা পানির সংস্পর্শে রাখতে হবে।<br>গ. ব্যাথার স্থানে ব্যান্ডেজ দিয়ে রাখতে হবে। |

**এই জবটি চার বার অনুশীলন করতে হবে ।**

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করব।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করব।
- রোগীকে সতর্কতার সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে।
- রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

## জব নং-০৪

### জবের নাম: অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো।

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড**

৪.১ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহারের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৪.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।
৪.৩ কার্যক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করবে।
৪.৪ কার্যক্ষেত্রে জরুরি প্রক্রিয়াগুলোর যথাযথ অনুসরণ করবে।
৪.৫ দুর্ঘটনা, আগুন ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করবে।
৪.৬ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানোর কৌশল আয়ত্ব করবে।
৪.৭ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৪.৮ চেকলিস্ট  অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- বিভিন্ন ধরনের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।
- কৃত্রিম আগুন ঘটিত দুর্ঘটনা।

**কার্যপদ্ধতি**

- প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে আগুন জ্বালাতে হবে।
- তারপর আগুন নেভানোর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আগুন নেভাতে হবে।

নিচে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে আগুন নেভানোর পদ্ধতি উল্লেখ করা হল।

- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।
- ন্যূনতম ১.৮ মিটার দূর থেকে আগুনের দিকে মুখ করে দাড়াতে হবে।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি শক্ত করে ধরতে হবে এবং লক পিন খুলতে হবে।
- তারপর আগুনের উৎসের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।
- একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ঘুরিয়ে স্প্রে করতে হবে।

**এই জবটি ছয় বার অনুশীলন করতে হবে।**

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করবে।
- সতর্কতার সাথে আগুন তৈরি করতে হবে।
- নিরাপদ কর্ম অভ্যাস মেনে চলবে।

## জব নং-০৫

### জবের নাম: কার্যস্থান/গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কৌশল।

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড**

৫.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৫.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।

৫.৩ চেকলিস্ট অনুযায়ী ঝুঁকি সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৪ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণ সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৫ বিভিন্ন ধরণের পরিষ্কারক যন্ত্রপাতি সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৬ বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিং এবং সেনিটাইজিং এজেন্ট সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৭ কাজ শেষে স্টান্ডার্ড প্রক্রিয়া অনুসারে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করতে পারবে।

৫.৮ কাজ শেষে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- হ্যাজার্ড চেক লিস্ট
- বিভিন্ন ধরণের ব্রাশ
- উড ক্লিনার
- টাইল ও গ্রাউট ক্লিনার
- ডাস্টার বিভিন্ন ধরণের
- গ্লাস ক্লিনার
- মাইক্রো ফাইবার ক্লথ, মপ
- সাবান
- পানি
- অ্যামোনিয়া
- সাইট্রিক অ্যাসিড
- ক্লোরিন
- সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড
- আইডোফোরস
- আয়োডিন
- অ্যানায়নিক অ্যাসিড
- অ্যাসিটোন
- ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড পাউডার

**কার্যপদ্ধতি**

- প্রথমে কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে হ্যাজার্ড চেক লিস্ট অনুসারে ঝুঁকি চিহ্নিত করবে এবং ঝুঁকি যথাযথ স্টান্ডার্ড অনুসারে অপসারণ করবে।
- প্লান্ট মেঝে/কার্যস্থান পরিষ্কার করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- ডাস্টবিন রুটিন মাফিক পরিষ্কার করতে হবে।
- স্যানিটাইজিং-এর পদ্ধতি :
  কর্মক্ষেত্রের ফ্লোর/স্থান স্যানিটাইজ করার কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো-
  ক. কেমিক্যাল বা স্যানিটাইজার প্রয়োগের মাধ্যমে।
  খ. গরম পানি ব্যবহার করে।
  গ. স্টিম বা গরম বাষ্প ব্যবহার করে।
  ঘ. উষ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে।

সাধারণত ক্লিনিং-এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে এটি করতে হবে। স্যানিটাইজিং কেমিক্যালের সলিউশন বা দ্রবণ ক্লিন করা এরিয়াতে ছিটানো বা স্প্রে করতে হবে অথবা সলিউশন দিয়ে এরিয়া মুছে ফেলতে হবে।

**এই জবটি চার বার অনুশীলন করতে হবে।**

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করব।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করব।

২০২৪

- সতর্কতার সাথে ক্লিনিং/সেনিটাইজিং এজেন্ট তৈরি এবং ব্যবহার করতে হবে।
- সাবধানতার সাথে হ্যাজার্ড চিহ্নিত করবে।

## অনুশীলনী-১

### অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. OSH এবং PPE এর পূর্ণরুপ কি?

২. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আগুন থেকে কত মিটার দূরে ধরতে হয়।

৩. হ্যাজার্ড কি?

৪. ঝুঁকি (Risk) কি?

৫. সুরক্ষা লক্ষণ ও প্রতীক কি?

৬. দূর্ঘটনা কি?

৭. প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) কি?

৮. আগুন সৃষ্টির মূল উপাদান কয়টি ও কি কি?

৯. পাঁচটি পরিষ্কারক যন্ত্রের নাম লেখ।

১০. পাঁচটি ক্লিনিং এজেন্টের নাম লেখ।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. OSH এর বিধি সমূহ উল্লেখ কর।

২. বেসিক সেফটি ও সিকিউরিটি বলতে কি বোঝায়?

৩. OSH বলতে কি বোঝায়?

৪. পেশাগত নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

৫. সুরক্ষা লক্ষণ ও প্রতীক এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

৬. পাঁচটি PPE এর নাম লেখ।

৭. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ কর।

৮. 5S বলতে কি বোঝায়?

৯. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির কারণগুলো উল্লেখ কর।

১০. 5S এর উদ্দেশ্য কি?

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিসমূহ আলোচনা কর।

২. হ্যাজার্ড চেক লিস্ট কি? কর্মক্ষেত্রের একটি হ্যাজার্ড চেকলিস্ট তৈরি কর।

৩. PPE ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ১০ টি কারণ উল্লেখ কর।

৫. কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপকারিতা উল্লেখ কর।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# কৃষি ফসল, খাদ্য ও পুষ্টি

# Agricultural Crops, Food and Nutrition

খাদ্য জীবের জন্য অপরিহার্য। আমরা সাধারণত শরীরের ক্ষয়পূরণ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি অর্জনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস হলো কৃষিজ দ্রব্য বা কৃষি ফসল। মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পানি ও লবণই বাহির থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। বাকি সকল খাদ্য উপাদানের জন্য আমাদেরকে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কৃষি ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দানা শস্য যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, বাজরা, চীনা, কাউন ইত্যাদি মূলত শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ থেকে আমরা প্রধানত আমিষ ও তেল জাতীয় খাদ্য উপাদান পেয়ে থাকি। টাটকা শাক-সবজিতে আছে ভিটামিন, কিছু সহজলভ্য আমিষ ও খনিজ লবণ। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল থেকে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও বিবিধ খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়। সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, রেড়ি প্রভৃতি গাছের বীজ থেকে চর্বিজাতীয় উপাদান পাওয়া যায়।

### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আমাদের দেশে উৎপাদিত কৃষি ফসল এবং খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারব।
- কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ শনাক্তকরণ করতে পারব।

## ২.১ উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

**উৎপাদন ক্ষেত্রভেদে:** উৎপাদন ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও চাষাবাদের ধরণের উপর নির্ভর করে কৃষি ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মাঠফসল বা কৃষিতাত্ত্বিক ফসল ও বাগান ফসল বা উদ্যান ফসল।

**মাঠফসল:** যে সমস্ত ফসল বৃহৎ পরিসরে মাঠে চাষাবাদ করা হয় এবং ঐ ফসলের উপর কৃষকের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে তাকে মাঠ ফসল বলে। অর্থাৎ মাঠপর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাষাবাদকৃত ফসলই হল মাঠ ফসল। যেমন- ধান, গম, ডাল, ভুট্টা, আখ, আলু ইত্যাদি।

চিত্র ২.১: মাঠ ফসল

২০২৪

**বাগান বা উদ্যান ফসল:** উদ্যান শব্দের অর্থ বাগান বা বাগিচা। বাগানে যেসব ফসল ফলানো হয় সেগুলোই উদ্যান ফসল। অর্থাৎ বাড়ির আশপাশে উঁচু স্থানে বা ছোট পরিসরের কোনো জমি বা বাগানে যত্নসহকারে যেসব ফসল ফলানো হয় তাকে উদ্যান ফসল বলে। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফলমূল, ফুল, মসলা ইত্যাদি উদ্যান ফসলের অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র ২.২: মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল।

**উৎপাদন পদ্ধতিভেদে:** উৎপাদন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কৃষি ফসলকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- বৃষ্টি নির্ভর ফসল ও আর্দ্র বা সেচ প্রাপ্ত ফসল।

**বৃষ্টি নির্ভর ফসল:** যেসব ফসল প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করা হয় সেসব ফসলকে বৃষ্টিনির্ভর বা শুষ্ক ফসল বলে। যেমন- আউশ ও আমন ধান, গম, ডালশস্য, তেলবীজ, পাট, ভুট্টা, কাউন ইত্যাদি।

**আর্দ্র বা সেচ প্রাপ্ত ফসল:** যেসব ফসল সেচ ছাড়া চাষাবাদ করা যায় না সেগুলোকে সেচ প্রাপ্ত ফসল বলে। যেমন- উচ্চ ফলনশীল ধান, বোরো ধান, আলু, শীতকালীন সবজি যেমন- টমেটো, ঢেঁড়স, মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক ইত্যাদি।

## ২.২ মৌসুমভিত্তিক কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

উৎপাদনের মৌসুমকে বিবেচনা করে কৃষি ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- রবি ফসল ও খরিফ ফসল।

**রবি ফসল:** রবি ফসল মূলত শীতকালীন ফসল। আমাদের দেশে সাধারণত যে সকল ফসল শীতের শুরুতে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রোপণ করা হয় এবং শীতের শেষে বা গ্রীষ্মের শুরুতে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কাটা হয় তাদেরকে রবি ফসল বলা হয়। উপমহাদেশে রবি মৌসুম বলতে সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কেই বুঝায়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রবি ফসল হল আলু, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গম, যব, খেসারি, মসুর, ছোলা, সয়াবিন, সরিষা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

**খরিফ ফসল:** খরিফ ফসল হল গ্রীষ্মকালীন ফসল। যেসব ফসল সাধারণত গ্রীষ্মের শুরুতে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে রোপণ করা হয় এবং গ্রীষ্মের শেষে বা শীতের শুরুতে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে কাটা হয় তাদেরকে খরিফ ফসল বলে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে খরিফ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- খরিফ-১ (মার্চ-জুন) ও খরিফ-২ (জুলাই-অক্টোবর)। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান খরিফ ফসল হল ধান, ভুট্টা, পাট, জোয়ার ও বাজরা, তিল, তিসি, গ্রীষ্মকালীন সবজি ইত্যাদি।

## ২.৩ ব্যবহারভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিন্যাস

এক্ষেত্রে সাধারণত ফসলের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে ফসলগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ব্যবহার ভেদে কৃষি ফসল প্রায় ১২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- **দানা জাতীয় শস্য (Cereals):** ধান, গম, যব, ভুট্টা, চিনা, কাউন ইত্যাদি।
- **ডাল জাতীয় শস্য (Pulses):** ছোলা, মসুর, মুগ, মটরশুটি, মাষকলাই, শিম, অড়হর ইত্যাদি।
- **তেলবীজ (Oils):** সরিষা, নারিকেল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, তিল ইত্যাদি।
- **চিনি ফসল (Sugar Crops):** এ জাতীয় ফসলের মধ্যে আঁখ (Sugar Cane) ও বীটই প্রধান।
- **আঁশ বা তন্তুজাতীয় ফসল (Fibre crops):** তুলা, পাট, মেস্তা, শণ, তিসি ইত্যাদি।
- **নেশা বা মাদকজাতীয় ফসল (Narcotics):** তামাক, আফিম, ভাঙ, গাঁজা প্রভৃতি।
- **সবজি জাতীয় ফসল (Vegetables):** বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, ইত্যাদি।
- **পানীয় ফসল (Beverages):** এ ফসলগুলো হচ্ছে চা ও কফি।
- **পশু খাদ্য (Fodder Crops):** নেপিয়ার ঘাস, ইপিল-ইপিল, ভুট্টা ইত্যাদি।
- **সবুজ সার জাতীয় ফসল (Green Manure Crops):** ধৈঞ্চা, শণ, পাট ইত্যাদি এ জাতীয় ফসল।
- **মসলা জাতীয় ফসল (Spices crops):** পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া, লবঙ্গ, দারুচিনি, জিরা, তেজপাতা ইত্যাদি।
- **ফল জাতীয় ফসল (Fruit crops):** আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি।

## ২.৪ পুষ্ট ও অপুষ্ট দানা ও অপদ্রব্য

**পুষ্ট দানা:** যে সকল কৃষি ফসল ত্রুটিমুক্ত, ভালো গুণসম্পন্ন এবং পুনরায় ফসল উৎপাদনে সক্ষম সেই সকল কৃষি ফসলকে পুষ্ট দানা বলে।

চিত্র ২.৩: পুষ্ট দানা

**অপুষ্ট দানা:** যে সকল কৃষি ফসল ত্রুটিযুক্ত, ভাঙ্গা, ফাটা, অস্বাভাবিক এবং পুনরায় ফসল উৎপাদনে সক্ষম নয় সেই সকল কৃষি ফসলকে অপুষ্ট দানা বলে।

চিত্র ২.৪: অপুষ্ট দানা

**অপদ্রব্য:** কৃষি ফসলের সাথে মিশ্রিত খড়কুটা, ডাল-পাতা, খোসা, ধুলা-বালি, নুড়ি-পাথর, পশু-পাখির বিষ্ঠা, বিভিন্ন ধরণের পোকা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে অপদ্রব্য বলে।

## ২.৫ খাদ্য ও পুষ্টি

**খাদ্য:** যে সব খাদ্যবস্তু খেলে জীবদেহের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় তাদেরকে খাদ্য বলে। যেমন- ভাত, ডিম, দুধ, মাংস, রুটি, তেল, বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি ইত্যাদি।

**পুষ্টি:** পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়া দ্বারা জীবদেহে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও পরিশোষিত হয়ে সমস্ত দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে ও দেহের বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে তাকেই পুষ্টি বলে।

## ২.৬ খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব খাদ্য খাই তাদেরকে উৎস, কার্যকারিতা ও পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল।

- উৎস অনুসারে খাদ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা-
  **উদ্ভিজ্জ খাদ্য**: যেমন- চাল, গম, ডাল, ফল, সবজি ইত্যাদি।
  **প্রাণীজ খাদ্য**: যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি।
- মানব দেহে কার্যকারিতা অনুসারে খাদ্যবস্তুকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
  **দেহ গঠনকারী খাদ্য**: যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি।
  **শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য**: যেমন- ভাত, রুটি, স্নেহ জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।
  **রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য**: যেমন- ফলমূল ও শাক-সবজি।
- পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে খাদ্যদ্রব্যকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-
  **পচনশীল খাদ্য**: যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, বিভিন্ন ধরনের শাক ইত্যাদি।
  **অর্ধ পচনশীল খাদ্য**: যেমন- আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদি।
  **অপচনশীল খাদ্য**: যেমন- চাল, ডাল, বিভিন্ন ধরনের শুকনা বীজ ইত্যাদি।

## ২.৭ খাদ্যের উপাদান ও কাজ

খাদ্যের উপাদানগুলোকে সাধারণত ০৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- শর্করা বা শ্বেতসার (Carbohydrate)
- আমিষ (Protein)
- স্নেহ বা চর্বি (Fat)
- খনিজ লবণ (Minerals)
- খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)
- পানি (Water)

**শর্করা:** আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদনকারী প্রধান খাদ্য উপাদান হল শর্করা। দেহে শর্করার চাহিদা পুরণের জন্য আমরা সাধারণত ভাত, রুটি, আলু, যব, মিষ্টি আলু ইত্যাদি খেয়ে থাকি। আমাদের দেহে শর্করা জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল কাজগুলো হল-

- শরীরে শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। (১ গ্রাম শর্করা হতে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়)।

- আমিষ ও চর্বি সংশ্লেষে অংশগ্রহন করে।
- স্বল্প আমিষযুক্ত খাদ্যকে তাপ উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি দেয়।
- শাকসবজিতে সঞ্চিত সেলুলোজ কোষ্টবদ্ধতা দূর করে।
- কিছু শর্করা রক্তের কোলেস্টরলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
- অতিরিক্ত শর্করা শরীরে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।
- যকৃৎ ও পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন প্রয়োজনে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

**আমিষ:** আমাদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান হল আমিষ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে আমিষের উৎসগুলো হল- মাছ, মাংস, ডাল, দুধ, ডিম ইত্যাদি। মানবদেহে আমিষ জাতীয় খাদ্যের মূল কাজ হল-

- দেহ কোষ গঠন, দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করা।
- অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করা।
- মাতৃস্তনে দুধ উৎপাদনে আমিষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- দেহে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসয়নিক বিক্রিয়ায় সহায়ক হিসাবে এনজাইম বা উৎসেচক সৃষ্টি করা।
- দেহে শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য উপাদানের ঘাটতি হলে আমিষই শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। (১ গ্রাম আমিষ হতে ৪ কিলোক্যালোরি তাপশক্তি পাওয়া যায়)।

**স্নেহ বা চর্বি**: তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে স্নেহ পদার্থ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে স্নেহ জাতীয় উপাদানের উৎস হল রান্নায় ব্যবহৃত তেল, ডিমের কুসুম, মাছ ও মাংস ও দুধে বিদ্যমান চর্বি ইত্যাদি। স্নেহ জাতীয় পদার্থের মূল কাজ হল-

- জীবদেহে শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে।(১ গ্রাম স্নেহ থেকে ৯কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়)।
- তেল বা চর্বি তাপের কুপরিবাহী বলে দেহকে গরম রাখে।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ যেমন- ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি ও ভিটামিন কে পরিশোষণে দেহকে সহায়তা করে।
- উদ্ভিজ্জ তেলের অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড ত্বক ও কোষের সুস্থতা রক্ষা করে।
- খাদ্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থের ব্যবহারের ফলে তা সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়।

**খনিজ লবণ:** প্রতিদিন ভাত ও তরকারির সাথে আমরা যে লবণ খাই সেটা ছাড়াও প্রকৃতিতে আরও অনেক ধরনের লবণ আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের দেহকোষের গঠন ও দেহে তরলের সমতা রক্ষার জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ গঠনে সাহায্য করে। মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি এবং ফল খনিজ লবণের

প্রধান উৎস।। শরীরের জন্য অত্যাবশকীয় খনিজ পদার্থগুলো হলো- ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, আয়োডিন ইত্যাদি। আমাদের দেহে খনিজ পদার্থের কাজগুলো নিম্নরূপ-

- মানব দেহের হাড় ও দাঁতের গঠনে সহায়তা করে।
- হরমোন, এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে।
- রক্তের হিমোগ্লোবিন বা লাল রক্ত কণিকা তৈরি করে।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ করে।
- থাইরয়েড গ্রন্থি ও বিপাকের কাজ সম্পন্ন করে।
- স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা ও পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রন করে।
- দেহের প্রতিটি কোষে রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে।
- দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষা করে।
- হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

**ভিটামিন:** যে সকল জৈব খাদ্য উপাদান দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে ভিটামিন বলে। বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং শরীরের জন্যও খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আমাদের দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিনগুলো হল- ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই ও ভিটামিন কে। এসব ভিটামিন আমরা সাধারণত প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যবস্তু যেমন- বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি হতে পেয়ে থাকি।

পানি বা চর্বিতে দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- **চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:** ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে।
- **পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:** ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি।

মানব দেহে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিনের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- ভিটামিন এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে চোখের কর্মক্ষমতা রক্ষা করে এবং ত্বকের কোমলতা স্বাভাবিক রাখে।
- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দেহের বৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখে, রক্তকোষ গঠন করে, স্নায়ু কোষ সুস্থ রাখে ও বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করে।
- ভিটামিন সি রক্ত কোষ গঠন করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে। ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।
- ভিটামিন ডি খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণের মাধ্যমে দেহের হাড় গঠনে সহায়তা করে। ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের রিকেট ও বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়ে থাকে।
- ভিটামিন ই স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ, বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ, ভ্রূণের বৃদ্ধি ইত্যাদিতে সাহায্য করে।

- ভিটামিন কে রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিক রাখে এবং শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

**পানি:** পানি হলো একটি অজৈব, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং প্রায় বর্ণহীন এক রাসায়নিক পদার্থ, যা পৃথিবীর বারিমন্ডলের ও যে কোন জীবকোষ বা উদ্ভিদ কোষের একটি প্রধান উপাদান। তাই পানির অপর নাম জীবন। বিভিন্ন প্রকার ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, ডাব, তরমুজ, পেঁপে, আনারস, জাম্বুরা ইত্যাদি এবং শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে ৫০-৬৫% (গড়ে ৫৭-৬০%) পানি থাকে। শরীরে পানির ঘাটতি হলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। মানব দেহে পানির প্রধান কাজগুলো হল-

- খাদ্য পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করা।
- বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশণ করা।
- ঘাম নিঃসরণ ও বাস্পীভবনের দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা।

## ২.৮ বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন খাদ্য

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিতভাবে সুষম খাদ্যগ্রহণ করা অপরিহার্য। তবে সব বয়সের মানুষ একই ধরনের খাবার গ্রহণ করতে পারে না। তাই শিশু, পূর্ণ বয়স্ক ও বৃদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়।

**সুষম খাদ্য:** যেসব খাদ্যের মধ্যে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি পরিমাণমত বিদ্যমান থাকে তাদেরকে সুষম খাদ্য বলে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বয়স, চাহিদা ও পরিশ্রম অনুযায়ী সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত খাদ্য তালিকায় যত বেশি রকমের খাদ্যবস্তুর সমন্বয় করা যায় খাদ্য তত বেশি সুষম হয়। একজন লোক কোন ধরণের খাদ্য কি পরিমাণে খেলে তা সুষম হবে তা নির্ভর করে তার বয়স, পেশা, লিঙ্গ এবং শারীরিক অবস্থার ওপর। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সুষম খাদ্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

১. চাল বা গম + ডাল + শাক (পুঁইশাক/পালংশাক/ডাটা) বা সবজি (টমেটো, শিম, বরবটি, ফুলকপি, লাউ, করলা ইত্যাদি)।

২. চাল বা গম + ডাল + সামান্য মাছ + শাকসবজি।

৩. মায়ের দুধ (শিশুর জন্য সুষম খাদ্য) ।

৪. চাল বা গম + মাংস + শাকসবজি ।

৫. চাল বা গম + গরুর দুধ।

## ১.৯ বিভিন্ন বয়সের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা

- **০-৬ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য:** ০-৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য মায়ের দুধই উৎকৃষ্ট খাদ্য। ৫ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর সব পুষ্টি চাহিদা পুরণ করতে পারে।

- **৬-১২ মাসের শিশুর দৈনিক খাদ্য তালিকা:** ৬-১২ মাস বয়সী শিশুদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি নিচের খাদ্যগুলো খাওয়াতে হবে।

| খাবার | পরিমাণ | খাবার | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| নরম ভাত | ৪৫ গ্রাম (চাল) | দুধে ভেজানো রুটি | ৫০ গ্রাম |
| ডাল (নরম খিচুড়ি করে) | ১০ গ্রাম (২ চা চামচ) | আলু (চটকানো ) | ১ টি ছোট |
| শাকসবজি (ভাতের সাথে) | ৬০ গ্রাম | পাকা কলা | ১টি ছোট |
| ডিম (সম্ভব হলে) | ১টি | | |

- **১৪-১৮ বছরের ছেলে-মেয়েদের দৈনিক খাদ্য তালিকা:** ১৪-১৮ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের দৈনিক নিচের খাদ্যগুলো খাওয়া উচিৎ।

| খাবার | পরিমাণ | খাবার | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| চাল/আটা | ৪৫০ গ্রাম | মিষ্টি আলু/গোল আলু | ১২৫ গ্রাম |
| ডাল | ১০০ গ্রাম | তেল | ৬০ গ্রাম |
| শাক | ৯০ গ্রাম | ফল | ১টি |
| দুধ | ২৫০ মি.লি. | চিনি/গুড় | ৬০ গ্রাম |
| মাছ/মাংস/ডিম | ৮০ গ্রাম | অন্যান্য সবজি | ৯০ গ্রাম |

- **গর্ভবতী মায়ের জন্য দৈনিক খাদ্য তালিকা:** একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য প্রতিদিন নিচের খাদ্যগুলো গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

| খাবার | পরিমাণ | খাবার | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| চাল/আটা | ৪৫০ গ্রাম | ফল | ১টি |
| ডাল | ১০০ গ্রাম | দুধ | ২৫০ মি.লি. |
| শাক | ৯০ গ্রাম | চিনি/গুড় | ৩০ গ্রাম |
| মিষ্টি আলু/গোল আলু | ২০০ গ্রাম | মাছ/মাংস/ডিম | ৬০ গ্রাম |
| তেল | ৬০ গ্রাম | সবজি | ১০০ গ্রাম |

## ২.৯ বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতি

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জনগণের এক বিরাট অংশ বিভিন্ন ধরণের অপুষ্টিতে ভুগে। বাংলাদেশে প্রধানত মা ও শিশুরাই বেশি অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। এদেশে মায়েদের এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টির শিকার এবং তাদের উচ্চতার তুলনায় ওজন বেশ কম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নারীর পুষ্টিহীনতার দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষে। বাংলাদেশে প্রায় ৫০% এর বেশি নারী পুষ্টিহীনতার শিকার। পৃথিবীর যে দেশগুলোতে অপুষ্টিজনিত সমস্যা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় অর্ধেকই অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং ৫

বছরের কমবয়সী শিশুদের প্রায় ৫০% এর মৃত্যুর মূল কারণ হল পুষ্টিহীনতা। শুধুমাত্র অপুষ্টিজনিত কারণেই এখনও বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ২০০ শিশু মারা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রধান পুষ্টি সমস্যা ও সম্ভাব্য কারণগুলো নিম্নের ছকে দেওয়া হলো-

| ক্রমিক নং | সমস্যা | কারণ |
|---|---|---|
| ১. | অসম খাদ্য বণ্টন | খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অসমতা, ফলে অসম খাদ্য বণ্টন, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ, খাদ্য অপচয় ও খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করে। |
| ২. | ক্যালরি গ্রহণ হ্রাস | মাথাপিছু প্রতিদিন ২৩০১ কিলোক্যালরি থেকে ১৯৬১ কিলোক্যালরিতে নেমে গেছে। |
| ৩. | শিশুর অপুষ্টি | ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা বিভিন্ন মাত্রার অপুষ্টিতে আক্রান্ত। শিশু মৃত্যুর হার বেশি, শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মায় অর্থাৎ জন্মকালীন ওজন ২.৫ কেজিরও কম। অল্প বয়সে বিবাহ, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, মায়ের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি শিশুর অপুষ্টির প্রধান কারণ। |
| ৪. | মায়ের অপুষ্টি | প্রতি ১০০০ সন্তান জন্মদানে ৫৬ জন মা গর্ভকালীন জটিলতায় মারা যায়। দৈহিক ক্লেশ, অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, কুসংস্কার, মায়ের অপুষ্টির প্রধান কারণ। |
| ৫. | রক্তস্বল্পতা | মহিলা, গর্ভবতী মহিলা এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে। কৃমি রোগ, আমাশয়, আমিষ ও লৌহের ঘাটতি, ঘন ঘন সন্তান জন্মদান, রক্ত স্বল্পতার প্রধান কারণ। |
| ৬. | ভিটামিন 'এ' এর অভাব | প্রতি বছর ৩০,০০০ শিশু ভিটামিন এ এর অভাবে অন্ধ হয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু অন্ধ হয়ে পড়ার পর মারা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শাকসবজি খাওয়ানো হচ্ছে না, রান্নায় তেল ব্যবহার খুবই অল্প, শাল দুধ ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। |
| ৭. | আয়োডিনের অভাব | ৬৯% জনগণের মধ্যে আয়োডিনের অভাব। ৪৭% জনগণের মধ্যে গলগন্ড দেখা গেছে। ৫ লক্ষ লোক আয়োডিনের অভাবে মানসিক প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ। মাটি, পানি ও খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি এর অন্যতম কারণ। |
| ৮. | অন্যান্য অণু পুষ্টি উপাদানের অভাব | ফলিক এসিড, রিভোফ্লাভিন এবং দস্তা ইত্যাদি অনুখাদ্যের অভাব কিশোরী মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। আমিষ খাদ্যের স্বল্পতা, পেটের অসুখ প্রভৃতিতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। |

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

**জবের নাম: বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল সনাক্তকরণ।**

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড**

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।

১.২ বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল সনাক্তকরণের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ কৃষি ফসল নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ বিভিন্ন প্রকার কৃষি ফসল সনাক্ত করবে।

১.৫ কাজ শেষে কার্যস্থান পরিষ্কার করবে।

১.৬ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুযায়ী যথাস্থানে কৃষি ফসল সংরক্ষণ করবে।

১.৭ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- অ্যাপ্রন
- হ্যান্ড গ্লোভস
- সেফটি স্যু
- হেলমেট
- মাস্ক
- সেফটি গগলস

**প্রয়োজনীয় হ্যান্ড টুলস**

- ম্যানুয়াল
- ট্রে/ডিস
- চিমটা

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- শর্করা জাতীয় ফসল: ধান, গম, ভুট্টা, যব, চিনা, কাউন, আখ, তাল, খেজুর প্রভৃতি।
- স্নেহ জাতীয় ফসল: সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম প্রভৃতি।
- মশলা জাতীয় ফসল: হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি।

**কার্যপদ্ধতি**

- কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করতে হবে।
- বিভিন্ন কৃষি ফসল সংগ্রহ করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী ম্যানুয়াল, টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
- ট্রে/ডিসে বিভিন্ন কৃষি ফসল নিয়ে সেই ফসল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে এবং কোনটা কোন ধরনের ফসল তা চিহ্নিত করে আলাদা করবে এবং ফসলের নাম খাতায় নোট করবে।
- কৃষি ফসল আলাদা করে জারে ভরে জারের গায়ে নাম লিখে ল্যাবে সংরক্ষণ করবে।
- কৃষি ফসল শনাক্ত করা হয়ে গেলে টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করে যথাস্থানে রাখতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম খুলে ভালো করে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে।

**এই জবটি বিভিন্ন ধরনের ফসল ব্যবহার করে পাঁচবার অনুশীলন করতে হবে।**

**সতর্কতা**

- শর্করা, স্নেহ ও মশলা জাতীয় ফসল আলাদা আলাদা ট্রে/ডিসে নিয়ে সনাক্ত করব।
- খুব সাবধানতার সাথে কৃষি ফসল সনাক্ত করব।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করব।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করব।

## অনুশীলনী-২

**অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. মৌসুম ভিত্তিক ফসল কত প্রকার?
২. কয়েকটি শর্করা জাতীয় খাদ্যের নাম লেখ?
৩. মাঠফসল কাকে বলে?
৪. উদ্যান ফসল কাকে বলে?
৫. আমাদের দেশের তেল ফসলগুলো কী কী?
৬. আঁশ জাতীয় ফসল কী কী?
৯. শর্করা কি?
১০. আমিষ কি?
১১. ভিটামিন কত প্রকার ও কী কী?
১২. ভিটামিন এ এর অভাবে কি রোগ হয়?
১৩. ভিটামিন বি এর অভাবে কি রোগ হয়?
১৪. ভিটামিন সি এর অভাবে কি রোগ হয়?
১৫. ভিটামিন ডি এর অভাবে কি রোগ হয়? ২০২৪

১৬. ভিটামিন কে কি কাজ করে?

১৭. প্রতিদিন তোমার কতটুকু দুধ পান করা উচিৎ?

১৮. পুষ্ট দানা কি?

১৯. অপুষ্ট দানা কি?

২০. অপদ্রব্য কি?

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রবি ফসল কাকে বলে? কয়েকটি রবি ফসলের নাম লিখ।

২. খরিফ ফসল কাকে বলে? কয়েকটি খরিফ ফসলের নাম লিখ।

৩. খাদ্যের মূল উপাদান কয়টি ও কি কি?

৪. মানবদেহে শর্করার কাজ কী?

৫. মানবদেহে আমিষের কাজ কী?

৬. আমাদের দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ উপাদানগুলো কী কী?

৭. মানবদেহে স্নেহজাতীয় পদার্থের কাজ কি?

৮. মানবদেহে খনিজ লবণের কাজ কি?

৯. মানবদেহে ভিটামিন এ এর কাজ কি?

১০. মানবদেহে পানির কাজ কি?

১১. আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যকে সুষম করতে হলে কি করতে হবে?

১২. খাদ্যে আমিষ ও শর্করার উৎসগুলো কি কি?

১৩. খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও খনিজ লবণের উৎস কি কি?

১৪. মানব দেহে ভিটামিন ই এর কাজ কি ?

১৫. মানব দেহে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর কাজ কি ?

১৬. মানব দেহে ভিটামিন কে এর কাজ কি ?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবহার ভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. খাদ্যের উপাদানগুলোর কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩. কার্যকারিতা অনুসারে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. সুষম খাদ্য কী? ১৪-১৮ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কর।

৫. ০-৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য সুষম খাদ্য কোনটি? একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কর।

৬. বাংলাদেশের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২০২৪

# তৃতীয় অধ্যায়

# ধানের পরিচিত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

# Introduction to Rice, Processing and Storage

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং সারা বিশ্বে এটি দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। ধান গাছ মূলত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি ধান উৎপন্ন হয়। তবে দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশালে সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়। বিশ্বব্যাপী ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলো হচ্ছে- চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ভুটান, কেনিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, নেপাল, জাপান, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়। ধানবীজ বা চাল সুপ্রাচীনকাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাদ্য।

**এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-**

- ধানের মিলিং এবং মিলিং মেশিন সম্পর্কে জানতে পারব।
- গোলাজাত শস্যের সংরক্ষণ ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারব।
- ধান থেকে চিড়া, মুড়ি, বিভিন্ন পিঠা তৈরি করতে পারব।

## ৩.১ ধানের পরিচিতি

ধান হল অতি পরিচিত একটি ঘাস জাতীয় একবীজপত্রী উদ্ভিদ। ধান গাছ সাধারণত ১-১.৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর পাতা সরু ও লম্বা আকৃতির হয়। পাতা ৫০-১০০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা ও ২-২.৫ সে.মি. প্রশস্ত হয়ে থাকে। সাধারণত বায়ুর সাহায্যে এর পরাগায়ন হয়ে থাকে। পুষ্পমঞ্জরীতে ফুলগুলো ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাজানো থাকে। ধান গাছের বীজকেই প্রধানত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

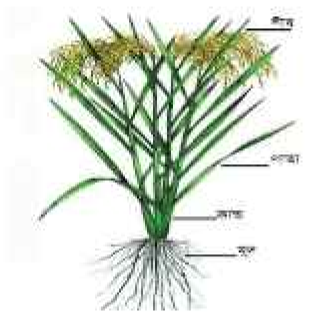

চিত্র ৩.১: একটি আদর্শ ধান গাছ

### ৩.১.১ ধানের সংজ্ঞা

ধান হল এক ধরনের তন্ডুল বা দানা জাতীয় ফসলের পরিপক্ক ডিম্বাশয় বা ফল। এটি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ধানে একটি করে বিচি বা বীজ থাকে যার বীজপত্রও একটি। তাই ধান এক ধরনের একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

**চাল:** ধানের খোসা সরানোর পর যে সস্যল বা দানাদার অংশ পাওয়া যায় তাকে চাউল বা চাল বলে। চাল রান্না করলে ভাত হয়। চালে সাধারণত ৭৯% শর্করা, ৬.৪% আমিষ, ০.৪% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে। ভাত বা চাউল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য মূলত শর্করার চাহিদা পূরণের জন্যই খাওয়া হয়।

### ৩.১.২ ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন

চাষাবাদের সময়ের উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে প্রধানত তিন ধরনের ধান উৎপন্ন হয়। যেমন-

**আউশ ধান:** এই ধানের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ৩০ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল এবং ধান কাটার উপযুক্ত সময় ৩০ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশে আউশ ধানের যে জাতগুলো সচারাচর পাওয়া যায় সেগুলো হল আটলাই, কটকতারা, কুমারী, চারনক, দুলার, ধলাষাইট, ধারাইল, পটুয়াখালী, পশুর, পানবিড়া, পাষপাই, পুখী, মরিচবেটি, হরিণমুদা, হাসিকলমি, সূর্যমুখ, শনি, ষাইটা, ভৈরা, শঙ্কপটি, কালাবকরি, খড়াজামড়ি, মুলকে আউশ, কালামানিক, ভাতুরি ইত্যাদি।

**আমন ধান:** শীতকালীন ধানকে বাংলাদেশে আমন ধান বলা হয়। এর অপর নাম আগুনী ও হৈমন্তিক। রোপা আমনের রোপণ সময় হচ্ছে ১৫ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট। আমন ধান কাটার উপযুক্ত সময় ১৫ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আমন ধান তিন প্রকার। যথা-

**রোপা আমন :** চারা প্রস্তুত করে রোপণ করা হয়।

**আছরা/বোনা আমন :** এই ধান ছিটিয়ে বোনা হয়।

**বাওয়া আমন :** বিল অঞ্চলে এই আমন উৎপন্ন করা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির ধানের স্থানীয় নাম রয়েছে। যেমন- ইন্দ্রশাইল, কাতিবাগদার, ক্ষীরাইজালি, গদালাকি, গাবুরা, চিংড়িখুশি, চিটবাজ, জেশোবালাম, ঝিঙ্গাশাইল, ঢেপি, তিলককাচারী, দাউদিন, দাদখানি, দুদলাকি, দুধসর, ধলা আমন, নাগরা, নাজিরশাইল, পাটনাই, বাঁশফুল, বাইশ বিশ, বাদশাভোগ, ভাসা মানিক, মালিয়াডাক্র, রাজাশাইল, রূপশাইল, লাটশাইল, হাতিশাইল ইত্যাদি।

**বোরো ধান:** সাধারণত নিচু জমিতে এই ধানের চাষ করা হয়। বোরো মূলত রোপণ করে চাষ করা হয়। সে কারণে একে রোপা ধান হিসাবেও কোনো কোনো অঞ্চলে অভিহিত করা হয়। তবে বসন্তকালে এই ধান জন্মে বলে একে বাসন্তিক ধানও বলা হয়। বোরো ধান রোপণের উপযুক্ত সময় অক্টোবর-নভেম্বর এবং ধান কাটার সময় এপ্রিল-জুন মাস। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বোরো ধানগুলো হল- আমন বোরো, খৈয়াবোরো, টুপা, পশুশাইল, বানাজিরা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন নিম্নের ছকে দেয়া হলো।

**সারণি-১ :** বিভিন্ন ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন

| ক্রমিক নং | ধানের জাত | জাতের ধরন | মৌসুম | জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ | গড় ফলন হেক্টর প্রতি (টন) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বিআর-১ (চান্দিনা) | উচ্চ ফলনশীল | বোরো | চাল খাটো, মোটা | ৫.৫ |
| | | | আউশ | চাল মাঝারি চিকন ও সাদা | ৪.০ |
| ২. | বিআর-৬ | উচ্চ ফলনশীল | বোরো | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা | ৪.৫ |
| | | | আউশ | | ৩.৫ |
| ৩. | ব্রি ধান-২৭ | উচ্চ ফলনশীল | আউশ | চাল মাঝারি মোটা, বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী | ৪.০ |
| ৪. | ব্রি ধান-৩১ | উচ্চ ফলনশীল | আমন | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৫.০ |
| ৫. | ব্রি ধান-৫৬ | খরা সহিষ্ণু | রোপা আমন | চাল লম্বা মোটা, সাদা, খরা সহিষ্ণু | ৪.০-৪.৫ |
| ৬. | ব্রি ধান-৫৭ | খরা পরিহারকারী | রোপা আমন | চাল জিরাশাইল এবং মিনিকিট চালের মত, খরা সহিষ্ণু | ৪.০ |
| ৭. | ব্রি ধান-৫৮ | উচ্চ ফলনশীল | বোরো | দানা আনেকটা ব্রি ধান২৯-এর মতো, তবে সামান্য চিকন | ৭.২ |
| ৮. | বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ | জিংক সমৃদ্ধ | বোরো | চাল মাঝারি চিকন এবং রং সাদা | ৭.৭ |
| ৯. | ব্রি হাইব্রিড ধান-১ | হাইব্রিড | বোরো | চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা | ৮.৫ |
| ১০. | ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ | হাইব্রিড | রোপা আমন | চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা | ৬.৫ |

## ৩.১.২ ধানের বিভিন্ন অংশ ও পুষ্টিমান

ধানের বিভিন্ন অংশ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

- **তুষ (Husk):** এটি ধানের খসখসে ও শক্ত বহিরাবরণ যা চাউলকে রক্ষা করে।

- **কুঁড়া (Bran):** চালের বহিরাবরণকে কুঁড়া বলে। ধানের তুষ বের করে নেওয়ার পর চাল বা দানার উপরের লালচে ও খুবই পাতলা আবরণ ছাঁটাই করলে তা কুঁড়া হয়ে বেরিয়ে আসে।

- **অ্যালিউরণ (Aleurone) স্তর:** তুষ ও কুঁড়া বের করে নেওয়ার পরও চালের উপর হালকা বাদামি রঙের গুঁড়ার মতো যে স্তরটি থাকে তাকে অ্যালিউরণ স্তর বলে। অ্যালিউরণ স্তরে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে। ঢেঁকিতে ভানলে চালের অ্যালিউরণ স্তর থেকে যায় কিন্তু মেশিনে ভাঙ্গালে তা থাকে না।

- **সস্য (Endosperm):** ধানের মূল দানাই হচ্ছে সস্য বা এন্ডোসপার্ম। এটি ধানের ৭৫ ভাগ অংশ এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- **ভ্রূণ (Embryo):** চালের দানার নিম্ন প্রান্তে অর্থাৎ বোঁটার দিকের প্রান্তে ভ্রূণ অবস্থিত। চাউলে বিদ্যমান ভিটামিনগুলো বেশিরভাগই ভ্রূণে থাকে।

**চালের পুষ্টিমান:** চালের পুষ্টি উপাদানের মধ্যে ৮০ ভাগই শর্করা যা চালের ভিতরের দিকে বা কেন্দ্রে থাকে। কলে ছাঁটা ও ঢেঁকি ছাঁটা চালের পুষ্টিমান নিয়ে দেওয়া হলো-

**সারণি-২ :** চালের পুষ্টিমান গ্রামে (শতকরা হারে)

| চাষ ও তুষ | শর্করা | প্রোটিন | পানি | চর্বি | আঁশ | খনিজ পদার্থ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢেঁকি ছাঁটা চাল | ৮০ | ৬.৫-১৬ | ১১.৬১ | ১.৭-৩.৫ | ০.২-২.৬ | ১.২ |
| কলে ছাঁটা চাল | ৮০ | ৭.৬ | ১১.৪১ | ০.৫ | ০.২ | ০.৫ |
| তুষ | - | ১৫.৫ | ০.৫-১ | ২০.০ | ১২.৫ | ১২ |

## ৩.১.৪ ধানের ব্যবহার বিধি

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হল ভাত। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য চাল বা চাউলজাত খাদ্যদ্রব্য। শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ৮০ ভাগই হলো চাল বা ভাত। ধান বা চাল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। যেমন-

**মানুষের খাদ্য-**

- ভাত
- চিড়া
- খৈ, খৈ এর মোয়া ও মুড়কি
- মোয়া ও মুড়কি
- জাউ ভাত
- পোলাও ও বিরিয়ানি
- খিচুড়ি
- মুড়ি, মিষ্টিমুড়ি ও ঝালমুড়ি
- বেকারিতে বিভিন্ন খাদ্যে চালের গুঁড়ি ব্যবহার
- চালের আটা বা গুঁড়ি (রুটি ও বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরির জন্য) ইত্যাদি।

**পশুপাখির খাদ্য-**

- ধানের কুঁড়া
- ভাঙ্গা চাল
- ধানের খড়

## ৩.১.৫ ধানের সংরক্ষণ পদ্ধতি

ধান কাটার পর সাধারণত রোদে শুকানো হয়। রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা কমিয়ে ১২-১৪% এ আনা হয়। তারপর প্যাকেটজাত করে অথবা খোলা অবস্থায় গোলা ঘরে বা সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়। ধান সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল সারা বছর খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা, পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের জন্য বীজের জীবনীশক্তি অটুট রাখা, কাঙ্ক্ষিত দামে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করা এবং দুর্যোগকালে খাদ্যঘাটতি মেটানো।

ধান বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা-

- **খামারবাড়িতে সংরক্ষণ:** খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য বেশির ভাগ ধান বা দানাশস্য খামারের ভিতরেই গুদামজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য যেসব পাত্র ব্যবহার করা হয় তা হল- চটের বস্তা, কাঠের বাক্স, বাঁশের ঝুড়ি বা ডোল ও ড্রাম।
- **ফসলের গোলায় সংরক্ষণ:** এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ধান গুদামজাত করার জন্য ছোট আকারের কাঠামো তৈরি করা হয়। যেমন- কাঠ, বাঁশ, ধাতব শিট বা সিমেন্টের ঢালাই ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত গোলা।

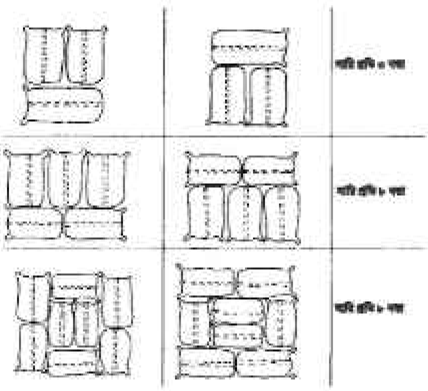

চিত্র ৩.২: গুদামে ধানের বস্তা সাজানো

চিত্র ৩.৩: সাইলো

- **পাকা গুদামে সংরক্ষণ:** এ ক্ষেত্রে সাধারণত চালের মিলে এবং সরকারি সংস্থায় পাকা গুদামে রেখে ধান বা চাউল সংরক্ষণ করা হয়।
- **ঢালাও গুদামে সংরক্ষণ:** এ ক্ষেত্রে সাধারণত শস্যদানা গুদাম ঘরের মেঝেতে স্তূপাকারে রাখা হয়। তবে আলো-বাতাস চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হয়।
- **সাইলোতে (Silo) সংরক্ষণ:** খাদ্য মন্ত্রণালয় দীর্ঘ সময় ধরে ধান বা চাল সংরক্ষণের জন্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গুদাম তৈরি করে রাখে তাকে সাইলো বলে। এসব সাইলোতে কীটনাশকমুক্ত মজুত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই থেকে তিন বছর খাদ্য শস্যের পুষ্টিমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা সম্ভব। আমাদের দেশে এই সকল সাইলোর মাধ্যমে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংরক্ষিত শস্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব।

### ৩.১.৬ গোলাজাত ধানে পোকামাকড় চিহ্নিতকরণ ও দমন ব্যবস্থা

**ধানের গোলাজাত পোকামাকড়:** প্রায় ৫০ ধরনের পোকামাকড় আমাদের দেশে গোলাজাত শস্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে। পরিবেশগত দিক থেকে পোকামাকড়ের অবস্থা ও বংশ বিস্তারের জন্য বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে উত্তম স্থান। এখানে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে পোকামাকড় দ্রুত বংশবিস্তার করে। ফলে গুদামজাত শস্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে পোকাক্রান্ত হয় । নিম্নে গুদামজাত ধানে আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকামাকড়ের পরিচিতি ও ক্ষতির প্রকৃতি বর্ণনা করা হলো-

- **ধানের শুঁড় পোকা:** এই পোকা শস্যের মধ্যে গর্ত করে শস্যের শাঁস খেয়ে ফেলে। বাংলাদেশে এই পোকা বর্ষাকালে বিশেষ করে আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত গোলাজাত ধানের বেশি ক্ষতি করে থাকে।
- **কেড়ি পোকা:** এই পোকা সাধারণত ধান ও গম ফসলের বেশি ক্ষতি করে থাকে। এদের চোয়াল অত্যন্ত শক্তিশালী। চোয়ালের সাহায্যে এরা শস্যদানার ভেতরের অংশ কুরে কুরে খায়।। খাওয়ার ফলে শস্যদানার ভেতরের অংশ ফাঁপা হয়ে যায় এবং শুধু বাইরের খোঁসাটি অবশিষ্ট থাকে।
- **লাল শূসরী পোকা:** এদের শরীর দেখতে লাল ও বাদামি রঙের হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়েই গুদামজাত শস্যদানা বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যে আক্রমণ করে। সাধারণত এরা অক্ষত বা পূর্ণ দানায় আক্রমণ করে না। পোকায় আক্রান্ত ময়দা, সুজি ও আটা একসাথে দলা বেঁধে যায় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

চিত্র ৩.৩: ধানের ক্ষতিকারক পোকা

- **খাপড়া বিটল:** গুদামজাত শস্যের জন্য এটি একটি মারাত্মক পোকা। এ পোকা না খেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। এরা গুদামজাত শস্যের উপরের স্তরে আক্রমণ করে এবং ধানের বেশি ভিতরে ঢোকে না।
- **ধানের সুরুই পোকা:** এ পোকার কীড়া ধানের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে থাকে। আক্রান্ত ধানের মধ্যে এরা গোলাকার ছিদ্র করে খায়। সাধারণত এরা ধানের উপরের স্তরের বেশি ক্ষতি করে থাকে।
- **চালের সুরুই পোকা:** এই পোকা ধানের সুরুই পোকা থেকে একটু বড়। এ পোকা চালের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। কীড়াগুলো এক প্রকার রেশমি জাল তৈরি করে এবং জালের ভিতরে থেকে চালের ক্ষতি করে থাকে।

### ৩.১.৭ গুদামজাত শস্যের পোকামাকড় দমন

গুদামজাত শস্যের পোকা দমনের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়।

**প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা-**

- শস্য কাটার পরবর্তী সময়ে দানাশস্যকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।
- রোদে শুকানোর সময় আশেপাশের গুদাম থেকে পোকা এসে যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দানাশস্যকে ভালোভাবে বাছাই করে গোলাজাত করতে হবে।
- গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গোলাজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- পাত্রে শস্য ভর্তি করার পর পাত্রের মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।
- শস্য গোলাজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হবে।
- প্রতি কেজি শস্য দানার সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

**প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা-**

- বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিডিভিপি (১০০) ইত্যাদির ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

### ৩.১.৮ ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি

ধান থেকে উৎপাদিত চাল আমাদের দেশে দুইভাবে ব্যবহার করা হয়। যথা-

- **আতপ চাল (White rice):** ধান শুকিয়ে সরাসরি মিলিং করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে আতপ চাল বলে।
- **সিদ্ধচাল (Parboiled rice):** ধানকে সিদ্ধ করার পর শুকিয়ে মিলিং করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে সিদ্ধ চাল বলে।

**ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি**

কৃষকের বাড়িতে হাঁড়ি পাতিল, ডেগচি বা কড়াইতে ধান সিদ্ধ করা হয়। প্রথমে ডুবন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখা (কমপক্ষে ৮ ঘন্টা) ধান সিদ্ধ করার পাত্রে ভর্তি করা হয় এবং পাত্রে সামান্য পানি দেওয়া। পাত্র চুলার উপর

২০২৪

রেখে জ্বাল দিতে থাকলে যখন বেশির ভাগ ধান ফেটে যায় (প্রায় ২০ মিনিট প ) তখন পাত্রের সিদ্ধ ধান উঠানে বা চাতালে পাতলা স্তর করে বিছিয়ে দিয়ে রোদে শুকানো (ধানে পানির পরিমাণ ১২-১৪% না হওয়া পর্যন্ত) হয়। ধান সিদ্ধ করার পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা- প্রচলিত পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতি।

**প্রচলিত পদ্ধতি:** আমাদের দেশে বেশির ভাগ সিদ্ধ ধানই প্রচলিত বা দেশীয় পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা হয়। এ পদ্ধতি আবার দুই প্রকারের। যথা-

- **একসিদ্ধ পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে ধান বিভিন্ন পাত্রে ১-২ দিন পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করে শুকানো হয়।
- **দুইসিদ্ধ পদ্ধতি:** ধান পানিতে ডুবানোর পুর্বে আংশিক পানিপুর্ণ পাত্রে রেখে তাপ প্রয়োগ করা হয়। তাপের ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ধানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয় এ অবস্থায় গরম ধানকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। প্রায় ১ দিন পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখার পর ভিজা ধানকে উপরে বর্ণিত একসিদ্ধ পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা হয়। দুই সিদ্ধের চাল বেশ শক্ত হয়। উভয় পদ্ধতিতেই ধান সিদ্ধ করার সময় যখন ধানের খোসা ফেটে দুই ভাগ হয়ে যায় তখন ধান সিদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

**আধুনিক পদ্ধতি:** ধান সিদ্ধকরণের আধুনিক পদ্ধতি প্রধানত তিন ধরনের।

**ধান ভিজিয়ে সিদ্ধ করার ধীর পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে পাকা চাতালের উপর চোঙ্গাকৃতির এক বা একাধিক ট্যাংকে (tank) ধান সিদ্ধ করা হয়। ট্যাংকগুলো ইট ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মাণ করা হয়। ২৪-৭২ ঘন্টা ভিজানো ধান ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। এই ট্যাংক একটি নল দ্বারা বয়লারের সাথে সংযুক্ত থাকে। নলটি ট্যাংকের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢুকানো থাকে। বয়লার থেকে পানির বাষ্প সমস্ত ট্যাংকের ধানে ছড়িয়ে পড়ে। বাষ্প নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নলে ভালভ (Valve) লাগানো থাকে। বয়লারের পানি চুলার আগুনে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পের তাপে যখন সমস্ত ধান সিদ্ধ হয়ে খোসা ফেটে যায় তখন ট্যাংকের নিচের ভালভ খুলে সিদ্ধ ধান বের করে আনা হয়। অতঃপর তা শুকানো হয়।

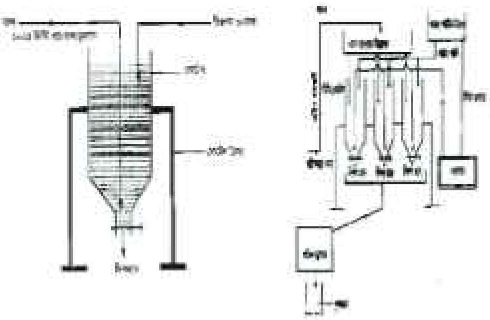

চিত্র ৩.৪: ধান ভিজানো ও সিদ্ধকরণ

- **প্রেসার পদ্ধতি:** এটি ধান সিদ্ধকরণের একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এতে ধানকে ৭০°সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর উক্ত ধানে ১৮ মিনিট গরম বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে উচ্চ চাপে ধানের মধ্যে বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। এতে সিদ্ধ ধানের রং কিছুটা হলদে হয় এবং ভাঙ্গা চালের পরিমাণ কম হয়।

### ৩.১.৯ ধান মিলিং

চিত্র ৩.৫: ঢেঁকিতে ধান ভানা

খান থেকে তুষ ও কুঁড়া সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াকেই মিলিং বা ধান ভাঙানো বলে। ধান মিলিং দুই ভাবে করা যায়। যথা- প্রচলিত মিলিং ও আধুনিক মিলিং

- **প্রচলিত মিলিং :** প্রচলিত মিলিং বা ধান ভাঙানোতে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা হল- গাইল ও সিয়া (হামান দিস্তা) এবং ঢেঁকি।
- **আধুনিক মিলিং:** আধুনিক ধান মিলিং প্রক্রিয়ায় অল্প সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি ধান মিলিং করা যায়। এই পদ্ধতিতে চাউল পছন্দমত আকার করে পলিশিং করা যায়।

চিত্র ৩.৬: হামান দিস্তায় ধান ভানা

**আধুনিক মিলিং এর প্রবাহচিত্র নিম্নরূপ-**

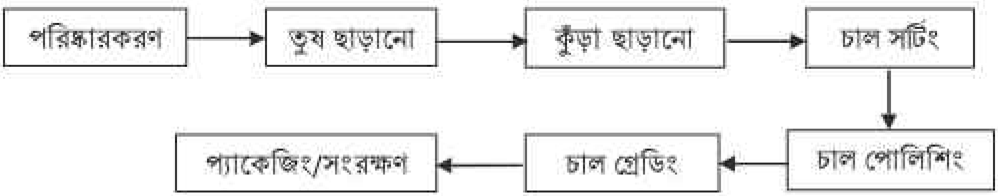


## ৩.২ ধান থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

ধান থেকে আমরা চাল, খৈ, চিড়া পেয়ে থাকি। আবার চাল থেকে মুড়ি, মুড়কি, মোয়া তৈরি করা হয়। তাছাড়া চালের গুড়ি থেকে বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। নিচে ধান থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের তালিকা দেওয়া হল-

- ভাত
- চিড়া
- খৈ, খৈ এর মোয়া ও মুড়কি
- মোয়া ও মুড়কি
- নাড়ু
- জাউ ভাত
- পোলাও ও বিরিয়ানি
- খিচুড়ি

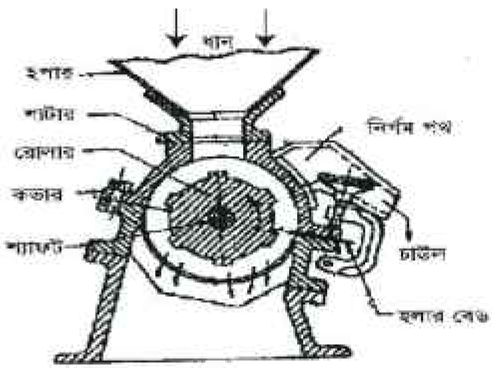


চিত্র ৩.৭: ধান কলের বিভিন্ন অংশ

- মুড়ি, মিষ্টিমুড়ি ও ঝালমুড়ি
- ফ্রায়েড রাইস
- পায়েস ও ক্ষীর
- স্যুপ ও মাড় বা ফেন
- ভাতের পাপড়
- বেগুনি তৈরিতে চালের আটা
- চিপস তৈরি
- চাল ভেজে ছাতু
- ওরসালাইন তৈরিতে
- বেকারিতে বিভিন্ন খাদ্যে চালের গুঁড়ি ব্যবহার
- চালের আটা বা গুঁড়ি (রুটি ও বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরির জন্য) ইত্যাদি

### ৩.২.১ ধান থেকে মুড়ি, চিড়া ও খৈ তৈরি

**মুড়ি (Puffed Rice) তৈরির পদ্ধতি:** ধান থেকে মুড়ি তৈরির প্রবাহচিত্র নিচে দেওয়া হল-

ধান সংগ্রহ → পানিতে ভিজানো (জলীয় অংশ ৩০%) → পানি অপসারণ → ধান সিদ্ধকরণ → শুকানো (জলীয় অংশ ১২-১৪%) → মিলিং → প্যান এ তাপ প্রয়োগ (১১০°সে.) → লবণ যোগ (১০ মি.গ্রা./১০০ মি.লি. পানিতে প্রতি কেজি চালের জন্য) → গরম বালুতে ভাজা (২৫০°সে.) → মুড়ি (জলীয় অংশ ০.৫%) → প্যাকেজিং

**ধান থেকে চিড়া তৈরির পদ্ধতি:** ধান থেকে তৈরি চিড়া একটি সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার। সাধারণত চিড়া দ্বারা হালকা নাস্তা জাতীয় খাবার তৈরি করা হয়। যেমন চিড়ার মোয়া, চিড়া ভাজা, চিড়া পোলাও, চানাচুর ইত্যাদি। চিড়া ভিজিয়ে তাতে সবরি কলা ও গুড় চটকে খেলে পেট ভালো থাকে। ধান থেকে চিড়া তৈরির প্রবাহচিত্র নিচে দেওয়া হল-

চিত্র ৩.৮: মুড়ি

ধান সংগ্রহ → ধান ভিজানো (২৮°সে., জলীয় অংশ ৩০%, সময় ১২-১৮ ঘন্টা) → পানি অপসারণ → ধান ভাজা (২০০-২৫০°সে., ২০-৩০ সেকেন্ড)

ধান চেপ্টাকরণ (১৪৫ কেজি/বর্গ সে.মি.) → ধান ঠান্ডাকরণ (৪২°সে., জলীয় অংশ ১৯%) → চিড়া সংগ্রহ ও প্যাকেটজাতকরণ

চিত্র ৩.৯: ধানের চিড়া

চিত্র ৩.১০: ধানের খৈ

**ধান থেকে খৈ তৈরি:** বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে নাস্তা হিসেবে খৈ বেশ জনপ্রিয়। রোদে শুকানো ধান থেকে খৈ তৈরি করা হয়। সিদ্ধ করা ধান থেকে খৈ তৈরি করা যায় না। বালু উত্তপ্ত হলে বালুর পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ধান হাঁড়িতে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি নাড়লে কিছুক্ষণের মধ্যে ধান খৈ এ পরিণত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দিয়ে ধরে নেড়ে সব ধান ফুটিয়ে খৈ এ পরিণত করা হয়। খৈ ফোটা শেষ হলে চালুনিতে সব ঢেলে তাড়াতাড়ি চালা হয়। বালু ফেলে এবং ধানের খোসা বা তুষ বাদ দিয়ে পরিষ্কার খৈ সংগ্রহ করতে হয়। বিন্নি ও কনকচুড় জাতের ধান থেকে খৈ তৈরি করা যায়। মুড়ির মতো খৈ থেকে মুড়কি, মোয়া তৈরি করা যায়। দই সহযোগে খৈ একটি মজাদার খাবার।

## ৩.২.২ চাল থেকে খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

চাল থেকে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। চাল থেকে তিন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত হয়। যথা-

- **শুকনো খাবার:** মুড়ি, খই, চিড়া ইত্যাদি
- **সিদ্ধ খাবার:** ভাত, পায়েস, ক্ষীর, ফিরণি, জর্দা ইত্যাদি
- **ভাজা খাবার:** চাল ভাজা, ফ্রায়েড রাইস ইত্যাদি

**পায়েস রান্নার প্রয়োজনীয় উপাদান**

- দুধ ২ লিটার
- সুগন্ধি চাল ২০০ গ্রাম
- কিসমিস ২০ গ্রাম
- কাজুবাদাম ২০ গ্রাম
- চিনি ৬০০ গ্রাম
- এলাচ ৩ থেকে ৪ টি

চিত্র ৩.১১: পায়েস।

## পায়েস প্রস্তুত প্রণালী

- একটা পাত্রে চাল নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- চুলায় পাত্রে দুধ নিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে দুধ কিছুটা ঘন করতে হবে।
- দুধ ঘন হয়ে আসলে তাতে চাল যোগ করে চাল সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।
- চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে চিনি যোগ করে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে।
- কাজু বাদাম ও কিসমিস দিয়ে ৫ থেকে ৬ মিনিট রান্না করতে হবে।
- রান্না করার পর পায়েসে এলাচ যোগ করে একটু নেড়ে চুলা থেকে পাত্র নামাতে হবে।
- চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করার জন্য পায়েসের পাত্র কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে।
- ঠান্ডা হয়ে গেলে পায়েস পরিবেশন করা যাবে।

## শাহী জর্দা রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণ

চিত্র ৩.১২: শাহী জর্দা

- পোলাও চাল বা বাসমতি চাল- ২৫০ গ্রাম
- এলাচ ৬-৭ টি
- দারুচিনি ৪-৫ টি
- লবঙ্গ ২-৪ টি
- চিনি ২০০-২৫০ গ্রাম
- ঘি- ২-৩ চা চামচ
- আনারস ৪ ভাগের ১ ভাগ ছোট ছোট টুকরা করে রস সহ।
- তেল ৫০ মি.লি. অথবা পরিমাণমত।
- কিশমিশ ১ মুঠ
- জর্দা রঙ/ ফুড গ্রেড কালার ১-২ চা চামচ
- মোরব্বা কুচি পরিমানমত
- বাদাম কুচি পরিমানমত
- বেবি সুইটস ১২-১৫ টি

**শাহী জর্দা প্রস্তুত প্রণালী :** প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে। পোলাও এর চাল হলে ১৫ মিনিট আর বাসমতি চাল হলে ২৫ মিনিট রাখতে হবে। এতে করে রান্নার পর চাল ভেঙ্গে যাবে না আর লম্বাটে হবে। এরপর পরিমান মত পানি, তেজপাতা, সামান্য লবণ, ১ চা চামচ তেল ও জর্দার রঙ মিশিয়ে পানি ফুটাতে হবে। পানি ফুটলে চাল দিয়ে ৫-৮ মিনিট সিদ্ধ করে নিতে হবে। পোলাওয়ের চাল হলে ৫-৬ মিনিট আর বাসমতি চাল হলে ৭-৮ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ চাল পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে। এবার একটি প্যানে ঘি গরম করে মিডিয়াম আঁচে আস্ত গরম মসলা একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে আনারসের টুকরাগুলো, চিনি এবং পানি দিয়ে একসাথে নাড়তে হবে।পানি ফুটে বলক উঠলে সিদ্ধ চাল যোগ করে ভালোভাবে

মিশাতে হবে। এবার ঢেকে দিয়ে চুলা মিডিয়াম আঁচ থেকেও কমিয়ে দিয়ে ১০-১৫ মিনিট রান্না করতে হবে। ১৫ মিনিট পর ১ চা চামচ ঘি দিয়ে হালকা নেড়ে দিতে হবে। এবার ১০-১৫ মিনিট ঢেকে রেখে দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন সিদ্ধ ভাত বেশি ফুটে না যায়। এখন জর্দা নামিয়ে বাদাম কুচি এবং বেবি সুইটস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

### ৩.২.৩ আতপ চাল ও সিদ্ধ চাল থেকে খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

**আতপ চাল থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য**

- খিচুড়ি
- পায়েস
- ক্ষীর
- জর্দা
- পোলাও
- বিরিয়ানি ও তেহারি
- ফিরনি
- চালের গুঁড়া বা আটা
- চালের স্যাঁকা রুটি
- ফ্রায়েড রাইস .
- চালের গুঁড়া দিয়ে বিভিন্ন পিঠা

**চিকেন বিরিয়ানি তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- মুরগির মাংসের ৮ টি বড় টুকরো
- বাসমতি চাল ১ কেজি
- গোলমরিচ ৫ টি
- টকদই ১ কাপ
- আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- লংকা গুড়ো ১ চা চামচ
- পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
- টমেটো ২ টি (টুকরো করা)
- মেথি আধা চা চামচ
- লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
- তেল ১ কাপ
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- গরম মসলা গুড়ো ১ চা চামচ

চিত্র ৩.১৩: চিকেন বিরিয়ানি

১০১৪

- বিরিয়ানি মশলা ১ চা চামচ
- কাঁচালংকা ৫ টি (কুচি)
- পুদিনা পাতা কুচি ১ টেবিল
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- দুধ আধা কাপ (জাফরান মিশানো)
- গোলমরিচ গুড়ো আধা চা চামচ
- লবণ পরিমাণমত
- এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, হলুদ, ধনে, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ করে।

**চিকেন বিরিয়ানী প্রস্তুত প্রণালি:** চাল ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে আস্ত গরম মসলা ও লবণ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। মুরগির মাংস, টকদই, হলুদ, ধনে, জিরা গুড়ো, মরিচ গুড়ো, আদা, রসুন বাটা একত্রে মেখে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করতে হবে। তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে টমেটো দিয়ে ভুনা করে নিতে হবে। এবার ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেলে লেবুর রস, মেথি, গোলমরিচ গুড়ো, গরম মসলা গুড়ো, বিরিয়ানী মসলা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিতে হবে। এবার একটি বড় পাত্রে প্রথমে রান্না করা মাংস, তার উপর সিদ্ধ চাল, কাঁচা মরিচ, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা কুচি দিয়ে পুনরায় এভাবে আরেকটি লেয়ার করে তার উপর দুধ, ঘি ও লবণ ছিটিয়ে দিয়ে ভালো করে ঢেকে ৩০ মিনিট হালকা তাপে রেখে নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

### সাদা পোলাও তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ

- চাল ৫০০ গ্রাম
- কাঁচা মরিচ ৪-৫ টি
- পেঁয়াজ কুচি ২-৩টি
- তেজপাতা ২-৩টি
- দারুচিনি ৪-৫ টুকরা
- এলাচ ৪-৫টি
- আদা বাটা ১ চামচ
- জিরা বাটা ১ চামচ
- কিসমিস, গরম পানি, লবণ, ঘি ও তেল পরিমাণমত।

চিত্র ৩.১৪: সাদা পোলাও

### সাদা পোলাও প্রস্তুত প্রণালি

- চাল ভালভাবে ধুয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে।
- চুলায় পাতিল বসাতে হবে। পাতিল ভালোভাবে গরম হলে তাতে ঘি নিতে হবে।
- তেল ভালভাবে গরম হবার পর তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়তে হবে, কিছুক্ষণ পর চাল ঢেলে দিয়ে ১০ মিনিট নাড়তে হবে।

- অন্য পাতিলে পানি গরম করতে হবে।
- তারপর লবন, আদা বাটা, এলাচ, কিসমিস, দারুচিনি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। এরপর গরম পানি পরিমাণ মত ঢেলে দিয়ে একটু নাড়তে হবে তারপর ঢেকে দিতে হবে। তারপর অল্প আঁচে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিতে হবে। ১০-১৫ মিনিট পর জিরা বাটা দিয়ে একটু নেড়ে দিতে হবে। চাল শক্ত থাকলে আরও ৫-৬ মিনিট হালকা তাপে চুলায় রেখে দিতে হবে।
- এরপর নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

**মাংসের তেহারী তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ**

**মাংস মেরিনেটের জন্য**

- মাংস ১ কেজি (হাঁড় ছাড়া)
- সরিষার তেল আধা কাপ
- আদা বাটা ২ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- টক দই আধা কাপ
- তেহারি মশলা
- লবন পরিমানমত
- চিনি আধা টেবিল চামচ
- পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ
- সরিষা তেল কোয়ার্টার কাপ (রান্নার সময়)
- পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ (রান্নার সময়)

চিত্র ৩.১৫: মাংসের তেহারি

**তেহারি মসলা**

- শুকনা মরিচ ৪ টি
- দারুচিনি ২ টুকরা (মাঝারি আকৃতি)
- এলাচ ৪-৫ টি
- তেজপাতা
- ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
- জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
- জয়ফল গুঁড়া আধা চা চামচ

- জয়িত্রী গুঁড়া আধা চা চামচ
- সাদা/কালো গোলমরিচ আধা চা চামচ

**পোলাওর জন্য**

- কেওড়া জল ১ চা চামচ
- কাঁচা মরিচ ৫-৬ টি
- সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ
- আস্ত জিরা কোয়ার্টার চা চামচ
- কালিজিরা বা পোলাওর চাল ৪ কাপ (৬৫০ গ্রাম)

## মাংসের তেহারি প্রস্তুত প্রণালি

- তেহারি মসলা সব একসাথে গুঁড়া করে নিতে হবে।
- মাংস ছোট টুকরা করে কেটে ভাল করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- মাংসের সাথে তেহারি মসলা, আদা বাটা, রসুন বাটা, টক দই, লবন, চিনি, পেঁয়াজ বাটা এবং আধা কাপ সরিষার তেল মিশিয়ে নিতে হবে।
- মেরিনেট করা মাংস ৩ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে।
- পাত্রে $\frac{১}{৪}$ কাপ সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজ ধূসর বর্ণের করে ভেঁজে নিতে হবে।
- এবার মেরিনেট করা মাংস এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট রান্না করতে হবে।
- প্রয়োজনে পরিমানমত পানি যোগ করতে হবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।
- রান্না মাংস তেল এবং ঝোল থেকে আলাদা করে তুলে একটি প্লেটে রাখতে হবে।
- আলাদা একটি পাত্রে ৪ টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করতে হবে। তেল গরম হলে এতে কিছু কাঁচা মরিচ ও আস্ত জিরা দিতে হবে।
- আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা সুগন্ধি পোলাও চাল ঢেলে দিয়ে মাঝারি আঁচে ৩ মিনিট ভাজতে হবে।
- এবার আলাদা করে রাখা মাংসের তেল এবং মসলা চালের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট ভাজতে হবে।
- এখন ৪ কাপ চালের জন্য ৮ কাপ গরম পানি যোগ করে স্বাদমত লবন দিতে হবে।
- পাত্রের মুখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বলক উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- বলক উঠলে আলাদা করে তুলে রাখা মাংস তাতে যোগ করতে হবে। নিম্ন আঁচে ১০ মিনিট বা পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।
- পানি শুকিয়ে গেলে ঢাকনা তুলে কেওড়া জল এবং কাঁচা মরিচ দিতে হবে। নিম্ন আঁচে আরও ১০ মিনিট চুলার উপর রেখে দিতে হবে।

২০১৪

- এর মাঝে ১ থেকে ২ বার রান্নার পাত্র উপর-নিচ করে হালকা ঝাঁকিয়ে দিতে হবে যাতে পোলাও এবং মাংস ভালোভাবে মিশে যায়।
- এখন মাংসের তেহারি পরিবেশনের জন্য তৈরি। শসা, কাঁচা পেঁয়াজ এবং লেবুর সাথে পরিবেশন করতে হবে।

## সিদ্ধ চাল থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য নিম্নরূপ

- ভাত
- বসাভাত বা বৌভাত
- মাড় ফেলা ভাত
- ভাতের মন্ড
- পান্তা ভাত
- খিচুড়ি
- মুড়ি
- নাড়ু ইত্যাদি।

## সিদ্ধ চালের ভুনা খিচুড়ী তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ

চিত্র ৩.১৬: সিদ্ধ চালের ভুনা খিচুড়ী

- ভাতের চাউল ৭৫০ গ্রাম
- মশুর ডাল ৫০০ গ্রাম
- পেঁয়াজ কুঁচি হাফ কাপ
- আদা বাটা দুই টেবিল চামচ
- রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ
- শুকনা মরিচ গুড়া ১ বা দেড় চা চামচ
- হলুদ গুড়া ২ চা চামচ
- তেজপাতা দুইটা
- লবন পরিমানমত
- কয়েকটা আস্ত কাঁচা মরিচ
- তেল এক কাপ কম বেশি
- পানি পরিমানমত
- গরম মসলা (এলাচি কয়েকটা, দারুচিনি কয়েক পিস, লং কয়েকটা)

**সিদ্ধ চালের ভুনা খিচুড়ি প্রস্তুত প্রণালি**

চাল ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর একটি পাতিলে পানি দিয়ে চাল মধ্যম আঁচে ১০-১৫ মিনিট অর্ধসিদ্ধ করতে হবে। তারপর অর্ধসিদ্ধ চালের পানি ঝরিয়ে ফেলতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ দিতে হবে। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, আদা ও রসুন বাটা দিয়ে ভাজতে হবে। আগুন মাধ্যম আঁচে রাখতে হবে। অর্ধ চা চামচ লবণ দিয়ে নাড়তে হবে এবং অর্ধ কাপ পানি দিতে হবে। হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিতে হবে। এখন ভালো করে কষিয়ে নিয়ে ধুয়ে রাখা মশুর ডাল যোগ করতে হবে। একটু কষিয়েই এক বা দেড় কাপ পানি দিতে হবে। এবার মাধ্যম আঁচে রেখে ঢেকে দিতে হবে। মাঝে মাঝে ঢাকনা সরিয়ে দেখতে হবে এবং নাড়তে হবে। ডাল নরম হয়ে গেলে, পানি ঝরিয়ে রাখা ফুরফুরে অর্ধসিদ্ধ ভাত দিতে হবে। আরো দুই কাপ অর্থাৎ ভাতের চালের লেয়ারের এক ইঞ্চি উপর পর্যন্ত পানি নিয়ে হালকা তাপ দিতে হবে। আবার লবণ দেখে পরিমাণমত লবণ দিতে হবে। ২০-২৫ মিনিট খুবই হালকা তাপ দিতে হবে এবং ভালো করে নাড়তে হবে। যদি চাল শক্ত রয়ে যায় তাহলে সামান্য পানি ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পানি না লাগলেই ভালো। পরিশেষে পরিবেশন করা যাবে।

## ৩.২.৪ আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে বিভিন্ন খাদ্য

**চালের গুঁড়া:** উন্নত মানের আতপ চাল সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে নিতে হয় তারপর উক্ত চাল পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। চাল ভালোভাবে ভিজে গেলে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। তারপর উক্ত চাল শিলপাটায় বেটে চালের গুঁড়া করা হয়। মেশিনেও চালের গুঁড়া তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে চাল ধুয়ে নিলেই হয়। চালের গুঁড়া রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে পলিব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। চালের আটা থেকে রুটি, ফিরনি, পিঠা ও বিভিন্ন ধরনের বড়া তৈরি করা যায়।

**রুটি প্রস্তুত প্রণালি:** চালের গুঁড়া বা আটা ও পরিমাণমত লবণ দিয়ে গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিতে হয়। অতঃপর উক্ত আটা ময়ান করে ভালোভাবে ডলে খামির বানাতে হয় যাতে উক্ত খামির রুটি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়। খামির থেকে ছোট ছোট বল বা গুটি করে পিড়ি ও বেলনে বেলে পাতলা ও গোল করে (গমের আটার রুটির মতো) রুটি বানাতে হয়। গরম তাওয়াতে রুটি সেঁকে নিতে হয়। চালের গুঁড়ার রুটি খুব নরম হয় এবং ঠান্ডা হলে সহজে ভেঙে যায়। আজকাল রুটি তৈরির জন্য বৈদ্যুতিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এতে রুটি তৈরি ও সেঁকা একসাথে সম্পন্ন হয়।

**ভাপা পিঠা তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ:**

- আতপ চালের গুঁড়া ৫০০ গ্রাম
- গুড় ১ কাপ
- নারকেল কুরানো বড় ১ কাপ
- লবণ আধা চা চামচ
- পানি সামান্য
- পিঠার জন্য ছোট ২টা বাটি

- ২ টুকরা পাতলা কাপড়।

**ভাপা পিঠা প্রস্তুত প্রণালি :** চালের গুঁড়া অল্প একটু পানি দিয়ে ঝরঝরে করে মাখিয়ে নিয়ে বাঁশের চালুনিতে চেলে নিতে হবে। এবার বাটিতে অল্প চালের গুঁড়া দিয়ে তার মাঝখানে গর্ত করে গুড় ও নারকেল দিয়ে ওপরে চালের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবার পাতলা কাপড় ভিজিয়ে পিঠা ঢেকে দিয়ে বাটির নীচ পর্যন্ত কাপড় ধরে বাটি উল্টো করে ফুটন্ত পানির ওপর ছিদ্র করা ঢাকনার ওপর বসিয়ে বাটি উঠিয়ে পিঠা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায়রেখে দিতে হবে। ৫-৬ মিনিট পর পিঠা সিদ্ধ হলে উঠিয়ে পরিবেশন করা যাবে।

চিত্র ৩.১৭: ভাপা পিঠা

**সিদ্ধ পুলি পিঠা প্রস্তুত প্রণালি :** আতপ চালের গুঁড়া ২ কাপ, খেজুরের গুড় পরিমাণমত, কোরানো নারকেল ১ কাপ। আতপ চালের গুঁড়া হালকা ভেজে পরিমাণমত পানি দিয়ে কাই করে নিতে হবে। কড়াইতে গুড় ও নারকেল একসঙ্গে চুলায় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। মিশ্রণটি শুকিয়ে আঠা আঠা হলে নামাতে হবে। খামির হাতে নিয়ে গোল গোল করে বেলে মাঝখানে পুর দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারভাবে মুখটি বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে পুলি পিঠা বানিয়ে ভাপে সিদ্ধ করতে হবে।

চিত্র ৩.১৮: সিদ্ধ পুলি পিঠা

**তেলেভাজা পিঠা বা পাকান পিঠা :** চালের গুঁড়া আধা কেজি, খেজুরের গুড় ৫০০ গ্রাম, আটা ২৫০ গ্রাম, তেল ৫০০ মি.লি.। খেজুরের গুড় আর এক গ্লাস পানি জ্বাল দিয়ে নিতে হবে। তারপর এতে চালের গুঁড়া ও আটা দিয়ে ঘন করে মিশাতে হবে। কড়াইতে তেল দিয়ে গরম হলে ১ চামচ করে পিঠার গোলা ছেড়ে দিতে হবে। পিঠা ফুলে উঠলেই তৈরী হয়ে গেলো তেলেভাজা পিঠা বা পাকান পিঠা।

চিত্র ৩.১৯: **পাকান** পিঠা

**নকশি পিঠা :** চালের গুঁড়া ২ কাপ, পানি দেড় কাপ, লবণ সামান্য, ঘি ১ টেবিল চামচ, সিরা গুড় আধা কাপ, চিনি ১ কাপ, পানি ১ কাপ একত্রে নিয়ে চুলায় বসিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ফুটে উঠলে চালের গুঁড়া দিয়ে সিদ্ধ করে কাই বানাতে হবে। পুরু করে রুটি বানিয়ে পছন্দমতো আকার দিয়ে কেটে নিয়ে খেজুর কাঁটা দিয়ে রুটিতে পছন্দমত নকশা করে ডুবোতেলে ভাজতে হবে। সিরায় ডুবিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিতে হবে।

চিত্র ৩.২০: নকশি পিঠা

**তিলের পুলি প্রস্তুত প্রণালি:** চালের গুঁড়া ২ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, নারকেল কোরা ২ কাপ, সাদা তিল আধাকাপ, গুড় দেড় কাপ, পানি $১\frac{১}{২}$ কাপ। লবণ, পানি ও ঘি একসঙ্গে চুলায় দিতে হবে।

ফুটে উঠলে চালের গুঁড়া দিয়ে কাই বানাতে হবে। শুকনা তিল হালকা ভেজে নিতে হবে। গুড় ও নারকেল চুলায় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চটচটে হলে তিল দিয়ে নামাতে হবে। খামির ১৬ ভাগ বা ইচ্ছামত ভাগ করে প্রতি ভাগে বাটির মতো অর্ধচন্দ্রাকার বা ইচ্ছামত আকার দিয়ে মুখ বন্ধ করে পুলি করতে হবে। তারপর ভাপে সিদ্ধ করে পরিবেশন করতে হবে।

চিত্র ৩.২১: পাটিসাপটা পিঠা

**পাটিসাপটা প্রস্তুত প্রণালি:** এই পিঠা তৈরিতে হাতে করা আতপ চালের গুঁড়ি, বেকিং পাউডার, চিনি বা গুড়, দুধ, ক্ষীর, ছোট এলাচ, তেল বা ঘি, পরিমানমত নিতে হয়। দুই কাপ পানিতে চালের গুঁড়া বেকিং পাউডার, গুড় বা চিনি ও দুধ মিশিয়ে গোলা তৈরি করে ১-১.৫ ঘন্টা ঢেকে রেখে দিতে হয়। এবার ক্ষীর চটকিয়ে চিনি ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হয়। হাঁড়িতে দুই চামচ ঘি গরম করে ঢেলে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামাতে হয়। পাত্র গরম করে কিছু তেল দিয়ে সারা পাত্র চামচ বা ন্যাকড়া দিয়ে মেখে নিতে হয়। অল্প আঁচে বড় চামচের ১ চামচ গোলা দিয়ে পাতলা করে রুটির মতো সম্পূর্ণ পাত্রে ছড়িয়ে দিতে হয়। গোলার উপরিভাগ শুকিয়ে এলে রুটির এক পাশ পরিমাণমত ক্ষীরের পুর লম্বা করে দিয়ে ডিমের ওমলেটের মতো মুড়ে সামান্য ভেজে তুলতে হয়। এমনি করে প্রতি বার গোলা দেওয়ার পূর্বে পাত্রে ন্যাকড়া দ্বারা তেল মেখে নিয়ে আরও কয়েকটি পাটিসাপটা পিঠা বানায়ে ভেজে তুলতে হয়। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করতে হয়। পিঠার মাঝে পুর হিসাবে মাখা সন্দেশ বা পাটালি গুড়ে জ্বাল দেওয়া নারিকেল কোরাও ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ৩.২২: দুধপুলি পিঠা

**দুধ পুলি প্রস্তুত প্রণালি:** এই পিঠা তৈরিতে আতপ চালের গুঁড়া, দুধ, চিনি, নারিকেল কোরা, ক্ষীর বা কনডেন্সড মিল্ক, তেল, এলাচ গুঁড়া পরিমাণমত নিতে হবে। প্রথমে একটি পানিশূন্য হাঁড়িতে নারিকেল কোরা, চিনি, দুধের ক্ষীর বা কনডেন্সড মিল্ক মিশায়ে জ্বাল দিয়ে পুলি পিঠার পুর তৈরি করে রাখতে হয়। এরপর একটি হাঁড়িতে আধা লিটার পানি ফুটাতে হবে। পানি ভালো করে ফুটে গেলে এতে চালের গুঁড়া, লবণ ও সামান্য তেল দিয়ে সিদ্ধ করে নামাতে হবে। একটু ঠান্ডা হলে আটা মাখার মতো করে রুটি তৈরির জন্য মন্ড বা খামির তৈরি করতে হবে। রুটির ভিতরে পুর অল্প অল্প করে ভরে পিঠার মুখ ভালোভাবে মুড়ে দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এর আকৃতি হবে অর্ধচন্দ্রাকার। পাত্রে তেল গরম করে হালকা আঁচে বাদামি রং করে পুলি ভেজে নিতে হবে। এবার একটি হাঁড়িতে দুধ, গুড় বা চিনি, এলাচ ও দারুচিনি একত্রে জ্বাল দিতে হবে। কিছুটা ঘন হয়ে এলে এতে পুলিগুলো একটি একটি করে ছাড়তে হবে। খুব সাবধানে খুন্তি দিয়ে নাড়তে হবে যাতে ভেঙে বা লেগে না যায়। দশ-পনেরো মিনিট চুলায় হালকা আঁচে রেখে নামাতে হবে। এ পিঠা গরম অথবা ঠান্ডা দুই ভাবেই খাওয়া যায় তবে ঠান্ডা পিঠাই বেশি মুখরোচক।

**চিতই পিঠা প্রস্তুত প্রণালি:** এ পিঠা তৈরিতে আতপ চাল, খেজুরের গুড় বা নারিকেল কোরা, পিঠা তৈরির বিশেষ ধরনের সরা বা সাজ, বেগুনের বোটা বা ন্যাকড়া, সরিষার তেল ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনমত পানি দিয়ে চালের গুঁড়া গুলিয়ে ঘন করে গোলা তৈরি করে নিতে হবে। এখন পিঠা তৈরির বিশেষ ধরনের সরা ধুয়ে-মুছে চুলায় বসাতে হবে। এই সরায় ছোট ছোট অনেক গর্ত থাকে। পিঠা সেঁকার এই সরাকে তাওয়াও বলে। প্রত্যেকটি গর্তে একটি করে পিঠা সাঁকা যায়। এখন সরার সকল গর্তে বেগুনের বোটা বা ন্যাকড়া দিয়ে সরিষার তেল মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর চালের গোলা সরার সকল বাটিতে ভরে আঁচ কমিয়ে রেখে অন্য একটি সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মিনিট পাঁচেক পর সরার ঢাকনা খুলে দেখা যাবে যে পিঠাগুলোর উপরের দিকের গোলা সিদ্ধ হয়ে ফুলে ওঠছে তখন খুন্তি দিয়ে আস্তে পিঠা তুলে নিতে হয়। যদি গোলা ঠিকমতো শুকায়ে পিঠা তৈরি করা হয় তাহলে চামচ বা খুন্তি দিয়ে পাশে আলতো করে চাপ দিলে পিঠা উঠে আসবে। পিঠা তুলে পুনরায় ন্যাকড়ার কাপড়ে তেল লাগিয়ে উক্ত সাজরা বা সরার খাঁজ মুছে গোলা দিতে হবে। এইভাবে পর পর পিঠা বানাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সবগুলো পিঠা বানানো হওয়া পর্যন্ত চুলা থেকে সাজ নামানো না হয়। তৈরি পিঠা নারিকেল কোরা ও ঝোল গুড় সহযোগে পরিবেশন করা হয়। এ পিঠা জ্বাল দেওয়া ঘন খেজুরের রস ও দুধের মিশ্রণে সারারাত ভিজিয়ে শীতের সকালে পরিবেশন করলে খুবই সুস্বাদু লাগে। চিতই পিঠাকে অনেকে সাজের পিঠাও বলে।

চিত্র ৩.২৩: চিতই পিঠা

**ভাজা পিঠা প্রস্তুত প্রণালি:** চালের গুঁড়া, মুগডাল, লবণ, হলুদ গুঁড়া, আদা কুচি, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, নারিকেল কোরা, চিনি, সরিষার তেল, শুকনা মরিচ ইত্যাদি এই পিঠা তৈরিতে লাগে। প্রথমে ডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। কড়াই চুলায় চড়িয়ে নারিকেল কোরা ও চিনি একসঙ্গে মেখে কড়াইতে দিয়ে খুন্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে নারিকেলের পুর তৈরি করে আলাদা পাত্রে ঢেলে রাখতে হবে। কড়াই ধুয়ে আবার চুলায় চাপায়ে সামান্য তেল ঢালতে হবে। তেল গরম হলে তেজপাতা, শুকনো মরিচ, জিরা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড় করে ডাল ভেঙ্গে প্রেসার কুকারে দিতে হবে। ২ কাপ পানি, লবণ, হলুদ, আদা কুচি, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া কুকারে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে কুকারের মুখ বন্ধ করতে হবে। দুইবার বাঁশি দিলে চুলা থেকে নামায়ে ঠান্ডা করে ঢাকনা খুলে দিতে হবে। এবার ডাল কড়াইতে নিয়ে জ্বাল দেওয়ার পর ফুটতে শুরু করলে তা চালের গুঁড়াতে ঢেলে দিতে হবে। সিদ্ধ ডাল ও চালের গুঁড়া ভালোভবে মেখে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। খামির থেকে ছোট ছোট বল নিয়ে রুটি করতে হবে। রুটির ভিতর অল্প অল্প করে নারিকেলের পুর ভরে গোলাকার পুলি তৈরি করে মুখ হাত দিয়ে টিপে বন্ধ করতে হবে। অবশ্যই পুলিগুলো ছোট ছোট আকারের করতে হবে। এবার কড়াইতে আরও তেল দিয়ে চুলায় চেপে পুলিগুলো বাদামি করে ভেজে নিতে হবে

চিত্র ৩.২৪: ভাজা পিঠা

## ৩.২.৫ পাপড় প্রস্তুত প্রণালি

পাপড় একটি সুস্বাদু নাস্তা। বিকালে চায়ের সাথে পাপড় পরিবেশন করা যায়। শিশু-কিশোরদের নিকট এটি অতি মজাদার খাবার। চাল থেকে দুধরনের পাপড় তৈরি করা যায়। যথা-
ভাতের পাপড় ও চালের পাপড়।

চিত্র ৩.২৫: ভাতের পাপড়

**ভাতের পাপড় প্রস্তুত প্রণালি:** আতপ চালে পানি দিয়ে মাড় না ফেলে ভাত সিদ্ধ করে রাখতে হবে। ঠাণ্ডা হলে পরিমাণমত জিরা, মরিচের গুঁড়া ও লবণ ভালোভাবে উক্ত ভাতের সাথে চটকে মেশাতে হবে। একটি কাঠের বাটার উপর বা থালার উপর পরিষ্কার ভিজা কাপড় পেতে মাখা ভাত ছোট ছোট গুটি আকারে সাজিয়ে নিতে হবে। পর পর চার দিন তা রোদে শুকাতে হবে। কাপড় থেকে গুটিগুলো তুলে নিয়ে স্টিলের বাসনে রেখে শুকিয়ে ছোট না হওয়া পর্যন্ত রোজ-রোদে শুকাতে হবে। কালো হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে বায়ুরোধী টিনের পাত্রে ভরে রাখতে হবে। পরিবেশনের সময় গরম তেলে ভেজে নিতে হবে।

চিত্র ৩.২৬: চালের পাপড়

**চালের পাপড় প্রস্তুত প্রণালি:** আতপ চাল এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন পানি সম্পূর্ণ ঝরিয়ে শিল-পাটায় পিষে নিতে হবে। চুলায় পানি ফুটলে আস্তে আস্তে পেষা চাল পরিমাণমত লবণসহ ফুটন্ত পানিতে মেশাতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ঘন ঘন নাড়তে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঘন হয়ে না যায়। দুইবার ফুটলেই নামিয়ে নিয়ে একটি মোটা বা বড় পলিথিন শীটের উপর একটু দূরে দূরে এক হাতা (গোল চামচ) করে চালের গোলা পাতলা করে ছড়িয়ে দিতে হয়। পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে সাবধানে তুলে নিয়ে বায়ুরোধক টিনে ভরে রাখতে হয়। খাঁটি ঘি বা তেলে ভেজে খেলে খুবই মজাদার লাগে।খাবার সময় চিনি দিয়েও পরিবেশন করা যায়।

## ৩.২.৬ সিদ্ধ চাল থেকে ভাত, খিচুড়ি ও ফ্রায়েড রাইস রান্নাকরণ

**সিদ্ধ চালের ভাত:** ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। প্রথমে পরিমাণমত চাল নিতে হবে। ডেকচিতে পরিমাণমত পানি নিয়ে গরম করতে হবে। চাল ভালো করে ধুয়ে পানির সাথে ছেড়ে দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ভাত যখন টগবগ করে ফুটে ওঠে তখন ঢাকনা খুলে হাতল বা খুন্তি দ্বারা সমভাবে নেড়ে দিতে হবে। এর ফলে সকল জায়গায় সমানভাবে তাপ লাগে এবং চাল সমভাবে সিদ্ধ হয়। চাল সমভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা জানবার জন্য কয়েকটি ভাত টিপে দেখলে যদি খুব ছোট শক্ত দানা অনুভূত হয় তাহলে মনে করতে হবে যে ভাত প্রায় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর চুলা হতে নামিয়ে মাড় ফেলতে হবে। মাড় ফেলে ভাতের হাঁড়ি বা ডেকচি উপুড় করে রাখলে আস্তে আস্তে সব মাড় পড়ে যায় এবং ভাত খুব ঝরঝরা সুন্দর হয়। কিন্তু এভাবে ভাত রাঁধলে ভাতের মূল্যবান পুষ্টি উপাদান ভিটামিন বি এর অনেক অপচয় হয়।

**বসাভাত বা বৌভাত:** মাড় না ফেলে যে ভাত রান্না করা হয় তাকে বসাভাত বলে। এভাবে ভাত রান্নার জন্য যতটুকু চাল নেওয়া হয়েছে তার দেড় গুণ পানি নিতে হবে। যেমন এক কাপ চাল হলে দেড় কাপ পানি। নতুন চাল সিদ্ধ হতে কম পানি ও পুরানো চাল সিদ্ধ হতে বেশি পানি প্রয়োজন হবে। চাল ধুয়ে পানিতে নিতে হবে। তারপর জ্বাল দিলে কিছুক্ষণ পর সিদ্ধ হয়ে এলে দম বা হালকা আঁচে বসাতে হবে। দমে থাকাকালীন চামচ দিয়ে নেড়ে অর্থাৎ উপরের ভাত নিচে আর নিচের ভাত উপরে করে দিতে হবে অথবা ডেকচি ঝাঁকিয়ে ভাত ওলটপালট করতে হবে। কয়েকদিন এভাবে রাঁধলে পানি দেওয়ার আন্দাজ হয়ে যাবে। পরে আর মাপতে হবে না। মাড় না ফেললে ভাতের খাদ্যগুণ অনেক বেড়ে যায়। ভাত খুব সুস্বাদু হয়। অবশ্য খারাপ চালের ভাত দুর্গন্ধ লাগে।

**পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত:** পুরনো সিদ্ধ চাল বেছে ধুয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত পানিতে চাল ঢেলে দিতে হবে। চাল সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতে হবে। চাল ও পানি একসাথে চুলায় দিলে কোন ক্ষতি হয় না। পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত খুব নরম করে নামাতে হয়। এই ভাত ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়।

**নতুন সিদ্ধ চালের ভাত:** ভাত রান্নার ১ ঘন্টা আগে চাল ধুয়ে রাখতে হবে। ফুটন্ত পানিতে চাল ঢেলে দিতে হবে। এই চাল সিদ্ধ হতে অল্প সময় লাগে। এই চালের ভাত একটু শক্ত থাকতে নামিয়ে মাড় বা ফেন ঝরিয়ে রাখতে হবে। তা না হলে জাউ ভাতের মতো হয়ে যাবে। নতুন চালের ভাত খেলে অনেকের পেটে অসুখ হয়। সেক্ষেত্রে রান্নার সময় ভাতের মাড় ফেলে দিলে ভালো হয়।

**ভাজা ভাত:** ঘরে অনেক সময় ভাত থেকে যায়। এই ভাত ভেজে খাওয়া যায়, তবে ভাত যেন নরম না হয়। নরম হলে ভাত আর ঝরঝরে থাকে না। কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে চুলায় বসিয়ে তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুঁচি ও শুকনা মরিচ দিতে হবে। এগুলো ভাজা ভাজা হলে পরিমাণমত বাসি ভাত কড়াইতে দিয়ে খুব সামান্য হলুদ, লবণ, গরম মসলা ও তেজপাতা দিয়ে নাড়তে হবে। ভাত ভাজা হলে নামিয়ে ফেলতে হবে। এই ভাত গরম গরম খেলেই ভালো লাগে।

চিত্র ৩.২৬: ভাজা ভাত

**খিচুড়ি:** চাল ও মুগডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। কড়াইয়ে ঘি, আদা, তেজপাতা নিয়ে চুলায় অল্প ভাজতে হবে। ডাল একটু ভেজে নিতে হবে। তারপর চাল, দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে ভেজে পরিমাণমত পানি দিতে হবে। এরপর লবণ দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। এর পর ফুটে উঠলে ঢেকে দিতে হবে। মৃদু জ্বালে ২০-২৫ মিনিট ফুটানোর পর হলুদ ও মরিচ দিলে ঝাল ভুনা খিচুড়ি তৈরি হবে। পরিবেশনের সময় পেঁয়াজ কুচি ভাজা ও ডিমের স্লাইস বা ডিম ভাজি দিলে উত্তম হয়। খিচুড়ির মধ্যে সবজির টুকরা, মটরশুঁটি,গাজর কুচি দিয়েও সবজি খিচুড়ি তৈরি করা যায়। অনেকে খিচুড়িতে পানির ভাব রেখে পাতলা খিচুড়ি তৈরি করেন। তবে ঝরঝরা খিচুড়িরই বেশি চাহিদা।

**ফ্রায়েড রাইস:** কড়াইয়ে পানি ফুটে উঠলে পোলাও চাল দিতে হবে। সাথে লবণ মিশিয়ে মাঝারি আঁচে ভাত সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ফুটাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ভাত যেন গলে না যায় এবং প্রত্যেকটি ভাত আলাদা থাকে। মাড় ফেলে ভাত শক্ত ঝরঝরে করে নিতে হবে। গাজর ও ওলকপি ছোট ছোট টুকরা করে ও মটরশুঁটি আলাদা ভাবে সিদ্ধ করতে হবে। পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ কলি কুচি করতে হবে। মাংস স্লাইস করতে হয়। একটি থালায় মাংস এবং সবজিগুলো নিয়ে তাতে ভাত রেখে, লবণ, গোল মরিচের গুঁড়া ও স্বাদ লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর ডিম ভেঙ্গে স্বাদমত লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে ফেটাতে হবে। বড় হাঁড়ি বা কড়াইয়ে তেল গরম করতে হবে। তেলে মাংস দিয়ে ৫-৬ মিনিট এবং গাজর ও ওলকপি দিয়ে ৪-৫ মিনিট ভাজতে হবে। তারপর পেঁয়াজ ও ফেটানো ডিম দিয়ে নাড়তে হবে। ৭-৮ মিনিট ভাজার পর ডিম কিছুটা জমাট বাঁধলে ভাত দিয়ে নাড়তে হবে। তারপর সয়াসস(Soy sauce)দিতে হবে। পেঁয়াজ কলি দিয়ে ফ্রায়েড রাইস নামিয়ে নিতে হবে। শুধু চিংড়ি মাছ, ডিম, মুরগির মাংস দিয়েও ফ্রায়েড রাইস রান্না করা যায়।

চিত্র ৩.২৮: ফ্রায়েড রাইস

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

**জবের নাম: ধান মিলিং মেশিন সনাক্তকরণ।**

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড**

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ ধান মিলিং মেশিন সনাক্তকরণের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ বিভিন্ন ধরণের ধান মিলিং মেশিনসমূহ সনাক্ত করবে।

১.৪ ধান মিলিং মেশিনের বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করবে।

১.৫ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী ধান মিলিং মেশিন পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

১.৬ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

### প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট

- দেশীয় যন্ত্রপাতি: গাইল ও শিয়া, ঢেঁকি
- আধুনিক যন্ত্রপাতি: আধুনিক মিলিং মেশিন।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

- ধান
- আতপ চাউল
- সিদ্ধ চাউল

### কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- মিলিং-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলো স্থানীয় ধান কল বা চালের মিলে যেয়ে শনাক্ত করতে হবে।
- যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।।
- যন্ত্রগুলো দেশীয় না আমদানি করা তা শনাক্ত করতে হবে।
- মেশিনের কাজের ক্ষমতা জানতে হবে।

**এই জবটি পাঁচ বার করতে হবে ।**

### সতর্কতা

- শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে মেশিন পর্যবেক্ষণ করবে, কাছে যাবে না।
- সবসময় শিক্ষক/গাইড/দক্ষ মেকানিক সাথে থাকতে হবে।
- মেশিনের ভিতর কোনো কিছু প্রবেশ করাবে না।
- চলন্ত মেশিনে হাত দেবে না।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী ম্যানুয়াল, টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।

## জব নং-০২

**জবের নাম: গোলাজাত ধান, চাল, ডাল, আলুর ক্ষতিকারক পোকা দমন।**

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

২.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

২.২ পোকার নমুনা ও আক্রান্ত শস্যদানার নমুনা নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.৩ পোকা দমনের উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.৪ পোকা দমনের কীটনাশক চিহ্নিত করবে।
২.৫ গোলাজাত ধান, চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি শস্যের ক্ষতিকারক পোকা দমনের কৌশল শিখবে।
২.৬ কাজ শেষে কর্মস্থান পরিষ্কার করবে।
২.৭ পোকা দমনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।
২.৮ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

**প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট**

- স্পুন
- চালনী ও ডালা
- কাঠি, পাত্র
- ড্রাম
- ঝাঁঝরি

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- পোকাসহ গোলাজাত ধান
- পোকাসহ গোলাজাত চাউল
- পোকাসহ গোলাজাত ডাল
- পোকাসহ গোলাজাত আলু
- কাগজ
- কলম/পেন্সিল
- রাবার

**কার্যপদ্ধতি**

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পোকার নমুনা ও আক্রান্ত দানাশস্য সংগ্রহ করতে হবে। (পোকার নমুনা কলেজ বা স্কুলের পেস্ট মিউজিয়াম থেকে বা গুদাম ঘরে পাওয়া যায়।)
- নমুনা সংগ্রহ ও পরিষ্কার করে তা পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত করতে হবে।
- ক্ষতির প্রকৃতি (তাত্ত্বিক অংশ ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ এ বর্ণনা আছে) পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখতে হবে।
- পোকার দমন ব্যবস্থা (তাত্ত্বিক অংশ ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ এ বর্ণনা আছে) অনুশীলন করতে হবে।
- প্রয়োজনে শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে নিকটস্থ চাল বা ধান গুদামজাত মিল বা সাইলোর কার্যক্রম দেখিয়ে আনতে পারেন।

**এই জবটি পাঁচ বার করতে হবে।**

**সতর্কতা :**

- পোকার নমুনা গুলো খুব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়।
- পোকাগুলোর আকার-আকৃতি প্রায় একই রকম তাই পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষক ভালো করে ব্যাখ্যা করবেন।

## জব নং-০৩

**জবের নাম: ধান থেকে চিড়া ও মুড়ি তৈরিকরণ।**

**পারদর্শিতা/মুল্যায়ন মানদন্ড**

৩.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৩.২ ধান থেকে চিড়া ও মুড়ি তৈরির পুর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৩.৩ চিড়া ও মুড়ি তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

৩.৪ চিড়া ও মুড়ি তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

৩.৫ তৈরিকৃত চিড়া ও মুড়ি এয়ার টাইট পলিথিনে সংরক্ষণ করবে।

৩.৬ কাজ শেষে কর্মস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

৩.৭ চিড়া ও মুড়ি তৈরির অব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

**প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট :**

- আধুনিক চিড়ার কল
- আধুনিক মুড়ির কল
- ওয়েট ব্যালেন্স
- সিলিং মেশিন
- থার্মোমিটার
- মিলিং মেশিন
- চালনী, ডালা
- বড় পাতিল
- সসপ্যান

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :**

- ধান
- পানি
- লবণ
- পলিব্যাগ
- বালু

**আধুনিক মেশিনে চিড়া তৈরির কার্যপদ্ধতি**

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- তারপর ধান সংগ্রহ করতে হবে।
- তারপর ধান পানিতে ১২-১৮ ঘন্টা ভিজাতে হবে। ধানে পানির পরিমাণ হবে (৩০±১.৬৮)% এবং তাপমাত্রা (২৮±০.৯৫)°সে.
- এরপর পানি থেকে ধান তুলে নিতে হবে।
- এখন ২০০-২৫০°সে. তাপমাত্রায় ২০-৩০ সেকেন্ড ধান ভাজতে হবে। ধান ভাজা হয়ে গেলে ধানে পানির পরিমাণ হবে (১৯±১.৫)% ।
- তারপর ধানের তাপমাত্রা (৪২±১.৫)°সে. এ নামিয়ে আনতে হবে।
- তারপর চিড়ার মেশিনে ধানকে (১৪৫±৫) কেজি/সে.মি² চাপে চ্যাপ্টা করতে হবে।
- চিড়া তৈরি হলে চিড়ায় ধানের খোসা থাকলে তা অপসারণ করতে হবে।
- পরিষ্কার চিড়া পলিব্যাগে এয়ার টাইট অবস্থায় সিলিং করে সংরক্ষণ করতে হবে।

**আধুনিক মেশিনে মুড়ি তৈরির কার্যপদ্ধতি**

**মুড়ির চাল প্রস্তুতি**

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পরিপক্ব ও রোগমুক্ত ধান পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- ধানকে দুই পর্যায়ে সিদ্ধ করতে হবে প্রথমে বড় পাত্র বা সসপ্যানে ধান নিয়ে কিছু বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে ৭০°সে. তাপমাত্রায় ২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে।
- ধান ২০ মিনিট পর্যন্ত অল্প সিদ্ধ করে চুলা থেকে নামিয়ে গরম পানিসহ ১২ ঘণ্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ভিজানো ধানের পানি ঝরিয়ে আবারও অল্প পরিমাণ পানি যোগ করে ধান ফেটে যাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ ধান চুলা থেকে নামিয়ে ঠাডা করে ৩-৪ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করতে হবে।
- পরদিন ধান এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে ধানের আর্দ্রতা ২০% এ নেমে আসে। পরীক্ষার জন্য ধানের চাল বের করে চিবুলে শক্ত ও মৃদু কটকট শব্দ হবে।
- এরপর শুকিয়ে ঠাডা করে ঢেঁকিতে বা কলে ভেনে মুড়ির চাল তৈরি করতে হবে।

## মুড়ি তৈরির ধাপ

- প্রথমে প্রতিটি পাতিলে ৫০ কেজি বা এক বস্তা করে মুড়ি তৈরির চাল ঢালতে হবে।
- ১ টি মগে এক লিটার লবণ পানি তৈরি করতে হবে।
- ১৫ মিনিট লবণ পানি ঘুরন্ত হাতলের মাধ্যমে ১৫ টি পাতিলে নিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হবে।
- পরবর্তী ৪৫ মিনিট হাতলের সাহায্যে লবণ পানি ও চাল ভাল করে মিশাতে হবে। ১ ঘন্টা পর চাল মুড়ি হওয়ার উপযোগী হলে উঠিয়ে রোস্টারের ভিতর দিতে হবে।
- ১ মিনিটে রোস্টারের মধ্যে মুড়ি তৈরি হয়ে যাবে।
- বের হবার সময় মুড়ি ও বালু আলাদা আলাদা দুই জায়গায় পতিত হবে।
- এভাবে ১৫×৫০=৭৫০ কেজি মুড়ি অতি অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব। (১৫টি ডায়ালের প্রতিটিতে ৫০ কেজি করে মোট ৭৫০ কেজি)

**এই জবটি সাত বার অনুশীলন করতে হবে।**

### সতর্কতা

- ধান সঠিক ভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে।
- মেশিন হতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কাজ করতে হবে।
- মেশিনের প্রেসার ঠিক আছে কিনা খেয়াল করতে হবে।
- ধানে পানির পরিমাণ ও তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- পলিব্যাগে চিড়া ও মুড়ি এয়ার টাইট অবস্থায় সিলিং করে রাখতে হবে।
- বালু গরম হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- মুড়িতে যেন বালু না থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

## জব নং-০৪

**জবের নাম: চিড়া ও মুড়ির মোয়া তৈরিকরণ।**

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

৪.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
৪.২ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৪.৩ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির উপকরণ সমূহ চিহ্নিত করবে।
৪.৪ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির কৌশল ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করবে।
৪.৫ তৈরিকৃত মুড়ি ও চিড়ার মোয়া ঠান্ডা করে এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
৪.৬ কাজ শেষে কর্মস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৪.৭ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির অব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।

২০২৪

চিত্র ৩.২৯: মুড়ির মোয়া

চিত্র ৩.৩০: চিড়ার মোয়া

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

**প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট**

- পাতিল বা কড়াই
- নাড়নি
- সসপ্যান
- সিলিং মেশিন
- চালনী
- চুলা

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- মুড়ি
- গুড় বা চিনি
- চিড়া
- জার বা পলিব্যাগ
- তেল
- পানি

**মুড়ির মোয়া তৈরির পদ্ধতি**

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- সুন্দরভাবে ভাজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ৫০০ গ্রাম মুড়ি নিতে হবে।
- ২৫০ গ্রাম গুড় বা চিনি ও পরিমাণমত পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- সিরা একটু ঘন হয়ে এলে তাতে মুড়ি ঢেলে দিতে হবে।
- পানি দিয়ে দ্রুত নাড়তে হবে।
- গরম অবস্থায় চুলা হতে একটি পাত্রে নামাতে হবে।
- হাতে তেল মাখিয়ে গরম থাকা অবস্থায় গোল করে মোয়া গড়ে নিতে হবে।
- বায়ুরোধী পাত্র বা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।

### চিড়ার মোয়া তৈরির পদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- প্রথমে চিড়াকে কড়াই বা তাওয়ায় ভালোভাবে ৫-১০ মিনিট ভেজে নিতে হবে।
- তারপর পাতিলে গুড় ও পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- গুড়ের সিরা ঘন হয়ে এলে তাতে চিড়া ঢেলে হাত দিয়ে ভালো করে নেড়চেড়ে নামাতে হবে।
- অতঃপর মুড়ির মোয়ার মতো করে চিড়ার মোয়া তৈরি করতে হবে।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে।**

### সতর্কতা

- গুড় বা চিনিতে পাকানো চিড়া ও মুড়ি ঠান্ডা হলে মোয়াবানানো যাবে না।
- অতিদ্রুত মুড়ি ও চিড়ার মোয়া বানাতে হবে।
- সতর্ক থাকতে হবে যেন শরীর আগুনের সংস্পর্শে না আসে।
- গুড় বা চিনির সিরা এমনভাবে করতে হবে যেন বেশি পাতলা বা ঘন না হয়ে যায়।

## জব নং-০৫

### জবের নাম: আতপ চালের গুঁড়া হতে ভাপা পিঠা তৈরিকরণ।

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

৫.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৫.২ আতপ চালের গুঁড়া হতে ভাঁপা পিঠা তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৫.৩ ভাঁপা পিঠা তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

৫.৪ কাজ শেষে কর্মস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

৫.৫ ভাঁপা পিঠা তৈরির অব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।

### প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

## প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট

- পাতিল
- নাড়নি
- সসপ্যান
- সিলিং মেশিন
- চালনী ও ডালা
- চুলা
- গাইল ও শিয়া
- ঢেঁকি
- গ্রাইন্ডিং মেশিন
- শিলপাটা
- ড্রাম
- ঝাঁঝরি
- মাটির ঢাকনা বা সরা
- কাঠি, পাত্র/ ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা
- বাটি
- আধুনিক মিলিং মেশিন

## প্রয়োজনীয় উপকরণ

- আতপ চাল
- গুড় বা চিনি
- নারিকেল কোয়া
- পানি
- লবণ
- দুধ
- পাতলা সুতি কাপড়

## ভাপা পিঠা তৈরির কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- ভাঁপা পিঠা তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

**আতপ চালের গুঁড়া তৈরির উপকরণ:** আতপ চাল, শিলপাটা বা আধুনিক গ্রাইন্ডার, পানি।

## আতপ চালের গুঁড়া তৈরির পদ্ধতি

- উন্নতমানের পরিষ্কার ১ কেজি আতপ চাল সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- শিলপাটায় অল্প অল্প করে বেটে আতপ চালের গুঁড়া তৈরি করা যাবে। মেশিনেও গুঁড়া করা যায়, সেক্ষেত্রে ভিজানোর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র চাল ধুয়ে তাৎক্ষনিকভাবে মেশিনে গুঁড়া তৈরি করা যাবে।
- আতপ চালের গুঁড়া ঠান্ডা করে প্যাকেট করে সংরক্ষণ করতে হবে।

### ভাপা পিঠা তৈরি

- চালের গুঁড়া সংগ্রহ করতে হবে। ভাপা পিঠা ও পাটিসাপটা পিঠার জন্য মেশিনের গুঁড়ার চেয়ে শিল-পাটায় বাটা গুঁড়া হলে ভালো হয়
- হাঁড়িতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি নিয়ে চুলায় চড়াতে হবে।
- চালের গুঁড়ার সাথে লবণ, দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে চালুনিতে চেলে নিতে হবে।
- হাঁড়ির মুখে ঢাকনা বা সরা (মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত) দিয়ে ঢেকে দিয়ে চতুর্দিকের মুখ আটা বা ময়দা গুলিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে হাঁড়ির বাষ্প চারদিক দিয়ে বের না হয়ে মাঝের ছিদ্রপথে বের হবে।
- ছোট বাটিতে অর্ধেক চালের গুঁড়া দিয়ে তার উপর কোরানো নারিকেল ও পাটালি গুড়ের কিছু টুকরো দিয়ে পুনরায় চালের গুঁড়া দিয়ে বাটি ভরতে হবে।
- পাতলা ভেজা কাপড় দিয়ে বাটি ঢেকে হাঁড়ির উপর মাটির ঢাকনার মাঝের ছিদ্রপথের উপর উল্টো করে বসাতে হবে।
- খুব সাবধানে উল্টানো বাটি সরিয়ে পিঠাটি পাতলা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে।
- তারপর একটি বড় সরা বা ঢাকনা দিয়ে সম্পূর্ণটা ঢেকে দিতে হবে।
- ৫ মিনিট পর কাপড়সহ পিঠা তুলে আনতে হবে। পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না হাতের আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে।
- এভাবে পিঠা তৈরি করে গরম অবস্থায় পরিবেশন করতে হবে।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে** ।

### সতর্কতা

- হাঁড়ির উপর পিঠা এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ভেঙে না যায়।
- পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নামাতে হবে।
- সতর্ক থাকতে হবে যেন শরীর আগুনের সংস্পর্শে না আসে।
- খেয়াল রাখতে হবে যেন মাটির ঢাকনা দিয়ে পাতিলের গরম বাষ্প বের হয়ে না যায়।

## অনুশীলনী-৩

### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য কোনটি?

২. ধান কোন ধরনের উদ্ভিদ?

৩. বাংলাদেশে উৎপাদিত ধানের প্রধান জাত কয়টি ও কি কি?

৪. চালের অ্যালিউরণ স্তর কোনটি?

৫. গোলাজাত ধানের ক্ষতিকারক তিনটি পোকার নাম লিখ?

১০১৪

৬. ধান সিদ্ধ করার আধুনিক পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?
৭. আতপ চাল কাকে বলে?
৮. আতপ চালের গুঁড়া থেকে তৈরি দুইটি খাবারের নাম লেখ।
৯. আতপ চাল থেকে তৈরি কয়েকটি খাদ্যের নাম লেখ।
১০. সিদ্ধ চাল থেকে তৈরি কয়েকটি খাদ্যের নাম লেখ।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. কলে ছাঁটা ও ঢেঁকি ছাঁটা চালের পুষ্টিমান লেখ।
২. গুদামে ধান কী কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
৩. আতপ ও সিদ্ধ চাল বলতে কী বুঝায়?
৪. মুড়ি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য কী কী?
৬. পায়েস রান্নার উপকরণগুলো উল্লেখ কর।
৭. সাইলো কেন ব্যবহার করা হয়?

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১. ধানবীজের বিভিন্ন অংশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
২. ধান বীজের পুষ্টিমান উল্লেখ কর।
৩. ধান সিদ্ধকরণের আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. আতপ ও সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৫. পাটিসাপটা ও দুধপুলি পিঠা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৬. পাপড় কী? চালের পাপড় ও ভাতের পাপড় তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৭. ফ্রায়েড রাইস তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৮. আতপ চালের পায়েস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৯. চিকেন বিরিয়ানি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

# চতুর্থ অধ্যায়

# ডালের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

# Introduction to Pulses, Processing and Storage

বাংলাদেশের কৃষিতে ডালজাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জাতীয় ফসল এদেশের মানুষ, পশুসম্পদ এবং মাটির পুষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ডাল প্রধানত বিউলি, মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, অড়হর, মাষকলাই, খেসারি প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় মৌসুমি ফসলের শুকনো বীজ। সব রকমের ডাল মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ডাল প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। এতে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ এবং অত্যধিক লাইসিন থাকায় ও দামে সস্তা হওয়ায় ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়। পুষ্টিবিদগণের মতে একজন মানুষের দৈনিক ডালের চাহিদা ৪৫ গ্রাম।

**এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-**

- ডালের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারব।
- ডাল থেকে বেসন, চানাচুর, বড়া/পেঁয়াজু ইত্যাদি তৈরি করতে পারব।

## ৪.১ ডালের পরিচিতি

ভারতবর্ষে ডাল এসেছে আর্যদের আগমনের মাধ্যমে। প্রাচীনকালে বাংলায় ডালের বিশেষ প্রচলন ছিল না। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বাংলায় ডালের প্রচলন শুরু হয়। ডাল একটি রবি ফসল, মূলত সারাদেশে এর চাষ বিস্তৃত। তবে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল জেলায় বেশি ডাল চাষ হয়।

### ৪.১.১ ডালের সংজ্ঞা

ডাল লিগিউম জাতীয় রবি মৌসুমের ফসল। এটি লিগুমিনোসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত খোসা ছাড়ানোর পর যুক্ত বা বিযুক্ত বীজপত্রগুলোকে ডাল বলে।

## ৪.১.২ ডালের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) (জয়দেবপুর, গাজীপুর)- এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে অবমুক্ত বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতের নাম, উৎপাদনের মৌসুম, ও গাছের বৈশিষ্ট্য নিম্নের ছকে দেওয়া হলো:

| ক্রমিক নং | জাতের নাম | উৎপাদনের মৌসুম | হেক্টর প্রতি ফলন (টন) | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বারি ছোলা-৫ | রবি | ১.৮-১.৯ | বীজের আকার ছোট ধূসর বাদামি বর্ণের। |
| ২. | বারি ছোলা-৯ | রবি | ১.৫০-২.৫ | রোগ প্রতিরোধী ও উচ্চ ফলনশীল। |
| ৩. | বারি মসুর-৫ | রবি | ২.০-২.২ | বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, বীজের রঙ লালচে বাদামী। |
| ৪. | বারি খেসারী-১ | রবি | ১.৪-১.৬ | পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধী । |
| ৫. | বারি খেসারী-২ | রবি | ১.৫০-২.০ | পাতা স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশ চওড়া। |
| ৬. | বারি খেসারী-৩ | রবি | ১.৫-১.৭ | অক্সালাইল ডাই-অ্যামিনো প্রোপায়ানিক এসিড (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৪% |
| ৭. | বারি মুগ-২ | বিলম্ব রবি | ১.২-১.৩০ | সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ। |
| | | খরিফ-১ | ১.৫-১.৬০ | |
| | | খরিফ-২ | ১.০-১.১০ | |

## ৪.১.৩ ডালের বিভিন্ন অংশ

### ডালের পুষ্টিমান

ডাল অত্যন্ত পুষ্টিকর দানাদার খাদ্যশস্য। এই শস্যে প্রচুর পরিমানে আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। অন্যান্য দানা জাতীয় শস্যের তুলনায় ডালে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। ডাল ও চাল মিশ্রিত খিচুড়ি শিশু ও বয়স্কদের বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। অঙ্কুরিত ডালের অঙ্কুরে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে।

চিত্র ৪.১:ডাল বীজের বিভিন্ন অংশ

### ডালের পুষ্টি উপাদান

- **প্রোটিন:** ডালে ১৮-২৫% প্রোটিন থাকে। ডালের প্রোটিনের মধ্যে গ্লোবিউলিন ৩৫-৭২%, অ্যালবুমিন ১৫-২৫% ও প্রোলামিন ৪.৮%।
- **শর্করা:** ডালে শর্করা থাকে ৬০%-৬৫%, স্টার্চ থাকে ৪৭-৫৩% এবং চিনি থাকে ৭.৯%। ১০০ গ্রাম ডাল থেকে ৩৪৬ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

- **স্নেহ পদার্থ:** ডালে স্নেহ পদার্থ খুব কম থাকে, মাত্র ১-২%। তবে ছোলার ডালে ৫% স্নেহ পদার্থ থাকে।
- **ভিটামিন:** ডাল ভিটামিন বি$_1$ (থায়ামিন) এর ভালো উৎস। ছোলা, মুগ, মাষকলাইয়ের বীজ খোসাসহ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরিত হয়ে প্রোটিন বৃদ্ধি করে এবং অঙ্কুরিত ডালে পুষ্টিমান বাড়ে।
- **মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ :** প্রতি ১০০ গ্রাম ডালে ৮-১০ মি. গ্রাম লৌহ, ১০০-২০০ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৪২০- ৬২০ মি. গ্রাম ফসফরাস থাকে।

**ডালে উপস্থিত পুষ্টিবিরোধী উপাদান:** সাধারণত খেসারির ডালে বিটা-এন-অক্সালাইল অ্যামিনো-এল-অ্যালানিন (BOAA) নামক পুষ্টিবিরোধী উপাদান বা জৈব বিষ থাকে যা ল্যাথাইরিজম নামক পায়ের প্যারালাইসিস রোগ সৃষ্টি করে। একনাগাড়ে ২-৩ মাসের বেশি সময় শুধু খেসারির ডাল খাওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া প্রতিদিন ২০০ গ্রাম বা তার বেশি পরিমাণ খেসারির ডাল দীর্ঘদিন খেলে ল্যাথাইরিজম রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ রোগে হাত ও পা অবশ হয়ে যায় যাকে প্যারালাইসিস বা অবশ রোগ বলা হয়। তবে খেসারির ডাল ৮-১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি নিংড়ে ফেলে দিলে ক্ষতিকর ল্যাথাইরাস উপাদান (BOAA) কমে যায়।

চিত্র ৪.২: ল্যাথাইরিজম আক্রান্ত কিশোর

### ৪.১.৪ ডালের ব্যবহার

আমাদের দেশে দৈনন্দিন বিভিন্ন খাদ্যে ডাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে ডালের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

- প্রতিদিন রান্নায় ডাল ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- বিভিন্ন সবজি ডাল যোগে রান্না করা হয়ে থাকে।
- পিঁয়াজু বা ডালের বড়া তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- ডাল দিয়ে ডালপুরি তৈরি করা যায়।
- মুগ ডালের পরোটা বানিয়ে খাওয়া যায়।
- চানাচুর তৈরিতে ডালের ব্যবহার বেশ প্রচলিত।
- চটপটি ও ফুচকা তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- আমৃতি/আমিত্তি তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- হালুয়া বানাতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- পাকোড়া বানাতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- বেসন তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।

০৮/০২

## ৪.২ ডালের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

ডাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কাজকে এককথায় প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের জন্য ডাল গুদামজাত করে রাখা যায়।

### ৪.২.১ প্রক্রিয়াজাতকরণের সংজ্ঞা

খাদ্যশিল্পে খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত, পরিপাক ও শোষণযোগ্য, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, নতুন পণ্য তৈরি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যেসকল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ বলে।

### ৪.২.২ সংরক্ষণ এর সংজ্ঞা

খাদ্যদ্রব্যকে অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং খাদ্যের নিজস্ব গুণাগুণ যথা সম্ভব বজায় রেখে দীর্ঘদিন ভালো রাখার পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বা খাদ্য সংরক্ষণ বলে। বর্তমানে খাদ্য সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। যেমন-শুষ্কীকরণ (Drying/dehydration), হিমায়িতকরণ (Freezing), হিমাগারে সংরক্ষণ (Cold storage), পচন নিরোধক পদ্ধতি (Aseptic technique) ইত্যাদি।

### ৪.২.৩ ডালের সংরক্ষণ পদ্ধতি

**সংরক্ষণের জন্য ডাল শুকানোর পদ্ধতি**

- ডাল পরিষ্কার ও পাকা মেঝে অথবা প্লাস্টিকের শীটে পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হবে।
- সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা কমিয়ে ৮-৯% এ আনতে হবে।

**বীজ সংরক্ষণ পর্যায়:** ডাল ফসল কাটার পর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ শুরু হয়। তবে ডাল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন-

**মাঠ সংরক্ষণ:** বীজ ফসল পাকার পর কাটার পূর্ব পর্যন্ত মাঠে থাকার সময়কে মাঠে সংরক্ষণ বুঝায়। বীজের মধ্যে যখন সবচেয়ে রসহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই বীজ পরিপক্ব হয়। ডালে পরিপক্ক অবস্থায় শতকরা ২৮-৩০ ভাগ রস বা পানি থাকে।

**স্তূপাকারে সংরক্ষণ:** ফসল বা বীজ কাটার পর বস্তা বন্দী বা পাত্রে রাখার উপযোগী অবস্থায় আনার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে স্তূপাকার সংরক্ষণ বোঝায়। ডাল বীজের বেলায় বীজ ড্রায়ারে বা রোদে শুকিয়ে শতকরা ৮-১০ ভাগ আর্দ্রতায় নামিয়ে আনতে হয়।

চিত্র ৪.৩: ডাল বীজ সংরক্ষণ

**বস্তা বন্দী বা পাত্র সংরক্ষণ:** বীজ মাড়াই, ঝাড়াই, পরিষ্কারকরণ ও শুকানোর পর বিতরণ বা বিক্রি করার

২০২৪

পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বস্তাবন্দী বা পাত্র সংরক্ষণ বোঝায়।

**বিতরণকালীন সংরক্ষণ:** বীজ বিতরণের জন্য বা বিক্রেতার নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বিতরণকালীন সংরক্ষণ বোঝায়।

**সংরক্ষণ পদ্ধতি:** ডাল বীজ বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে বীজের আর্দ্রতা ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর বীজের গুণাগুণ বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্নের সারণিতে বীজের বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে তা দেখানো হলো-

সারণি ৪.১: বীজের আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে ডাল সংরক্ষণ

| ক্রমিক নং | বীজের আদ্রতা | বীজের অবস্থা | সংরক্ষণ পর্যায় |
|---|---|---|---|
| ১. | ২৮-৩০% | বীজ পরিপক্ক হয় | ফসল কেটে সংরক্ষণ করতে হবে। |
| ২. | ১৮-২০% | বীজ নষ্ট হতে পারে। | ফসল কেটে তাড়াতাড়ি না শুকালে এবং স্তুপাকারে রাখলে বীজ নষ্ট হতে পারে। |
| ৩. | ১২-১৪% | ছত্রাক গজাতে পারে। | ফসল কেটে মাড়াই করে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে কটকটে না করলে ছত্রাক গজায়। |
| ৪. | ১০-১২% | সাময়িক সংরক্ষণ করা যায়। | ৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায় তবে পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। |
| ৫. | ৮-১০% | সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্দ্রতা | এ অবস্থায় বায়ুরোধী পাত্রে দীর্ঘদিন রাখা যায় এবং পোকা আক্রমণ করতে পারে না। |

সাধারণত তিন ভাবে ডাল সংরক্ষণ করা যায়-

**পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তায় সংরক্ষণ:** ডাল বীজ সংরক্ষণে পলিথিন যুক্ত ছালা বা প্লাস্টিকের বস্তা খুবই উপযোগী। পুরু পলিথিন ব্যাগ পাটের বস্তার ভিতরে ভরে এ ধরনের বস্তা তৈরি করা যায়। বস্তার মধ্যে ডাল বীজ ভরে প্রথমে পলিথিনের মুখটি পুড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ছালার বস্তার মুখ রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এ ধরনের ছালার বস্তা ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে বস্তার ভিতরের পলিথিন ব্যাগ পরিবর্তন করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ৪.৪: পলিথিনযুক্ত বস্তায় ডাল সংরক্ষণ

**পলিথিনযুক্ত মাটির পাত্রে সংরক্ষণ:** উন্নত পাত্রের ভিতরে পুরু পলিথিন ব্যাগ প্রবেশ করিয়ে ডাল সংরক্ষণ করা যায়। ডাল ফসলের বীজ পলিথিন ব্যাগে ভরে পলিথিনের মুখ মোমের শিখায় পুড়িয়ে সিল করে দেয়া হয়। পরে পাত্রের মুখ তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া

চিত্র ৪.৫: মাটির পাত্র ডাল সংক্ষণ

২০১৪

হয়। এ ধরনের পাত্রে ডাল বীজ ১ বছর পর্যন্ত ভালোভাবে রাখা যায়। এ ধরনের পাত্র ৩-৪ বছর ব্যবহার করা যায়। শুধু প্রয়োজনে ব্যাগটি পরিবর্তন করতে হয়।

চিত্র ৪.৬: টিনের পাত্রে ডাল সংরক্ষণ

**টিনের উন্নত পাত্রে সংরক্ষণ:** সাধারণত মাইল্ড স্টিল (Mild steel) শীট দ্বারা এ ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়। পাত্রের মুখ বন্ধ করার জন্য গোলাকার ঢাকনা চারিদিকে সিল করার ব্যবস্থা থাকে। ফলে সিলিং দ্রব্য বা তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করলে বাহিরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধরনের পাত্রে ডাল এক বছরের বেশি সময় ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ পাত্র ১০-১২ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

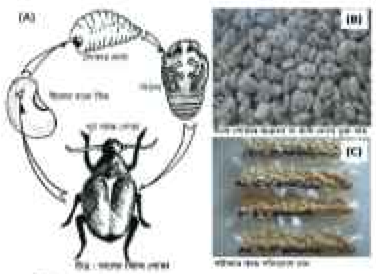

চিত্র ৪.৭: ডালে পোকার আক্রমণ

ডাল গুদামে যত বেশি দিন থাকবে ক্ষতির পরিমাণও তত বাড়তে থাকবে। এদের আক্রমণে শতকরা ১০০ ভাগ ডাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে। এ পোকা ডালের দানার খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হাল্কা হয়ে যায়। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

## গোলাজাত ডালের পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

- ডাল শস্য গুদামজাতকরণের পূর্বে দানা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়।
- ডালের দানা শুকিয়ে জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে ১২% এর নিচে আনতে হবে।
- বীজের জন্য টন প্রতি ৩০০গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা ১০% সেভিন গুঁড়া মিশিয়ে প্রতিরোধ করা যায়।
- ফসটক্সিন ট্যাবলেট ২টি বড়ি -প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ব্যবহার করতে হবে। এ বড়ি গুদামের আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করতে হবে।
- এছাড়া ডাল বীজের সাথে সয়াবিন, বাদাম, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তেল মিশিয়ে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

## ৪.২.৫ গুদামজাত ডাল শস্যের পোকামাকড় দমন

গুদামজাত ডাল শস্যের পোকা দমনের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

### প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- শস্য কাটার পরবর্তী সময়ে দানাশস্যকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।
- রোদে শুকানোর সময় আশেপাশের গুদাম থেকে পোকা এসে যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভালোভাবে দানাশস্য শুকাতে হবে।
- দানাশস্যকে ভালোভাবে বাছাই করে গুদামজাত করতে হবে।
- গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গুদামজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- সংরক্ষণ পাত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মুখ খুব ছোট এবং পেট অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।
- শস্য ভর্তি করার পর মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।
- শস্য গুদামজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হয়।
- প্রতি কেজি দানাশস্যের সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

### প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

- বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিভিভিপি (১০০) এর ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- প্রতি টন গুদামজাত বীজে ২-৪ টি ফসটকসিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হলে কীটপতঙ্গ মারা যায়।

## ৪.২.৬ ডালের মিলিং

ডালের আবরণ অত্যন্ত শক্ত থাকে। ডালের খোসা অপসারণ করা না হলে খোসাসহ ডাল খেয়ে হজম করা কষ্টসাধ্য হয়। তাই ডালের খোসা অপসারণ (বডি হাস্কিং) করা দরকার। ডালের খোসা অপসারণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় ডালের খোসার সাথে খাদ্য উপযোগী উপাদান অনেকাংশ চলে যায়। তাই খোসা অপসারণ প্রযুক্তি এমন হওয়া উচিত যাতে খাদ্যোপযোগী আঁশের অপসারণ কম ঘটে। এটা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন-

২০২৪

- ডাল বীজের গুণগত প্রকৃতি ।
- ডাল বীজের গঠন বা আকার ।
- ডাল বীজের আয়তন ।
- ডাল বীজের ভৌত গুণাবলি ।
- ডাল বীজের পরিপক্বতা ।
- ডাল বীজের আর্দ্রতা ইত্যাদি।

ডাল প্রস্তুতকরণ বা মিলিং সাধারণত দুই ভাবে হয়ে থাকে। যথা- খোসা আগলাকরণ ও খোসা অপসারণ।

**খোসা আলগাকরণ:** সব ডালের খোসা অপসারণের আগে আলগা করে নিতে হয়। তাছাড়া ডালের শাঁস ও খোসা সহজে পৃথক করা যায় না। ডালের খোসা সহজে আলগাকরণের জন্য ডাল শুকিয়ে নিতে হয়। ডাল ভালোভাবে শুকিয়ে না নিলে আলগাকরণের সময় ডালের শাঁস চ্যাপ্টা হয়ে গুঁড়া হয়ে যায়।

**খোসা অপসারণ:** ডালের খোসামুক্তকরণ প্রক্রিয়া গ্রামীণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র আকারে হস্তচালিত মেশিনে ও বাণিজ্যিকভাবে আধুনিক মিলিং মেশিনে সম্পন্ন করা হয়।

**গ্রামীণ পদ্ধতি:** গ্রামীণ পদ্ধতিতে ডাল ভাঙানোর জন্য দুই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন- হামানদিস্তা ও যাঁতা।

চিত্র ৪.৮: আধুনিক ডাল মিলিং মেশিন

**আধুনিক মিলিং মেশিন:** এ মেশিন দ্বারা ডালের খোসায় ফাটল ধরানোর জন্য খসখসে রোলার ব্যবহার করা হয়। রোলার ঘুরতে থাকলে ডাল দানা রোলারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। ডালের খোসায় ফাটল ধরানোর পর অ্যাব্রেসিভ রোলারের সাহায্যে খোসামুক্ত করা হয়। অনেক সময় ডালে ০.১-১ ভাগ পরিমাণ ভোজ্য তেলের প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে করে তেল খোসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শাঁসকে খোসা থেকে সহজে আলাদা করে ফেলে। তারপর এই ডাল ট্যাপারিং রোলারের সাহায্যে সহজেই খোসা অপসারণ করা হয়। তেল ব্যবহারে ডাল দানা তেল চুষে নেয় ফলে খোসা ও শাঁসের মধ্যকার শক্ত বাঁধন শিথিল হয়ে যায়।ডালের খোসা ও শাঁসের মধ্যকার বাঁধন শিথিল করার জন্য তেল বা পানি ব্যবহার করার পর ডালের টেম্পারিং করতে হয়। টেম্পারিং করার জন্য তেল বা পানি মিশানো ডাল শুকাতে হয়। আর্দ্রতা কমানোর জন্য ডাল দানা স্তূপাকারে রাখা হলে সমস্ত দানা তাপে গরম হয়ে যায়। এ তাপ দানার মধ্যে অনেক সময় ধরে থাকতে পারে। তবে আর্দ্রতা পরিমিতকরণ করতে অনেক সময় লাগে।তাই পানি বা তেল মেশানোর কাজ রাতের বেলায় করে পরিমিতকরণের কাজ করা হয়। এ ডাল দানা পরের দিন সকালে মিলিং এর উপযোগী হয় এবং সহজে ও অল্প সময়ে খোসামুক্ত করা যায়।

# ৪.৩ ডাল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

ডাল থেকে নানা ধরনের খাবার তৈরি করা যায় যেমন- খিচুড়ি, পিঁয়াজু, ঘুঘনি, চটপটি, ডালপুরি ইত্যাদি। আবার গ্রামাঞ্চলে ডাল বেটে শুকিয়ে ডালের বড়ি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন তরকারিতে ডাল মিশিয়ে খাওয়া হয়। ডাল থেকে নানা রকম মিষ্টিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। যেমন- মুগের জিলাপি, মাসকলাই ডালের আমিত্তি। এছাড়া ডালের হালুয়া, ডালের বেসন ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

## ৪.৩.১ ডাল রান্না করার সাধারণ পদ্ধতি

ডাল রান্না করার পূর্বে কিছু নিয়ম-কানুন জেনে নেয়া উচিত। অড়হর ডাল, মটর ডাল এবং ছোলার ডালের একটি ধর্ম হচ্ছে এগুলো সিদ্ধ হতে চায় না, অনেক সময় লাগে। ডাল সিদ্ধ প্রক্রিয়া নিচের বিষয়ের উপর নির্ভরশীল-

- ডালের প্রকারভেদ
- পানির খরতা
- খাবার সোডার ব্যবহার
- চাল ধোয়া পানি
- নারিকেল তেলের ব্যবহার।

**ডাল রান্না করার সাধারণ নিয়মাবলি**

- প্রথমে ডালের আকার ছোট করে নিতে হবে। যদিও সব ডালের আকার ছোট করতে হয় না।
- ডাল রান্নার পূর্বে ভালো করে ধুয়ে ১-২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- তারপর ডালের সাথে প্রয়োজনীয় মসলা, লবন ও পানি যোগ করে চুলায় তাপ দিতে হবে।
- ডাল রান্নার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ডাল ও পানি আলাদা আলাদা না থাকে। ডাল ও পানি যত মিশবে ততই খেতে সুস্বাদু হবে।
- ডাল সিদ্ধ হলে কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে অন্য আরেক পাতিলে রসুন, পেঁয়াজ, আস্ত জিরা মশলা দিয়ে বাঘার (টক জাতীয় ফল) দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

## ৪.৩.২ মসুর ডাল থেকে পিঁয়াজু ও বড়া প্রস্তুত প্রণালি

হালকা নাস্তার জন্য পিঁয়াজু ও ডালপুরির তুলনা নেই। বিশেষ করে বিকেলে চা এর সাথে পিঁয়াজু বা ডালপুরি সকলেই খুব পছন্দ করে। সেজন্য দেখা যায় শহরে বন্দরে গরম গরম পিঁয়াজু ও ডালপুরির চাহিদা অনেক বেশি। পিঁয়াজু তৈরিতে পিঁয়াজ বেশি ব্যবহার করলে খেতে সুস্বাদু হয়।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- মসুরের ডাল ২৫০ গ্রাম
- ডালের বেসন ২০ গ্রাম
- আদা বাটা ২০ গ্রাম
- শুকনা মরিচের গুঁড়া ৫ গ্রাম
- কাঁচা মরিচের কুচি ৫ টি
- লবণ পরিমাণমত
- পেঁয়াজ কুচি ১০০ গ্রাম
- সয়াবিন তেল পরিমাণমত

চিত্র ৪.৯: পিঁয়াজু

**পিঁয়াজু প্রস্তুত প্রণালি**

ডাল ধুয়ে ডুবো পানিতে ৪-৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর পানি ছেঁকে ডাল বাটতে হবে। ডালের মন্ডের সাথে শুকনা মরিচ, পিঁয়াজ, আদা, লবণ ও কাঁচা মরিচ ও বেসন ভালোভাবে মেশাতে হবে। তেল ভালোভাবে গরম হলে চার আঙ্গুল দিয়ে ডালের মণ্ড তুলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে তেলে ছাড়তে হবে। এমনভাবে বেশ কয়েকটি পিঁয়াজু এক সাথে ভাজতে হবে। পিঁয়াজু মচমচে হলে তেল ছেঁকে তুলে টিস্যু বা কাগজের উপর রাখতে হবে। পিঁয়াজু সস বা সালাদ দিয়ে পরিবেশন করা যায়। বড়াতে পিঁয়াজের পরিমাণ কম হবে এবং এর আকৃতি গোল ও মোটা হবে। পিঁয়াজুতে পিঁয়াজের পরিমাণ বেশি হবে। আকৃতি চ্যাপ্টা হবে।

### ৪.৩.৩ অঙ্কুরিত মুগের সালাদ, পরোটা, পাকোড়া ও মুগাঙ্কুর প্রস্তুত প্রণালি

সব ধরনের ডালের মধ্যে মুগ ডাল অন্যতম। মুগ ডাল থেকে বহু ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম দেয়া হলো-

- মুগ ডালের পরোটা
- মুগ ডালের পাকোড়া
- মুগাঙ্কুর
- অঙ্কুরিত মুগের সালাদ ইত্যাদি

**মুগ ডালের পরোটা প্রস্তুত প্রণালি**

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- সবুজ মুগ ডাল ১ কাপ
- টমেটো পেস্ট ২ টেবিল চামচ
- পিঁয়াজ ১ টা কুচি করা
- রসুন কুচি আধা চা চামচ
- হলুদ কোয়ার্টার চা চামচ
- লবণ ১ চা চামচ
- চিনি $\frac{1}{4}$ চা চামচ

চিত্র ৪.১০: মুগ ডালের পরোটা

১০১৪

- আটা/ময়দা ২ কাপ
- জোয়ান ১/৪ চা চামচ
- লবণ আধা চা চামচ
- পানি ১ কাপ
- সাদা তেল ২ টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ বাটা ১ চা চামচ
- ঘি আধা কাপ

**প্রস্তুত প্রণালি:** প্রথমে ডাল ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কুকার গরম হলে তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে পিঁয়াজ কুচি ভাজতে হবে। এবার রসুন কুচি ভেজে আদা বাটা দিতে হবে। তারপর কাঁচা মরিচ বাটা আর টমেটো পেস্ট যোগ করে নাড়তে হবে। এবার ভিজিয়ে রাখা সবুজ মুগ, হলুদ, লবণ ও চিনি, পরিমাণমত পানি দিতে হবে। কুকারে ঢাকনা লাগিয়ে প্রয়োজন মত সিদ্ধ করে নামিয়ে নিতে হবে। এবার আটা, পানি, লবণ, জোয়ান দিয়ে মেখে খামির বানিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। খামির থেকে ছোট ছোট বলের মত বানাতে হবে। একটি বল নিয়ে রুটির মত বেলে মাঝখানে আগেই বানিয়ে রাখা সবুজ মুগ ডালের পুর দিতে হবে। এবার চারদিকে মুড়ে আবার রুটির মতো বেলে নিতে হবে। সব বানানো হয়ে গেলে ঘি/তেল দিয়ে দুদিকে ভাজতে হবে। ভাজা হলে দই বা যে কোনও চাটনি বা সবজি এর সাথে পরিবেশন করতে হবে।

**মুগ ডালের পাকোড়া প্রস্তুত প্রণালি**

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- মুগ ডাল- ৫০০ গ্রাম
- আদা-রসুন বাটা - এক টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ কুচি- পরিমাণমত
- ধনিয়া পাতা কুচি- আধা কাপ
- চাট মসলা - এক চা চামচ
- গরম মসলা গুঁড়া- এক চা চামচ
- পরিমাণমত লবণ
- পরিমাণমত তেল

চিত্র ৪.১১: মুগ ডালের পাকোড়া

**প্রস্তুত প্রণালি:** আগে থেকে মুগ ডাল একটি পাত্রে ভালোভাবে ধুয়ে ৭-৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর পানি থেকে মুগ ডাল তুলে ভালো করে বেটে নিতে হবে। এই পেস্টটা ঘন রাখতে হবে। এবার ডালের পেস্টে গরম মসলা গুঁড়া, চাট মসলা, আদা-রসুন পেস্ট, কাঁচা মরিচ কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। চুলায় একটি প্যানে তেল গরম করে

নিতে হবে। এবার ডালের পেস্ট থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে গরম তেলে ছাড়তে হবে। বাদামী রং না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। ভাজা হলে উঠিয়ে নিয়ে গরম গরম সসের সাথে পরিবেশন করা যাবে।

**মুগাঙ্কুর প্রস্তুত প্রণালি:** আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় ডাল হিসেবে খাবার ছাড়া মুগের ব্যবহার অত্যন্ত কম। মুগ বীজ থেকে তৈরি মুগাঙ্কুর একটি উৎকৃষ্ট সবজি হিসেবে আমাদের দেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মুগাঙ্কুর থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাবার তৈরিসহ মাছ, মাংস ও অন্যান্য সবজির সাথে খাওয়া যায়। এতে শর্করা, আমিষ, খনিজ লবণসহ প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। পুষ্ট, পরিপক্ব বীজ ৩-৪ দিন পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে রাখলেই তা অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুর বৃদ্ধি পেয়ে ৩-৪ সেমি লম্বা হলে তা খাবার হিসেবে খাওয়া যায়। সাধারণত ১ কেজি বীজ থেকে ৮-৯ কেজি মুগাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তারপর পানি ঝেড়ে নিয়ে মুগাঙ্কুর বিভিন্ন খাবারের সাথে খাওয়া যায় এবং সালাদ হিসাবেও খাওয়া যায়।

**অঙ্কুরিত মুগের সালাদ প্রস্তুত প্রণালি**

**প্রয়োজনীয় উপকরন**

- অঙ্কুরিত মুগ ডাল ২ কাপ
- আলু ১ টি ছোট করে কেটে সিদ্ধ করা
- টমেটো কুচি ৩ টেবিল চামচ
- শসা কুচি ৩ টেবিল চামচ
- গাজর কুচি ৩ টেবিল চামচ
- পেঁয়াজ কুচি ৩ টেবিল চামচ
- মুলা কুচি ১ টেবিল চামচ
- ধনিয়া পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ স্বাদমত
- চাট মসলা আধা চা চামচ
- গোল মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
- লবণ পরিমাণমত
- লেবুর রস ১ চা চামচ

চিত্র ৪.১২: মুগাঙ্কুর

**মুগাঙ্কুর এর সালাদ প্রস্তুত প্রণালি:** সালাদ তৈরির জন্য আস্ত মুগ বীজ ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। ৩-৪ দিন পর অঙ্কুর বের হলে প্রেসার কুকারে সামান্য পানি দিয়ে ৫ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, টমেটো ও শসা কুচি, গাজর কুচি, মুলা কুচি মিশাতে হবে। অত:পর লেবুর রস, লবণ, চাট মসলা ও গোল মরিচ গুঁড়া মিশিয়ে মুগের সালাদ পরিবেশন করতে হবে।

## ৪.৩.৪ ছোলা ডালের হালুয়া প্রস্তুত প্রণালি

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- ছোলার ডালের পেস্ট ১ কাপ
- নারিকেল পেস্ট ২ কাপ

- চিনি  আধা কাপ
- এলাচ ২/৩ টি
- জাফরান  সামান্য
- গুঁড়া দুধ ১ কাপ
- কাঠ বাদাম কুচি ২ চা চামচ
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- পেস্তা  বাদাম কুচি ২ চা চামচ
- কিসমিস ৮/১০ টি

চিত্র ৪.১৩: ছোলার ডালের হালুয়া

**প্রস্তুত প্রণালি:** প্রথমে বুটের ডাল ২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় এবং পরে পানি ফেলে দিতে হয়। নতুন পানিতে ডাল এমনভাবে সিদ্ধ করতে হয় যেন ডালের পানি শুকিয়ে যায়। ডাল মিহি করে বেটে পেস্ট করে নিতে হয়। একটি সসপ্যানে ঘি নিয়ে জ্বাল দেওয়ার  পর গরম হয়ে এলে ছোলার ডালের পেস্ট যোগ করে কিছুক্ষণ নাড়তে হয়। এবার,নারিকেল পেস্ট, জাফরান ও গুঁড়া দুধ এতে যোগ করে ভালো করে নাড়তে হয়। ঘন হয়ে এলে এর মধ্যে কাঠ বাদাম,পেস্তা বাদাম ও কিসমিস যোগ করে চুলার আঁচ অল্প করে আবারও নাড়তে হয় । হালুয়ার পানি শুকিয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে এর ওপরে আবার পেস্তা বাদাম, কাঠ বাদাম ও চেরি দিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

## ৪.৩.৪ মাস কলাই, খেসারি ডালের বড়া, বেগুনি, কুমড়ার বড়ি, কচুড়ি ও আমৃত্তি প্রস্তুত প্রণালি

**বেসন তৈরি:** প্রথমে উত্তম মানের খেসারি অথবা মাষকলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করতে হয় এবং কুলা দিয়ে ঝেড়ে ধুলাবালি ও অপদ্রব্য পরিষ্কার করতে হয় । পাথরের যাঁতায় ডালের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। গম ভাঙ্গানোর মেশিনে এই ডাল ভাঙ্গায়ে বেসন পাওয়া যায়। ছোলার বেসনের মতো খেসারি বেসন দিয়েও বড়া, বেগুনি পিঁয়াজু ইত্যাদি উপাদেয় খাবার তৈরি করা যায়।

চিত্র ৪.১৪: ডালের বেসন

**বড়া তৈরি:** পরিমাণমত বেসন নিয়ে তাতে লবণ ও পানি দিয়ে গোলা তৈরি করে নিতে হবে। গোলার সাথে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে হবে। কড়াইয়ে তেল গরম হলে ছোট ছোট বড়া তৈরি করে তেলে আস্তে আস্তে লাল করে ভাজতে হবে। গরম গরম সস দিয়ে খেলে ভাল লাগে।

**বেগুনি তৈরি:** খেসারির বেসন পরিমাণমত নিয়ে বড়া তৈরির মতো গোলা তৈরি করতে হবে। তারপর বাজার থেকে লম্বা বেগুন কিনে পাতলা

চিত্র ৪.১৫: বেগুনী

করে স্লাইস করা হয়। অতঃপর স্লাইসগুলো গোলায় ডুবিয়ে তেলে ভেজে নিলেই বেগুনি তৈরি হয়ে যাবে।

মাষকলাই ও চালকুমড়ার বড়ি: পরিপক্ক বড় আকারের চালকুমড়া সংগ্রহ করে কাটতে হয়। কুমড়ার খোসা ও বিচি ফেলে মাংসল অংশ কুরানির সাহায্যে পেস্ট বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। এই মন্ড একটি পাতলা কাপড়ে নিয়ে সারারাত ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এদিকে খোসা ছাড়ানো পুষ্ট মাষকলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করে ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভেজানো ডাল পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে শিল-পাটায় পিষে কাই তৈরি করতে হয়। চালকুমড়ার পেস্ট ও ডালের কাই ভালো করে মিশ্রণ করে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে তা পাটি বা বড় পলিথিন শীটে সাজিয়ে রাখতে হয়। ২-৩ দিন বড়ি রোদে শুকাতে হয়। শীতকালে এ বড়ি তৈরি করে পলিব্যাগে বা টিনের কৌটায় বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করতে হয়। মাষকলাইয়ের বড়ি মাছের তরকারি বা সবজির সাথে ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ৪.১৬: মাষকলাই-কুমড়ার বড়ি

কচুরি: এটি একটি নাস্তা (Snacks) জাতীয় হালকা খাবার। কচুরি তৈরিতে ছোলার ডাল, ময়দা ও কিছু মসলা লাগবে। প্রথমে পরিমাণমত টাটকা ছোলার ডাল নিয়ে সামান্য চুন ও পানি দিয়ে মেখে নিয়ে রেখে দিতে হবে। ডাল ভালোভাবে সিদ্ধ করে পানি ঝরাতে হবে। কচুরির জন্য কালোজিরা, মৌরি, কড়াইয়ে ভেজে গরম থাকতেই থেঁতো করে নিতে হবে। এটাই কচুরির মসলা। পুরে খাবার সোডা মেশালে কচুরির ভিতর জালি জালি হবে। ময়দার খামির করে তা রুটির মত বেলে নিতে হবে। পুলি পিঠার মতো কেটে তাতে কচুরীর পুর দিয়ে চারধারে এটে নিতে হবে। কড়াইয়ে ঘি গরম করে কাঁচা কচুরিগুলো ভেজে নিতে হবে। কচুরিগুলো বাদামি রঙ হলে তা নামিয়ে ঘি মাখিয়ে সসসহ পরিবেশন করা যাবে। ছোলার ডাল ছাড়াও মুগ ডাল ও কলাইয়ের ডাল দিয়েও কচুরি তৈরি করা যায়।

চিত্র ৪.১৬: কচুরি

**আমৃতি:** মিষ্টান্নের জগতে আমৃতি খুবই পরিচিত একটি নাম। এটি খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে অনেকটা জিলাপির মতো তবে জিলাপির চেয়ে এটি বেশ শক্ত এবং গোলাকার।এটি চিনির রসে ভিজিয়ে শক্ত করা হয়।

**আমৃতির জন্য চিনির সিরা তৈরি:** প্রথমে তিন ভাগ চিনি ও এক ভাগ পানি নিতে হবে। কড়াইতে চিনিসহ পানি জাল দিতে হবে। চিনির গাদ বা ফেনা উঠলে তা চামচ দিয়ে তুলে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। সমস্ত গাদ ফেলে দেয়ার পর সিরা লালচে হয়ে উঠলে কড়াই নামিয়ে সিরা ছেঁকে রাখতে হবে। অল্প আঁচে চুলায় চাপালে ঘন সিরায় পরিণত হবে।

চিত্র ৪.১৭: আমৃতি

**আমৃতি তৈরি:** প্রথমে আমৃতি তৈরির ১০ দিন আগে ১ কেজি মাষকলাইয়ের ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। ডাল ভিজাবার ২ দিন পর ২০ গ্রাম চুনের পানি মিশাতে হয়। ১০ দিন পর ঐ ডাল বেটে আধা কেজি আতপ চালের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে গোলা তৈরি করতে হবে। গোলা যেন পাতলা হয়। এরপর কড়াইতে ঘি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জিলাপি তৈরির মতো একটি ন্যাকড়া জোগাড় করে তাতে ছিদ্র করে গোলা ভরতে হবে। এরপর কড়াইয়ে গরম ঘিয়ের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমৃতির মতো পাক দিতে হবে। পাক যত সুন্দর হবে আমৃতি দেখতে তত সুন্দর হবে। কড়াইতে যে কটা আমৃতি আটবে ঠিক সে কটাই দিতে হবে। উল্টে পাল্টে দিয়ে লালচে রঙের হয়ে এলে ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তুলে আমৃতি চিনির সিরায় ডুবাতে হবে। ১০-২০ মিনিট পর তুলে পাত্রে সাজিয়ে রাখতে হবে। অনেকে মাষকলাই ডালের পরিবর্তে সুজি দিয়ে আমৃতি তৈরি করে থাকে ।

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

### জব নং-০১

**জবের নাম: মুগাঙ্কুর তৈরিকরণ।**

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড**

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ মুগাঙ্কুর তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ মুগাঙ্কুর তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ উপযুক্ত মুগ ডাল নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৫ মুগাঙ্কুর তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

১.৬ অঙ্কুরিত মুগ খাওয়ার উপযোগী কিনা পরীক্ষা করবে।

১.৭ মুগাঙ্কুর তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

১.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৯ কার্যক্ষেত্রের নিয়মানুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

## প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

## প্রয়োজনীয় টুলস

- চালনী ও ডালা
- কাঠি ও পাত্র
- ড্রাম
- মাটির পাতিল
- ঝাঁঝরি
- পলি ব্যাগ
- নেট কাপড়
- কুলা ও যাঁতা
- সসপ্যান
- হাতাযুক্ত তারের জালি
- চায়ের কাপ
- নাইফ
- বিভিন্ন প্রকার স্পুন

## প্রয়োজনীয় উপকরণ

- মুগ ডাল/বীজ
- ক্যালশিয়াম হাইপো ক্লোরাইড
- সয়াবিন
- পানি
- ঝুড়ি

## প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স

## কার্যপদ্ধতি

- কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- মাঝারি ধরনের মসৃণ খোসাযুক্ত বীজ মুগাঙ্কুরের জন্য নিতে হবে।
- বীজগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

- পানি ঝরানো মুগ মাটির পাত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। বীজ বেশি ঘন করে দেওয়া যাবে না। তাই পাত্রের তলদেশে ২-৩ স্তর করে বীজ ছড়াতে হবে।
- পাত্রে বীজ রাখার পর ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪ ঘণ্টা এবং শীতকালে ৬-৭ ঘণ্টা পরপর হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে অঙ্কুর যেন শুকিয়ে না যায়।
- অঙ্কুরিত বীজকে ছত্রাকমুক্ত রাখার জন্য ১২ লিটার পানিতে ১ চা চামচ ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইড মিশিয়ে প্রতি রাত ভিজা কাপড়েরর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ৭-৮ দিন পর অঙ্কুরিত মুগ বীজ ৮-৯ সে.মি. লম্বা খাবার উপযোগী।
- অঙ্কুরিত মুগবীজ তুলে বড় ড্রামে পানির মধ্যে খুব সাবধানে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- অঙ্কুরিত মুগবীজের মান বেশি সময় বজায় রাখার জন্য হালকা গরম পানিতে ৩-৪ মিনিট ব্লানচিং করে নিতে হবে।
- এভাবে প্রাপ্ত মুগাঙ্কুর সালাদও সবজি হিসেবে বিভিন্ন খাবারের সাথে খাওয়া যায়।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে ।**

## সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- অঙ্কুর যেন কোনোভাবেই শুকিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- মুগবীজ বেশি বড় বা বেশি ছোট যেন না হয়, মাঝারি আকৃতির হতে হবে।

## জব নং-০২

**জবের নাম: ডালের বেসন তৈরিকরণ।**

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড**

২.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
২.২ ডালের বেসন তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
২.৩ ডালের বেসন তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
২.৪ ডালের বেসন তৈরির ডাল নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
২.৫ কুলা দিয়ে ঝেড়ে ছোলা বা খেসারির ধুলা পরিষ্কার করবে।
২.৬ ডালের বেসন তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
২.৭ তৈরিকৃত বেসন পলিথিন বা এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
২.৮ ডালের বেসন তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
২.৯ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
২.১০ ডালের বেসন তৈরির অব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

## প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

## প্রয়োজনীয় টুলস

- চালনী ও ডালা
- ড্রাম
- ঝাঁঝরি
- কুলা ও যাঁতা

## প্রয়োজনীয় উপকরণ

- ছোলা/খেসারী ডাল
- পলি ব্যাগ

## প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- ব্লেন্ডার মেশিন
- গ্রাইন্ডার মেশিন
- সিলিং মেশিন

## কার্যপদ্ধতি

- স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পরিপুষ্ট, অক্ষত ছোলা বা খেসারি ডাল বাছাই করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
- কুলা দিয়ে ঝেড়ে ছোলা বা খেসারির ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হবে।
- পাথরের যাঁতায় ছোলায় বা খেলারির খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- গ্রাইন্ডার/ব্লেন্ডার মেশিনে ছোলা বা খেসারির ডাল ভাঙ্গাতে হবে। মিলে ভাঙ্গানোর ফলে ছোলা হতে পাউডার বা ময়দা তৈরি হবে। একে বেসন বলে।
- এই বেসন পলিথিন বা চটের বস্তায় সিলিং মেশিনের সাহায্যে মুখ বন্ধ/সিলিং করে রেখে দিলে ১ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

- এই বেসন হতে বেগুনি, পিঁয়াজু বিভিন্ন ধরনের রুটি তৈরি করা যাবে।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে।**

### সতর্কতা

- ডাল উন্নত মানের না হলে ভালো বেসন হবে না।
- সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে বেসনে পোকা ধরবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- গ্রাইন্ডার/ব্লেন্ডার মেশিন সতর্কতার সাহায্যে পরিচালনা করতে হবে।

## জব নং-০৩

**জবের নাম: চানাচুর তৈরিকরণ।**

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

৩.১ কার্যক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
৩.২ চানাচুর তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৩.৩ চানাচুর তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৩.৪ চানাচুর তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
৩.৫ চানাচুর তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
৩.৬ তৈরিকৃত চানাচুর পলিথিন বা এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
৩.৭ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৩.৮ চানাচুর তৈরির অব্যাবহৃত সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

### প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

### প্রয়োজনীয় টুলস

| ক্রমিক নং | টুলস | ক্রমিক নং | টুলস | ক্রমিক নং | টুলস |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ঝাঁঝরি | ৭. | হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত | ১৩. | বিভিন্ন প্রকার |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | চামচ | | ডাইস |
| ২. | ওয়েট ব্যালেন্স | ৮. | হাতাওয়ালা তারের জালি | ১৪. | বোল |
| ৩. | চায়ের কাপ | ৯. | সিলিং মেশিন | ১৫. | বাঁশের চালুনি |
| ৪. | চুলা | ১০. | চা চামচ | ১৬. | সসপ্যান |
| ৫. | ছোট বাটি | ১১. | পানির জগ | ১৭. | সিলিং মেশিন |
| ৬. | কড়াই | ১২. | পলিব্যাগ | | |

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

| ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ | ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ছোলার ডালের বেসন | ৫০০ গ্রাম | ৭. | মরিচের গুঁড়া | ৩০-৩৫ গ্রাম |
| ২. | চীনাবাদাম | ১০০ গ্রাম | ৮. | সাইট্রিক এসিড | ১০ গ্রাম |
| ৩. | আধাভাঙ্গা মটর ডাল | ৫০ গ্রাম | ৯. | লবণ | পরিমাণমতো |
| ৪. | চিড়া | ৫০-১০০ গ্রাম | ১০. | ডিম | ৪-৫ টি |
| ৫. | জিরার গুঁড়া | ২০ গ্রাম | ১১. | সয়াবিন তেল প্রায় | ৫০০ মি.লি. |
| ৬. | ধনিয়ার গুঁড়া | ২০ গ্রাম | ১২. | পানি | পরিমাণমতো |

**প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট**

- ওয়েট ব্যালেন্স
- ব্লেন্ডার মেশিন
- গ্রাইন্ডার মেশিন
- সিলিং মেশিন

**কার্যপদ্ধতি**

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামুলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- ছোলার বেসনের সাথে অল্প পরিমাণে পানি মিশাতে হবে যেন খামিরটি অল্প শক্ত হয়।
- এর সাথে রং, ডিম, সাইট্রিক এসিড এবং লবণ মিশিয়ে ডাইসে নিতে হবে।
- চুলায় কড়াই দিয়ে সয়াবিন তেল জ্বাল দিতে হবে।
- তেল ফুটে উঠলে তেলের কড়াইয়ের উপর একজন সহকারীকে সাথে নিয়ে চিকন ঝুড়ি তৈরির ডাইস ধরতে হবে।
- অল্প পরিমাণ খামির নিয়ে ডাইসের উপর চাপ দিলে চিকন ঝুরি গুলো গরম তেলে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতে হবে।
- ভাজা হয়ে এলে চামচ দিয়ে তুলে তেল ঝরার জন্য ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে রাখতে হবে।

- একই পদ্ধতিতে মোটা ঝুরি, গাটিয়া, পাপড় ও বুন্দিয়া সতর্কতার সাথে সময় নিয়ে ভাজতে হবে।
- চিনা বাদামের খোসা ফেলে কিছু সময় পানিতে ভিজিয়ে তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে।
- মটর ডাল প্রায় ৫-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে।
- চিড়াগুলো পরিষ্কার করে তেলে ভেজে নিতে হয়।
- একটি টেবিলের উপর পলিথিন কাগজ বিছিয়ে তার উপর প্রস্তুতকৃত ঝুড়ি, বাদাম, ডাল, চিড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া নিতে হবে। সব মিক্সার মেশিনে নিয়ে বা হাত দ্বারা ভালোভাবে মিশাতে হবে।
- বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের পলিব্যাগে ভরে সিলিং মেশিনের সাহায্যে সিলিং করতে হবে। এভাবে চানাচুর তৈরি করতে হবে।

**এই জবটি ছয় বার অনুশীলন করতে হবে ।**

## সতর্কতা

- ঝুরি যেন গরম তেলে পুড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বুন্দিয়া তৈরির খামির তরল গোলার মতো করতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- চুলার আগুন হতে সতর্কতার অবলম্বন করতে হবে।

## অনুশীলনী-৪

### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডাল কাকে বলে?
২. ডালকে কেন গরিবের মাংস বা দারিদ্রের প্রোটিন বলে?
৩. একজন মানুষের দৈনিক ডালের চাহিদা কত?
৪. অঙ্কুরিত ডালে কী ভিটামিন থাকে?
৫. ডালে কোন ধরনের পুষ্টিবিরোধী উপাদান থাকে?
৬. ল্যাথাইরিজম বলতে কী বুঝায়?
৭. ডাল সংরক্ষণের জন্য ডালের আর্দ্রতা শতকরা কত ভাগ হওয়া দরকার ?
৮. ডাল বীজের পোকা দমনের জন্য কী ওষুধ দেওয়া যায়?

৯. মুগাঙ্কুর মানে কি?
১০. মুগাঙ্কুরে কী কী পুষ্টি থাকে?
১১. কচুরি বলতে কী বুঝায়?
১২. আমৃতি কি?

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ল্যাথাইরিজম রোগ থেকে মুক্তির উপায় কি?
২. ডাল বীজ সংরক্ষণের পর্যায়গুলো কি কি?
৩. ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. ডাল মিলিং কী কী অবস্থার উপর নির্ভর করে।
৫. ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতিগুলো কি কি?
৬. মুগ ডালের পরোটা কিভাবে বানাতে হয়?
৭. মুগ ডালের পাকোড়া তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. কচুরি কী ধরনের খাবার?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য ও পুষ্টিতে ডাল বীজের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. ডালের পুষ্টি উপাদান বর্ণনা কর।
৩. ডাল সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা দাও।
৪. গোলাজাত ডাল ফসলে পোকার আক্রমণ ও দমন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
৫. ডাল মিলিং এর গ্রামীণ ও আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৬. ডাল রান্নার সাধারণ নিয়মাবলি ও ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৭. মুগ ও মটর ডাল থেকে পরোটা, পাকোড়া, মুগাঙ্কুর তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. ছোলার ডালের হালুয়া কিভাবে তৈরি করতে হবে?

# পঞ্চম অধ্যায়

# তেল বীজের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

# Introduction to Oil Seeds, Processing and Storage

মুখরোচক স্বাদের যে কোনো খাবার রান্নাতেই তেলের প্রয়োজন। তেল স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য। তেল খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু করে, খাদ্যগুণকে অটুট রাখে এবং খাবারের খসখসে ভাব দূর করে। তেলে যে ভিটামিন বা খাদ্যগুণ রয়েছে তা খাদ্যবস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে এর স্বাদ ও গুণাগুণকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমাদের দেশের তেল ফসলগুলো হচ্ছে সরিষা, তিল, চিনাবাদাম, তিসি, গর্জনতিল, সূর্যমুখী, কুসুম ফুল, সয়াবিন, নারিকেল ইত্যাদি। তেল ফসলগুলো আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে- আমাদের দৈনিক ২২ গ্রাম তেল খাওয়া প্রয়োজন। আমরা উদ্ভিজ্জ তেল ফসল থেকে দুই ধরনের তেল পেয়ে থাকি। যেমন- উদ্বায়ী তেল ও অনুদ্বায়ী তেল।

## এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- তেল বীজের পরিচিতি জানতে পারব।
- তেল বীজ থেকে তৈরিকৃত বিভিন্ন খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারব।
- তেল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারব।

**উদ্বায়ী (Volatile) তেল:** যে সকল তেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাষ্পায়িত হয়ে উড়ে যায় তাকে উদ্বায়ী তেল বলে। যেমন- লেমন ঘাসের তেল, দারুচিনির তেল, কমলা লেবুর খোসারতেল, গোলাপের পাপড়ির তেল ইত্যাদি। এ তেল সুগন্ধি এবং কনফেকশনারিতে ব্যবহার করা হয়।

**অনুদ্বায়ী (Non Volatile) তেল:** যে সকল তেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাতাসে মিশে যায় না বা বাষ্পায়িত হয় না তাদেরকে অনুদ্বায়ী তেল বলে। যেমন- সরিষা তেল, তিলের তেল, সয়াবিন তেল, বাদাম তেল, সূর্যমুখী তেল, তিসির তেল, ভেরেন্ডার তেল ইত্যাদি। উদ্ভিদ উৎস থেকে প্রাপ্ত এ তেলকে ভোজ্যতেল (Edible Oil) বলা হয়।

## ৫.১ তেল বীজের পরিচিতি

যেসব শস্য থেকে তেল পাওয়া যায়, সেগুলোকে তৈলবীজ বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। যথা- ভোজ্য তৈলবীজ (সরিষা, তিল, চিনাবাদাম, সয়াবিন ইত্যাদি) এবং অভোজ্য তৈলবীজ (তিসি, রেড়ি ইত্যাদি)।

### ৫.১.১ বিভিন্ন তেল বীজের নাম ও জাত

**তেল ফসলের বিভিন্ন জাত:** বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য তেল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তেল ফসলের উফশী জাতসমূহ নিম্নের সারণিতে বর্ণনা করা হলো-

**সারণি ৫.১: বিভিন্ন জাতের তেল বীজের বৈশিষ্ট্য ও ফলন**

| ক্রমিক নং | তেল ফসলের নাম | জাতের নাম | জাতের বৈশিষ্ট্য | ফসল/হেঃ (টন) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | সরিষা | টরি-৭ | ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্ণের। তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%। | ৯৫০-১০০০ কেজি |
| | | সোনালী সরিষা (এস এস-৭৫) | ফলে ৪ টি কক্ষ থাকে। বীজ হলদে সোনালী, গোলাকার। তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%। | ১.৮-২.০ |
| | | বারি সরিষা-৮ (ন্যাপাস-৮৫০৯) | ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট। ফুল হলদে, বীজের রঙ কালচে। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৫%। | ২.১-২.৫ |
| | | রাই-৫ | পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে। ফুলকুঁড়ির নিচে অবস্থান করে। বীজ লালচে বাদামি। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%। | ১.০-১.১ |
| ২. | চিনাবাদাম | মাইজচর বাদাম (ধাকা-১) | পাতা হালকা সবুজ, প্রতি বাদামে ১-২ টি দানা, দানার আকার মাধ্যম, গোলাকার, রঙ হালকা বাদামি। | ১.৮-২.০ টন রবিতে ১.৬-১.৮ খারিফে |
| | | ঝিঙ্গা বাদাম (এসিসি-১২) | বাদামে দানার সংখ্যা ৪ টি, আকার মধ্যম, চ্যাপ্টা ও হালকা বাদামি, খরা সহনশীল জাত। | ২.৪-২.৬ |
| | | ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১) | বাদামের শিরা উপশিরা খুব স্পষ্ট, দানার আকার বড়। বীজের সুপ্তিকাল ১০-১৫ দিন। | ২.৭-৩.১ রবিতে ২.০-২.৫ খারিফে |
| | | বারি চিনা | তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%। | ২.৩-২.৫ |
| ৩. | সূর্যমুখী | কিরণী ডিএস-১ | জাতটির কান্ডের ব্যাস ১.৫-২.০ সে.মি.। পরিপক্ক পুষ্পমঞ্জুরী বা শাখার ব্যাস ১২-১৫ সে.মি.। প্রতি মাথায় বীজের সংখ্যা | ১.৬-১.৮ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ৪০০-৬০০। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪২-৪৪ ভাগ। জাতটি মোটামুটি অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল। | |
| ৪. | গর্জন তিল | শোভা | গাছের কাণ্ড সাধারণত সবুজ ও বেগুনী রংয়ের হয়। ফুল ছোট ও হলুদ রংয়ের। বীজ সূচাকৃতির এবং ১.২৫ সে.মি. পাতলা ও বেশ মসৃন। | ১.০৫-১.১০ |
| ৫. | পামওয়েল | রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে ফলন শুরু হয়। একটানা ৬০-৭০ বছর ফল দিয়ে থাকে। বছরে ৮-১০টি কাঁদি আহরণ করা যায়। | | একটি কাঁদি ওজন ৪০-৮০ কেজি পর্যন্ত হয়। |

## ৫.১.২ তেল ফসলের পুষ্টিমান

**তেলের পুষ্টিমান:** তেল ফসল বা তেলবীজ উদ্ভিজ চর্বির একটি উৎকৃষ্ট উৎস। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের আধিক্যের উপরই উদ্ভিজ্জ তেলের গুণাগুণ নির্ভর করে। ১ গ্রাম তেল থেকে ৯ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। নিচে বিভিন্ন প্রকার তেলের পুষ্টিমানের বর্ণনা দেওয়া হলো:

**সরিষার তেল:** সরিষা সাধারণত ৪০-৪৪% তেল এবং ২৪-২৫% আমিষ থাকে। সরিষা থেকে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। সরিষার তেলের বর্ণ হলুদ ও বিশেষ গন্ধযুক্ত। অনেক স্থানে সরিষার তেল Salad Oil এবং কাসুন্দি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। সরিষা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

**তিলের তেল:** তিলে সাধারণত ৪২-৪৫ % তেল এবং ২ % আমিষ থাকে। তিলে ৩৫-৫০% সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে যা স্বাস্থের জন্য ভালো। খোসা ছাড়ানো তিলে প্রায় ১৮.২% আমিষ থাকে।

**তিসির তেল:** তিসির বীজে ৩৫-৩৮% তেল ও তিসির খৈল এ ৭-১০% তেল থাকে। তিসির তেল ভোজ্য নয়।

**গর্জন তিলের তেল:** গর্জনতিল একটি ভোজ্যতেল ফসল। এ বীজে শতকরা ৩৮-৪২ ভাগ তেল, ২০-২৫ ভাগ আমিষ, ৪.৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এ তেলে মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের মধ্যে লিনোলিক এসিডের পরিমাণ ৫০ % এবং ফলিক এসিডের পরিমাণ ৩০ %।

**চিনাবাদামের তেল :** চিনাবাদাম একটি পুষ্টিকর তেলজাতীয় খাদ্য। চীনাবাদামের তেলকে এরাকিস তেল বা পিনাট তেল বলে যা দেখতে হালকা হলুদ বর্ণের। এর বীজে শতকরা ৪৮-৫০ ভাগ শর্করা,২৫-৩০ ভাগ তেল,৪০-৪৫ ভাগ আমিষ, সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ১৫-২০ ভাগ ও ৫-৭ ভাগ খনিজ পদার্থ রয়েছে। এই তেলে প্রচুর পরিমণে পামিটিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড, অলিক এসিড, লিনোলিক এসিড ও অ্যারাকিডোনিক এসিড থাকে। চীনাবাদামে যথেষ্ট ভিটামিন বি, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন ই এবং অল্প পরিমাণে ভিটামিন এ, সি ও ডি রয়েছে।

**সূর্যমুখী তেল:** সূর্যমুখী বীজে শতকরা ৪২-৪৪ ভাগ তেল এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমিষ থাকে। এ তেলে ৪০-৪৫% লিনোলিক এসিড এবং ২৫-৩০% অলিক এসিড থাকে। সূর্যমুখীর বীজে ১৫-২০% আমিষ ও ১৫-৩০% শর্করা থাকে। সূর্যমুখী তেল চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের একটি ভালো দ্রাবক। এ তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমিয়ে রোগীদের অত্যন্ত উপকার করে। এ তেল ভিটামিন ই সমৃদ্ধ।

**সয়াবিন তেল:** সয়াবিন বীজে ৩৯-৪১% আমিষ, ১৯-২১% তেল এবং ২৪-২৬% শ্বেতসার এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যারোটিন রয়েছে।

**পাম অয়েল:** পাম গাছের বীজের মাংসল অংশ থেকে ১ ভাগ ও বীজের শাস থেকে ১ ভাগ পাম কার্নেল তেল পাওয়া যায়। পাম তেল স্বাদহীন, গন্ধহীন ও হালকা হলুদ বর্নের। পাম তেলে বিটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন ই বেশি থাকে। পাম তেলে ১১% লিনোলিক এসিড ৪০% অলিক এসিড আছে।

**নারিকেল তেল:** নারিকেল তেলের ৯৯% চর্বি যার প্রধান অংশই সম্পৃক্ত চর্বি। ১০০ গ্রাম নারকেল তেলে ৮৯০ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। সম্পৃক্ত চর্বির অর্ধেক হচ্ছে লরিক এসিড। এছাড়া নারিকেল তেলে ফাইটোস্টেরল পাওয়া যায়।

**চালের কুঁড়ার তেল বা রাইস ব্রান অয়েল:** চালের কুঁড়ায় ২০-২৫% তেল থাকে। এই তেলে শূন্য মাত্রায় কললেস্টেরল এবং আমিষ পাওয়া গেছে। এ তেল ভিটামিন ই সমৃদ্ধ। নিম্নে সারণিতে তেল বীজের পুষ্টিমানের তালিকা দেওয়া হলো-

সারণি ৫.২: বিভিন্ন তেলবীজের পুষ্টি তালিকা

| ক্রমিক নং | তেল ফসল | আমিষ (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | শক্তি (kcal) | চর্বি (গ্রাম) | খনিজ পদার্থ (গ্রাম) | জলীয় পদার্থ (গ্রাম) | আঁশ (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | চিনাবাদাম | ২৫.৩ | ২৬.১ | ৫৬৭ | ৪.০.১ | ২.৪ | ৩.০ | ৩.১ |
| ২. | সরিষা | ২০.০ | ২৩.৮ | ৫৪১ | ৩৯.৭ | ৪.২ | ৮.৫ | ১.৮ |
| ৩. | তিল | ১৮.৩ | ২৫.০ | ৫৬৩ | ৪৩.১ | ৫.২ | ৫.৩ | ২.৯ |
| ৪. | তিসি | ২০.৩ | ২৮.৯ | ৫৩০ | ৩৭.১ | ২.৪ | ৬.৫ | ৪.৮ |
| ৫. | গর্জন তিল | ২৩.৯ | ১৭.১ | ৫১৫ | ৩৯.১ | ৪.৯ | ৪.২ | ১০.৯ |
| ৬. | কুসুম ফুল | ১৩.৫ | ১৭.৯ | ৩৫৬ | ২৫.৬ | ২.৬ | ৫.৫ | ৩৪.৯ |
| ৭. | সূর্যমুখী | ১৯.৮ | ১৭.৯ | ৬২০ | ৫২.১ | ৩.৭ | ৫.৫ | ১.০ |
| ৮. | সয়াবিন | ৪৩.২ | ২০.৯ | ৪৩২ | ১৯.৫ | ৪.৬ | ৮.১ | ৩.৭ |
| ৯. | নারিকেল (শুষ্ক) | ৬.৮ | ১৮.৪ | ৬৬২ | ৬২.৩ | ১.৬ | ৪.৩ | ৬.৬ |

### ৫.১.৩ তেল ফসলের বীজ সংরক্ষণ

**সরিষা বীজ:** পরিষ্কার ও শুকনা বীজ প্রায় দুই বছর পর্যন্ত বায়ুরোধী পাত্রে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ জন্য কেরোসিন টিন বা মুখ বন্ধ করার উপযোগী মাটির পাত্র ব্যবহার করা যায়। বীজ সংরক্ষণের জন্য ৮ % বা এর কম আর্দ্রতা হলে বীজের ক্ষতি হয় না। তাই ৮-১০% আর্দ্রতা পর্যন্ত বীজ শুকানো উচিত।

**তিল বীজ:** বীজ শুকায়ে তাড়াতাড়ি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বায়ুরোধী মাটির পাত্র, টিনের কৌটা বা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণ পাত্র ভালোভাবে শুকানো না হলে পাত্রের গায়ের সংস্পর্শে থাকা ছত্রাক বীজগুলোতে আক্রমণ করে।

**চিনাবাদাম বীজ:** চিনাবাদামের বীজ বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। তাই ৮-১০% আর্দ্রতায় শুকানো বীজ খোসাসহ (Pod) প্লাস্টিক ব্যাগে ভর্তি করে মুখ বায়ুরোধী করতে হবে। বায়ু নিয়ন্ত্রিত গুদামে রাখা হলে বীজ দীর্ঘদিন অক্ষত থাকে। গুদামে ২-৮°সে.তাপমাত্রা ও ৬৫ % আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রাখা হলে চীনাবাদাম বীজ দুই বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। এছাড়া প্রতি ১০০ কেজি বীজে ৩০০-৪০০ গ্রাম শুকনা চুন ($CaCO_3$) ছিদ্রযুক্ত কোটায় ভরে বায়ুরোধী প্যাকেটের মধ্যে রাখা হলেও চীনাবাদাম ভাল থাকে।

**সূর্যমুখী বীজ:** বীজ শুকিয়ে ৮% আর্দ্রতায় আসার পর ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে (কেরোসিন টিন, প্লাস্টিক লাইনার যুক্ত ব্যাগ বা মটকা ইত্যাদি) রাখতে হয়। বীজ পাত্রটি ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে প্রতি মাসে একবারে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। সূর্যমুখী বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে তেলের হার কমে যায়।

**সয়াবিন বীজ:** সয়াবিন বীজের সুপ্ততা খুব কম। তাই ভালোভাবে শুকায়ে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সয়াবিন বীজের বীজত্বক পাতলা, ফলে আঘাত পেলে বীজের ক্ষতি হয়।। উষ্ণ মন্ডলীয় দেশসমূহে সয়াবিন বীজ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা না হলে ৩-৪ মাসের মধ্যেই সুপ্ততা নষ্ট হয়ে যায়। তবে বায়ুরোধী শুষ্ক পলিব্যাগে বা ড্রামে ৮% আর্দ্রতা সম্পন্ন বীজ প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় রাখা যায়।

**তিসি বীজ:** তিসি বীজের ত্বক পাতলা হওয়ায় বেশি শুকালে ভঙ্গুর হয়। সংরক্ষণের জন্য নাড়াচাড়ায় বীজের গায়ে ফাটল ধরতে পারে। তাতে বীজে রোগজীবাণু আক্রমণ করতে পারে এবং সহজেই বীজের সুপ্ততা নষ্ট হতে পারে। তাই সতর্কতার সাথে রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে ভালোভাবে গুদামে সংরক্ষণ করলে ১০ বছর পর্যন্ত বীজ ভালো থাকে।

**গর্জন তিলের বীজ:** গর্জন তিলের বীজ ২-৩ দিন ভালোভাবে শুকানোর পর ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পলিব্যাগে বা পলিথিন লাইনারযুক্ত চটের ব্যাগে বা টিনের কৌটায় বা মটকায় সংরক্ষণ করা যায়। বীজ পাত্রটি শুকনা, ঠান্ডা ও উঁচু স্থানে রাখতে হয়।

## ৫.১.৪ গোলাজাত তেল ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

তেলবীজের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে সুনির্দিষ্ট কোনো পোকামাকড় চিহ্নিত করা যায় না। তবে দানাশস্য হিসেবে চাল, গম ও বাদামে যেসকল পোকা আক্রমণ করে সেগুলোই সাধারণত তেলবীজে আক্রমণ করে থাকে। যেমন- লাল শুসরী পোকা, খাপড়া বিটল পোকা ও সুরুই পোকা। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গোলাজাত তেল বীজের ক্ষতি করে। এ পোকা বীজের দানার খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে থাকে। ফলে দানা হালকা হয়ে যায়।

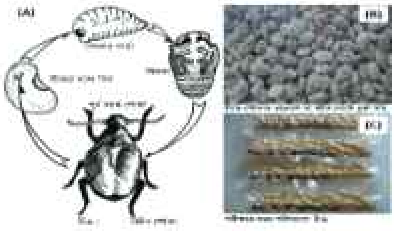

চিত্র ৫.১:তেল ফসলের ক্ষতিকারক পোকা

### গোলাজাত তেল ফসলের পোকামাকড় দমন

গোলাজাত তেল ফসলের পোকা দমনের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

### প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- তেল ফসল কাটার পরবর্তী সময়ে শস্যকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।
- তেল ফসলকে ভালোভাবে বাছাই করে গুদামজাত করতে হবে।
- গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গুদামজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- সংরক্ষণ পাত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মুখ খুব ছোট এবং পেট অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।
- শস্য ভর্তি করার পর মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।
- শস্য গুদামজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হবে।
- প্রতি কেজি শস্যের সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

**প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা**

- বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিভিভিপি (১০০) ইত্যাদির ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- গুদামজাত প্রতি টন বীজে ২-৪ টি ফসটকসিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হলে কীটপ্রতঙ্গ মারা যায়।

## ৫.১.৫ তেলবীজ মিলিং

**তেলবীজ মিলিং:** তেলবীজ মিলিং বা ভাঙ্গানোর পর আমরা তেল পেয়ে থাকি। তেলবীজ মিলিং এর জন্য প্রধানত চারটি পদ্ধতি প্রচলিত । যেমন-

- ঘানি পদ্ধতি
- এক্সপেলার পদ্ধতি
- সলভেন্ট এক্সট্রাকশন পদ্ধতি
- রিফাইনারি ও হাইড্রোজিনেশন পদ্ধতি

**ঘানি পদ্ধতি:** এটি তেলবীজ ভাঙ্গানোর গ্রামীণ ও পুরাতন পদ্ধতি। ঘানি সাধারণত মানুষ বা পশু চালিত হয়ে থাকে। সরিষা ও তিল সাধারণত ঘানিতে ভালো হয়ে থাকে। ঘানিতে সর্বাধিক ৭০% পর্যন্ত তেল নিষ্কাশন করা যায়। সম্পূর্ণ কাঠের অবকাঠামোতে হামান দিস্তার ন্যায় ঘানি দ্বারা বীজ চূর্ণকরণ ও পেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়।

চিত্র ৫.২: ঘানিতে তেল নিষ্কাশন

**এক্সপেলার পদ্ধতি:** ঘানির উন্নত ও আধুনিক যান্ত্রিক সংস্করণই হচ্ছে এক্সপেলার পদ্ধতি। এটি বিদ্যুৎ বা ডিজেল জাতীয় জ্বালানি দ্বারা চালিত। বর্তমানে এই নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারাই বেশির ভাগ তেলবীজ মিলিং করা হয়। এ যন্ত্র তেল নিষ্কাশনের হার প্রচলিত ঘানি অপেক্ষা বেশি। এ যন্ত্রে তেল নির্গমন পথে ফিল্টার দিয়েতেল পরিষ্কার করা হয়। এক্সপেলারের তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রচলিত ঘানির অনুরূপ।

চিত্র ৫.৩: এক্সপেলার

**সলভেন্ট এক্সট্রাশন পদ্ধতি:** তেল বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে অবশিষ্ট খৈল পড়ে থাকে তা থেকে সলভেন্ট এক্সট্রাকশন বা দ্রাবক আহরণ পদ্ধতিতে বাকি তেল নিষ্কাশন করা হয়।। প্রাপ্ত খৈলকে গুঁড়া করে তাতে ফুড গ্রেড হেক্সেন দ্রাবক যোগ করা হয়। অতঃপর ৯৩-১০৪°সে তাপমাত্রায় ভালো করে মিশ্রিত করা হয়। পাতন পদ্ধতিতে তেল ও দ্রাবক আলাদা করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত তেলকে ক্রুড ওয়েল (Crude oil) বা অপরিশোধিত তেল বলে।

**রিফাইনারি ও হাইড্রোজিনেশন পদ্ধতি:** এ ধরনের প্লান্টে সাধারণত তেল বা চর্বি থেকে ফ্রি ফ্যাটি এসিড (Free fatty Acid) কমানো হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে ছাঁকন পদ্ধতি দ্বারা নিষ্কাশিত তেল থেকে অদ্রাব্য পদার্থ দূর করা হয়। ছাঁকার জন্য ফিল্টার প্রেস (Filter Press) ব্যবহার করা হয়। গাম জাতীয় পদার্থ দূরীকরণ বা ডিগামিং (Deguming) করার জন্য ৮২°সে. তাপমাত্রায় উপর থেকে পানি ঢেলে দেওয়া হয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দ্বারা নাড়া হয়, তাতে বিজলা ও ঘোলা পদার্থ বা কলয়েডস (Colloids) ও ফসফোলিপিডস (Phospholipids) নিচে পতিত হয়। তেল নিরপেক্ষ করার জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্রবণ বা চুনের পানি ব্যবহার করা হয়। এরপর হাইড্রোজিনেশন (Hydrogenation) করে তেলের রাসায়নিক পরিবর্তন করা হয়। এতে তেলের বর্ণ ও গন্ধ দূর হয়। এই প্রক্রিয়া তেলকে বিশোধন করে এবংপ্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির সাথে মিশ্রণ বা ইমালশন ঘটিয়ে কোমল করা হয় যাতে এই তেল রান্নার কাজে, রুটি, বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি শিল্পের উপযোগী হয়। তেলকে হাইড্রোজিনেশন করে মার্জারিন বা ডালডাও তৈরি করা যায়।

চিত্র ৫.৪: আধুনিক রিফাইনারি মেশিন

১০১৪

### ৫.২ তেলবীজ থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

ভারতীয় উপমহাদেশে তেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রধানত রান্নার কাজে তেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও তেলবীজ থেকে বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি হয়। যেমন- কাসুন্দি, সয়াবড়ি ইত্যাদি।

#### ৫.২.১ সরিষা থেকে পাউডার, কাসুন্দি প্রস্তুত প্রণালি

**সরিষার পাউডার:** সরিষার বীজ ভালো করে বাছাই করে রোদে শুকাতে হয়। তারপর কড়াইতে ভালোভাবে ভেজে নিতে হয়। শিল-পাটা বা গ্রাইন্ডিং মেশিনে সরিষার দানাগুলো ভেঙে নিতে হয়। এভাবে সরিষার যে গুঁড়া পাওয়া যায় তা রান্নার কাজে, আচার ও স্যান্ডউইচ বানাতে ব্যবহার করা যায়। মাছ মাংস ও শাকসবজি রান্নাতেও এই পাউডার ব্যবহার করা যায়।

**সরিষার কাসুন্দি:** কাসুন্দি তৈরির প্রধান উপকরণ হচ্ছে রাই সরিষা। এটি একটি চীন দেশীয় খাবার। কাসুন্দি তৈরিতে সরিষা, হলুদ, মরিচ, আদা, জিরা, লবণ ও প্রিজারভেটিভ প্রয়োজন হয়। প্রথমে সরিষা ধুয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে তা শিলপাটায় বা গ্রাইন্ডিং মেশিন (Grinding machine) এ গুঁড়া করে নিতে হয়। কড়াইতে পানি ফুটিয়ে তাতে সরিষার গুঁড়া, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া, আদা বাটা ও লবণ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। চুলা থেকে নামানোর পূর্বে প্রতি কেজিতে ২-৩ গ্রাম সাইট্রিক এসিড (Citric acid) মিশাতে হয়। এরপর কাসুন্দি মাটির পাতিলে ভরে পাতিলের মুখ বন্ধ করে ২-৩ দিন রেখে দিতে হয়। কাসুন্দি রাখার কাচের বৈয়াম গরম পানিতে জাল দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। বোতলের উপরিভাগে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে রাখতে হয়। কাসুন্দি ভর্তি বোতল ৫-৭ দিন রোদে দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

চিত্র ৫.৬: কাসুন্দি

#### ৫.২.২ চিনাবাদাম থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

বিশ্বের অনেক দেশে চীনাবাদাম খুবই জনপ্রিয় খাবার। একক বা অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে চীনাবাদাম মিশিয়ে আকর্ষণীয় খাবার তৈরি করা যায়। চীনাবাদাম থেকে সাধারণত যেসকল খাদ্য তৈরি করা যায় তা নিম্নে দেওয়া হলো:

- চিনাবাদাম বালিতে ভাজা
- চিনাবাদাম তেলে ভাজা
- চানাচুর
- চিনাবাদাম বিস্কুট
- চিনাবাদাম মুড়কি বা চিক্কি
- চিনাবাদাম ময়দা
- চিনাবাদাম দুধ
- চিনাবাদাম দুধের দই
- চিনাবাদাম মাখন
- চিনাবাদাম বার

**চিনাবাদাম মুড়কি বা চিক্কি:** চিনি বা গুড় পাতিলে গুলিয়ে দ্রবণ তৈরি করে ছেঁকে নিতে হবে। তারপর জ্বাল দিয়ে সিরাপ তৈরি করতে হবে। সিরাপ ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে কড়াইয়ে ঢালতে হবে। অন্য চুলায় চীনাবাদামের শাঁস তেলে ভালো করে ভেজে নিয়ে গরম কড়াইয়ে ঢেলে দিতে হবে। চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে মুড়কি তৈরি করতে হবে।

চিত্র ৫.৭: চিনাবাদামের চিক্কি

**চিনাবাদামের বাটার:** ১ কেজি চীনাবাদাম, ১০০ গ্রাম চিনি ও ৫০ গ্রাম সয়াবিন তেল নিতে হবে। শিলপাটা খুব ভালো করে ফুটানো পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ভাজা চীনাবাদামের খোসা ফেলে শাঁসগুলোর পাতলা লাল আবরণ ফেলে দিতে হবে। বাদাম পাটায় অল্প অল্প চিনি দিয়ে বাটতে হবে। বাটা বাদাম সয়াবিন তেল দিয়ে ফেটাতে হবে। উচ্চ মাত্রায় ঘূর্ণনের ফলে তেল মিশে গেলে বাদামের প্রোটিন ও মাখন আলাদা হয়ে যায়। জীবাণুমুক্ত বোতলে মাখন ভরে বায়ুরোধী করে রাখতে হবে। এ মাখন বেশিদিন রাখা যায় না।

চিত্র ৫.৮: চিনাবাদামের বাটার

## ৫.২.৩ তিল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

**তিল বীজ থেকে খাদ্য:** আমাদের দেশে তিল তেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রাম অঞ্চলে রান্নার কাজে তিল তেল ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট কারখানায় পাউরুটি, রোল, কেক, কুকি ও ক্যান্ডিতে খোসা ছাড়ানো সাদা তিল বীজ ব্যবহার করা হয়। মাছ, মাংস, মুরগির মাংস, সবজি প্রভৃতি খাদ্য সুগন্ধময় করার জন্য তিল ব্যবহার করা হয়। অলিভ অয়েলের বিকল্প হিসেবে তিল তেল ব্যবহার করা যায়।

**তিলের নাড়ু:** তিল উত্তমরূপে ঝেড়ে ও বেছে নিয়ে কড়াইতে তেল দিয়ে তিলগুলো ভেজে নিতে হবে। চুলায় কড়াইতে পানি নিয়ে গুড় বা চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চিনির দ্রবণ ঘন হয়ে এলে অর্থাৎ সিরা হয়ে আসলে ভাজা তিলগুলো ছেড়ে দিয়ে উত্তমরূপে নেড়েচেড়ে নামাতে হবে। গরম থাকা অবস্থায় তিলের নাড়ু পাকিয়ে ঠাণ্ডা করে কোটায় সাজিয়ে রাখতে হবে। এ তিলের সাথে চালের গুঁড়া মিশিয়ে নাড়ু করতে হবে।

চিত্র ৫.৯: তিলের নাড়ু

চিত্র ৫.১০: তিলের খাজা

**তিলের খাজা:** এটি তৈরি করতে ঘি, চিনি ও ময়দা প্রত্যেকটি ১ কেজি করে লাগবে। ১ কেজি ময়দায় ২৫০ গ্রাম ঘি পরিমাণমত পানি দিয়ে উত্তমরূপে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। অতপর ২-৩ ইঞ্চি লেচি কেটে তা বেটে ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা করতে হবে। এই লেচিতে ঘি এর প্রলেপ দিয়ে দু'ভাজ করতে হবে এবং একটি ঠুঙ্গি মতো করতে হবে। উক্ত ঠুঙ্গি গোল পিঁড়ির উপর চতুর্দিকে সাজিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর হাত দিয়ে ঠুঙ্গি গোল চ্যাপ্টা করতে হবে। এভাবে কয়েকবার কুন্ডলী পাকাতে হবে এবং চ্যাপ্টা করে ঘি মাখাতে হবে। শেষে লেচি বা রুটি বানিয়ে তা ঘিতে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তা অন্য পাত্রে ঘি ঝরানোর জন্য রাখতে হবে। এরপর ভাজা খাজাকে চিনির সিরায় ডুবিয়ে তারপর সাদা তিল খাজার সম্পূর্ণ শরীরে লাগিয়ে সাজিয়ে রেখে দিতে হবে।

**তিলের চিক্কি:** প্রথমে তিলকে ভালো করে ভেজে নিতে হয়। চুলায় কম আঁচে চিনি ও পানি গরম করা হয়। মিশ্রণটি নাড়তে নাড়তে যখন ঘন হয়ে আসে তখন পরিমানমত পানি যোগ করতে হয়। নরম থাকা অবস্থায় সামান্য লেবুর রস দিয়ে ঘি মাখানো ট্রে এর উপর ঢেলে পুরু করে রুটির মতো বেলে নিতে হয়। তারপর গরম থাকা অবস্থায় ছুরি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করা যায়।

**মার্জারিন (Margarine):** একে উদ্ভিজ্জ তেলের মাখন বলে। আজকাল বিদেশে রান্নার কাজে মার্জারিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম তাপে স্থায়ী এমন উদ্ভিজ্জ তেলের ঘনত্ব বাড়িয়ে এবং সেই সঙ্গে ৩% লবণ মিশ্রণের মাধ্যমে মার্জারিন তৈরি করা হয়। তিল, নারিকেল, পাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে মার্জারিন তৈরি করা হয়। হৃদরোগীদের বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ব্যক্তিদের প্রাণিজ্জ চর্বি ব্যবহার না করে মার্জারিন ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

## ৫.৩ সয়াবিন থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

চিত্র ৫.১১: সয়াবিনের গাছ

সয়াবিন বিশ্বের অন্যতম একটি প্রধান তেল ফসল। সয়াবিনের বীজ থেকে উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্যতেল ও প্রোটিন পাওয়া যায়। এই তেলে শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যেমন- অলিক এসিড ও লিনোলিক এসিড উচ্চমাত্রায় থাকে। সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ অন্যান্য ডালের তুলনায় দ্বিগুণ, গমের চেয়ে চার গুণ ও দুধের চেয়ে বারোগুন বেশি। সয়াবিন থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। যেমন- সয়াদুধ, সয়া, নাগেট ইত্যাদি।

## ৫.৩.১ সয়াবিন থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য

যেকোনো ডালের সাথে সয়াবিন মিশিয়ে রান্না করলে তার পুষ্টিমান বেড়ে যায়। তবে সয়াবিনের পুষ্টিবিরোধী পদার্থ দূরীকরণের জন্য সয়াবিন অধিক সময় ধরে নিয়মানুযায়ী রান্না করতে হয়। সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যগুলো হলো-

- সয়া ময়দা
- সয়া ছাতু
- সয়া ময়দা ও আটা মিশ্রিত চাপাতি
- সয়া ডাল
- সয়াবিনের মিশ্রডাল
- সয়াবিনের সবজি বা তরকারি

**সয়াবিনের নাস্তা ও মিষ্টান্নসমূহ**

- সয়া ময়দার নাড়ু
- সয়া বাদাম বরফি
- জিলাপি
- সয়া বুন্দিয়া
- সয়াবিন বাদামের বিস্কুট
- সয়াবিনের সমুচা
- সয়াবিনের বড়া ও পেঁয়াজু

## ৫.৩.২ সয়াবিনের পুষ্টিমান

**সয়াবিনের পুষ্টিমান:** ভোজ্যতেল ও প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী সয়াবিন চাষ করা হয়। সয়াবিন তেলে সুস্বাস্থ্যের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সয়াবিন তেল রক্তে কোলেস্টেরল জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে। সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

**সারণি ৫.৩: সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ (প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ)**

| ক্রমিক নং | খাদ্য উপাদান | ফসল | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সয়াবিন | ছোলা | মুগডাল | মসুর | অড়হর |
| ১. | ক্যালরি | ৪৩২ | ৩৭২ | ৩৪৮ | ৩৪৩ | ৩৩৫ |
| ২. | প্রোটিন (গ্রাম) | ৪৩.২ | ২০.৮ | ২৪.৫ | ২৫.১ | ২২.০ |
| ৩. | তেল বা চর্বি (গ্রাম) | ১৯.৫ | ৫.৬ | ১.২ | ০.৭ | ১.৭ |
| ৪. | খনিজ পদার্থ (মি.গ্রা.) | ৪.৬ | ২.৭ | ৩.৫ | ২.১ | ৩.৫ |

**সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ:** সয়াবিন তেলে কিছু অপুষ্টিকর পদার্থ থাকে যেমন- ট্রিপসিন ইনহিবিটর, (Trypsin inhibitor) ও হিমাগ্লুটিনিন (Haemagglutinin)। এতে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না এবং পেট ফাঁপার মতো অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়া সয়াবিনজাত খাদ্যে এক ধরনের ঘাস ঘাস গন্ধ থাকে যা বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশসহ অনেক দেশের লোকজন পছন্দ করে না।

**অপুষ্টিকর পদার্থ দূরীকরণের উপায়**

- সয়াবিন রান্নার পূর্বে কমপক্ষে ২০ মিনিট গরম পানিতে ভালোভাবে ফুটিয়ে পরে পানি ফেলে দিতে হবে।
- ১০ মিনিট ধরে রোস্টিং (Roasting) করতে হবে।
- সয়াবিনের খোসা ছাড়িয়ে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ($NaHCO_3$) এর সহযোগে সারারাত (১২ ঘন্টা) পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি ফেলে দিতে হবে। তারপর গরম পানিতে ফুটালে এবং পরবর্তীতে ফুটানো পানি ফেলে দিলে সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় কমে যায়।

## ৫.৩.৩ গ্রামীণ পর্যায় বা ঘরোয়া পদ্ধতিতে সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার

সমস্ত সয়া খাদ্যকে দুই ভাবে ভাগ যায়। যথা :

- **গ্রামীণ পর্যায়ের সয়া খাদ্য**- পেঁয়াজু, শিংগাড়া, সয়ানাট, সয়া ঘুঘনি, সয়া চটপটি ইত্যাদি।
- **শিল্প পর্যায়ে সয়া খাদ্য**- চানাচুর, সেমাই, বিস্কুট, শিশু খাদ্য, কেক ইত্যাদি।

## গ্রামীন পর্যায়ের সয়া খাদ্য

**সয়া বাটা তৈরি:** মুখ খোলা পাত্রে দুই লিটার পানি নিয়ে তাতে ০.৫% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও সয়াবিন নিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ হলে ঠান্ডা পানিতে ডলে সয়াবিনের খোসা ছাড়াতে হয়। খোসা পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে শিল পাটায় বেটে কাই বা মণ্ড তৈরি করলে সয়া বাটা তৈরি হয় অথবা সয়াবিন শুকিয়ে মিলিং মেশিনে গুড়া করা যায়।

**সয়া পিঁয়াজু:** সদ্য প্রস্তুত সয়া বাটার সাথে পিঁয়াজু তৈরির সকল উপকরণ যেমন- গমের ময়দা বা চালের গুঁড়া শুকনা মরিচ বা মরিচ বাটা, কাঁচা মরিচ কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, আদা বাটা, ভালো করে মিশিয়ে মন্ড তৈরি করতে হয়। কড়াইয়ে তেল নিয়ে চুলায় গরম করা হয়। তেল গরম হলে বেশি পাতলা না করে অর্থাৎ সামান্য মোটা করে বড় বা মাঝারি সাইজের মন্ড তেলে ছেড়ে দিতে হয়। অল্প আঁচে জ্বাল দেওয়ার পর পেঁয়াজু বাদামি রঙ ধারণ করলে তখন ছিদ্রযুক্ত চামচ দ্বারা নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

**সয়া নাট:** এটি তৈরি করতে সয়া ডাল, তেল, মরিচ গুঁড়া ও বিট লবণের গুঁড়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে সয়া ডালকে ১৫-২০ মিনিট ভালোভাবে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। তারপর তেল গরম করে সয়া ডালকে ১০-১৫ মিনিট ডুবো তেলে ভেজে তুলতে হয়। খবরের কাগজের উপর বিছিয়ে দিলে ডালের গায়ের অতিরিক্ত তেল শুষে যাবার পর মরিচ গুঁড়া,বিট লবণ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও গোলমরিচ বা এলাচ গুঁড়া মিশিয়ে প্যাকেট বন্ধ করতে হয়। এই সয়া ডালকে সয়া নাট বলে।

চিত্র ৫.১২: সয়াবিনের ময়দা

**সয়া ময়দা:** ময়দা করার জন্য পরিমাণমত সয়াবিন সংগ্রহ করে তা হতে নষ্ট ও বিবর্ণ দানাগুলো বেছে বাদ দিতে হবে। পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ধুয়ে ৬-৮ ঘণ্টা ভিজাতে হবে। ভেজানো সয়াবিন একটি লোহার জালের উপর রেখে হাত দিয়ে ভালোভাবে ঘষে খোসা ছড়িয়ে নিতে হবে। শুধু হাত দিয়েও খোসা ছাড়ানো যেতে পারে। পানিতে দিলে খোসা ভেসে উঠবে এবং তা ফেলে দিতে হবে। খোসা ছাড়ানো সয়াবিন ১৫ মিনিট ধরে গরম পানিতে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটানো সয়াবিন পানি ঝরিয়ে একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ের উপর বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে শুকানোর পর তা আটা/ময়দার মিলে ভাঙিয়ে বা যাতায় পিষে সয়া ময়দা তৈরি করা হয়।

১০১৪

**সয়া ভাত:** সয়া ভাত রান্নার জন্য ১ ভাগ সয়া বাটা বা সয়া ময়দা ও ৯ ভাগ চালের প্রয়োজন হয়। চাল ভালো করে ধুয়ে হাঁড়িতে চাপাতে হয়। ভাত যখন অর্ধসিদ্ধ হয়ে আসবে তখন সয়া বাটা বা ময়দা দিয়ে ভালোভাবে ভাতের সাথে চামচ দিয়ে নেড়ে দিতে হয়। উত্তমরূপে ভাত সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতে হয়। ভাতের সাথে পানির পরিমাণ এমন ভাবে মিশাতে হবে যাতে মাড় না ফেলেই ভাত ঝরঝরে অবস্থায় নামানো যায়। এই ভাতে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে।

**সয়া খিচুড়ি:** পুষ্ট ও পরিপক্ক সয়াবিন ভালোভাবে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে আধাভাঙা করে নিতে হয়। একটি পাত্রে ঘি বা ডালডা নিয়ে গরম করতে হয়। পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিতে হয়। তারপর হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা, আদা বাটা, তেজপাতা, এলাচি, মসলা দিয়ে ডালের সাথে ভালো করে নাড়তে হয়। এরপর পরিমাণমত পানি ও চাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। খিচুড়ি সিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ধনে পাতা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে পানি শুকুয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

**সয়া চটপটি**

চটপটির উপকরণ হিসেবে সয়াবিন ২৫০ গ্রাম, হলুদ পরিমাণমত, আলু মাঝারি সাইজের ২টি, ডিম ৪টি, শুকনা মরিচের গুঁড়া ভাজা ১৫ গ্রাম, জিরার গুঁড়া ১০ গ্রাম, ভিনেগার ১০ মিলি, পেঁয়াজ কুচি ৬ টি, মাঝারি সাইজের কাঁচা মরিচ কুচি ১০ টি, লবণ প্রয়োজনমত তেঁতুল বা লেবুর রস প্রয়োজনমত, পানি পরিমাণমত নিতে হয়। প্রথমে সয়াবিন কিছুক্ষণ পানিতে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর ঠান্ডা পানিতে সারারাত বা কমপক্ষে ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। ধোয়া সয়াবিনের সাথে বাটা হলুদ পরিমাণমত মিশিয়ে চুলায় ১ ঘন্টা সিদ্ধ করতে হয়। আলু ও ডিম সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ায়ে নিতে হয়। আলু ও ডিম পছন্দমত আকারে টুকরা টুকরা করে কাটতে হয়। শুকনা মরিচ ও জিরা কড়াইতে দিয়ে অল্প জ্বালে ভেজে নিয়ে ঠান্ডা করে গুঁড়া করতে হয়। অপর দিকে সিদ্ধ সয়াবিনের সাথে বাকি আলু, সিরকা বা ভিনেগার, লবণ ও অর্ধেক পরিমাণ শুকনো ভাজা মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে পরিমাণমত পানি দিয়ে আবার জ্বাল দিতে হয়। পানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে এ মিশ্রণগুলো ডুবো ডুবো অবস্থায় থাকে। এ মিশ্রণ যখন ফুটতে আরম্ভ করবে তখন কাঁচা পেঁয়াজ ও কাটা কাঁচা মরিচ ছেড়ে দিতে হয়। কিছুক্ষণ ফুটার পর চুলা নিভিয়ে সয়াবিন চটপটি নামাতে হয়। চটপটি খাবার জন্য অন্য পাত্রে ঢেলে নিয়ে ডিম (স্লাইস করে কাটা), লেবুর রস এবং অবশিষ্ট জিরা ও মরিচের গুঁড়া উপরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

**সয়া সিঙাড়া:** সয়া ডাল ও গমের ময়দা ১২০ গ্রাম করে নিতে হবে। আলুর টুকরা, নারিকেল কুচি, মটর ডাল, ফুলকপির টুকরা, চিনাবাদাম ইত্যাদির সাথে লবণ, মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়াসহ অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ঘিয়ে ভেজে সিঙাড়ার পুর তৈরি করা হয়। এ পুরে মাছ, মাংসের কিমা, কলিজা, পনির ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তারপর সয়া ডাল ও গমের ময়দার খামির তৈরি করে ডিমের আকারের ন্যায় রুটি বেলে মাঝ বরাবর কাটা হয়। কর্তিত অংশ হাতে নিয়ে পানের খিলির মতো ভাজ দিয়ে তার মধ্যে পুর ভরে দিতে হয়। সামান্য পানি লাগিয়ে সিঙাড়ার মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর চোখা মুখ উপরে রেখে থালায় সাজিয়ে রাখতে হয়। কড়াইয়ে তেল গরম করে হালকা আঁচে ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হয়। হালকা বাদামি ও মচমচে হলে চুলা থেকে নামিয়ে সসসহ খাওয়া যায়।

**সয়া জিলাপি:** জিলাপি তৈরির জন্য সয়া ময়দা ও গমের ময়দা ১:১ অনুপাতে ঘন করে গুলে শীতের দিনে দুই দিন এবং গরমের দিনে একদিন ঢেকে রাখতে পারলে ভালো হয়। এছাড়া সয়া ময়দা ও গমের ময়দা ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে জিলাপি তৈরি করা হয়। চিনি পানিতে গুলে জ্বাল দিয়ে ফুটে উঠলে ময়লা ছেঁকে নিতে হয়। তারপর গোলাপ জল বা কেওড়া জল মিশিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। ময়দার উপর হালকা বুদবুদ উঠলে জিলাপি তৈরির উপযোগী হয়। সয়া ময়দা ও গমের ময়দার উপরের জমানো পানি ফেলে সামান্য জর্দার রঙ দিয়ে ভালো করে ময়দা ও পানি স্টেয়ারিং করে বা নেড়ে ঘন গোলা তৈরি করতে হয়। চারকোণা মোটা কাপড়ের এক টুকরার মাঝে ছিদ্র করে ভিজিয়ে নিতে হয়। তারপর ভিজা কাপড়ে সয়া ময়দা ও গমের ময়দার গোলা নিয়ে পুঁটলি আকারে নিতে হয়। কড়াইতে তেল বা ঘি গরম করে সয়া ময়দা ও গমের ময়দার গোলার পুঁটলি কড়াইয়ের উপর ধরতে হয়। গোলা চাপ দিয়ে প্রথমে গোল করে এক প্যাচ, ২য় বার ২য় প্যাচ এবং ৩য় বার অর্ধেক প্যাচ করে গোলা গরম তেলে দিতে হয়। এভাবে আড়াই প্যাচের জিলাপি পরপর লম্বা করে তৈরি করতে হয়। অল্প আঁচে বাদামি করে ভেজে উল্টেপাল্টে চিনির সিরায় ৮-১০ মিনিট ডুবিয়ে সিরা ঝরিয়ে প্লেটে তুলতে হয়। জিলাপি গরম গরম পরিবেশন করলে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে।

**সয়া রুটি বা পরোটা:** এক ভাগ সয়া ময়দা ও চার ভাগ গমের ময়দা সহযোগে সয়া রুটি ও পরোটা তৈরি করা হয়।একটি পাতিলে সয়া ময়দা ও গমের ময়দা মিশিয়ে পরিমাণমত লবণ ও পানি মাখায়ে রুটি তৈরির খামির তৈরি করতে হয়। এ খামির থেকে সাধারণ রুটি তৈরির মতো বেলে রুটি তৈরি করতে হয়। পরোটা জন্য খামির থেকে ছোট বল নিয়ে তাতে চাপ দিয়ে ভিতরে ও বাইরে সামান্য ডালডা মাখিয়ে কয়েকবার ময়দা দিতে হয়। এরপর বেলে রুটি বানাতে হয়। তেল ব্যবহার করে মোটা শীটের মতো বানানো হলে সেটি পরোটা এবং তেল ছাড়া পাতলা করে বানানো হলে সেটি রুটি হয়। এরপর তা ভেজে নিতে হয়। এই ভাবে সয়া লুচি, সয়া সিঙাড়া, সয়া পুরি, সয়া নিমকি, সয়া সেমাই ইত্যাদি সয়া খাদ্য স্বাভাবিক নিয়মে তৈরি করা যায়।

চিত্র ৫.১৩: সয়া পরোটা

### ৫.৩.৪ শিল্পজাত সয়া খাদ্য

সয়াবিন থেকে শিল্প পর্যায়ে খাবার তৈরি করতে হলে প্রথমে সয়াবিন ময়দা তৈরি করতে হয়। তারপর ময়দা দ্বারা সয়া চানাচুর, সয়া নাগেট, সয়া ছানা, সয়া দধি, সয়া দুধ, সয়া মাংস ইত্যাদি বানানো যায়।

**সয়া ময়দা:** ফুটন্ত পানিতে সয়াবিন ২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। তবে পানি ফুটিয়ে জ্বাল দেওয়ার সময় ০.৫% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশিয়ে নিলে সয়াবিনে ক্ষতিকারক উপাদান অপসারিত হয়। সিদ্ধ সয়াবিন পরিষ্কার পানিতে ডলে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। অতঃপর তা পাটিতে বা মাদুরে বিছিয়ে রোদে ভালোভাবে ২-৩ দিন ধরে শুকালে সয়াবিন শুকিয়ে কটকটে হয়। দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কটকট শব্দ করবে এবং ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যাবে। এবার গম ভাঙ্গার মেশিনে বেটে সয়া ময়দা তৈরি করা যায়। বায়ুরোধী অবস্থায় সয়াময়দা ৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়। ৫°সে তাপমাত্রায় ও ৫৯% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সয়া ময়দা পলিথিনে বায়ুরোধী করে রাখলে ভালো থাকে। শিল্প পণ্য তৈরির সময় সয়া ময়দার সাথে বিভিন্ন অনুপাতে গমের ময়দা মিশাতে হয়। কেননা সয়া ময়দায় গুটেন না থাকায় গমের ময়দা যোগকরলে (যা গুটেনসমৃদ্ধ) বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য তৈরিতে সুবিধা হয়।

**সয়া চানাচুর:** সয়া চানাচুরের জন্য সমপরিমাণ সয়া ময়দা, গমের ময়দা ও খেসারি বা হোলার বেসন নিতে হবে। সকল ময়দা, বেসন, সয়াবিন, তেল, লবণ, মসলার গুঁড়া ও পরিমাণমত পানি দিয়ে মন্ড বা খামির তৈরি করতে হবে। সামান্য রঙ গুলিয়ে মণ্ডের সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এরপর খেসারি ডালের বেসন দিয়ে ঝুরি তৈরি করতে হবে। ঝুরির সাথে পরিমাণমত বাদাম ভাজা, ডাল ভাজা, চিড়া ভাজা, মটরডাল ভাজা প্রভৃতি মিশিয়ে প্যাকেটজাত করতে হয়। চানাচুরকে মুখরোচক করার জন্য জিরা ভাজা গুঁড়ো বা অন্য কোনো মসলা মেশানো যেতে পারে।

**সয়া দুধ:** সাধারণত দুই পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরি করা যায়। যথা- সাধারণ পদ্ধতি ও আইএমএফ (Instant milk formula) পদ্ধতি।

চিত্র ৫.১৪: সয়া দুধ

**সাধারণ পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরিকরণ:** প্রথমে নিয়মানুযায়ী সয়া ময়দা তৈরি করতে হবে। এছাড়া ব্লেন্ডারে সয়াবিন মিহি করে গুঁড়া করা যায়। পানি মিশায়ে শিলপাটায় পেষা বা মেশিনে গুঁড়া করা সয়াবিন বেশ গাঢ় হয়। এ গাঢ় সয়াবিনকে লেই বলে। তারপর ৫:১ অনুপাতে ঈষৎ উষ্ণ পানি ও সয়াবিন মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিতে হয়। এরপর এ মিশ্রণ

কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে দুধ বের করে অন্য একটি পাত্রে নিতে হয়। ছাঁকার পর অবশিষ্ট সয়াবিনের কাই আলাদা করে অন্য খাবারে ব্যবহার করা যায়। প্রাপ্ত সয়া দুধে চিনি এবং মশলা মিশিয়ে মৃদু জ্বালে প্রায় ১৫-২০ মিনিট ফুটিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় খাওয়া যায়। এ দুধ সহজে হজমযোগ্য যা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সয়া দুধের সাথে গরুর দুধ মিশিয়ে অথবা ভিটামিন $বি_১$ বা $বি_{১২}$ মিশিয়ে পুষ্টিমান বাড়ানো যায়। অনেক সময় সুগন্ধি মিশিয়ে রুচিসম্মত করা যায়।

**IMF (Instant Milk Formula) পদ্ধতিতে সয়া দুধ:** পুষ্ট পরিপক্ক রোগমুক্ত বাছাই করা সয়াবিন ৯০°সে. তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট ধরে মেশিনে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানোর পর ডিহালার (Dehuller) মেশিনে সয়াডাল ভাঙিয়ে এসপিরেটরেব (Aspirator) সাহায্যে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। এ খোসা ছাড়ানো সয়া ডাল স্টিম জ্যাকেটেড কেটলিতে নিয়ে শতকরা ০.২৫ ভাগ বেকিং সোডা মিশিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটাতে হয়। ফুটানোর পর সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিয়ে ৯৫°সে তাপমাত্রায় গরম পানি দিয়ে ধুতে হয়। ধোয়া সয়াবিন পুনরায় ০.০৫% বেকিং সোডা মিশানো ফুটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে পানি ফেলে দ্বিতীয়বার ৯৫° সে.তাপমাত্রায় গরম পানিতে ধুতে হবে। এখন ডিজইনটেগরেটর (Disintegrator) বা বিয়োজিত করা মেশিনের সাহায্যে গরম পানি সহযোগে স্লারি (Slurry) মন্ড প্রস্তুত করতে হবে। রোলার সয়ামিল্ক এক্সট্রাক্টর (Roller Soya milk Extactor) এর সাহায্যে অর্থাৎ রোলারের চাপে দুধ নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। এ নিষ্কাশিত দুধ ১৫°সে. তাপে ১৫-২০ মিনিট হালকাভাবে ফুটিয়ে নিতে হয়। অন্যদিকে দুধ নিষ্কাশনের পর ছাঁকনির উপর পড়ে থাকা দ্রবণীয় পাউডার ও আঁশ জাতীয় পদার্থ অন্য খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মৃদু জ্বালে হালকাভাবে ফুটানো দুধ এখন হোমজিনাইজার (Homoginizer) এর সাহায্যে প্রথম ধাপে ৩৫০০ পিএসআই এবং দ্বিতীয় ধাপে ৫০০ পিএস আই চাপে ৯৫°সে তাপমাত্রায় হোমোজিনাইজড করে সয়া দুধের সকল উপাদান ভেঙ্গে সংমিশ্রণ করে দুধের সান্দ্রতা সর্বত্র সমরূপ বা সমঘনত্ব করতে হয়। এরপর এয়ারকুলার (Air Cooler) বা ফ্যানের সাহায্যে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ১০°সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা করতে হয়। এই ঠান্ডা দুধ বাণিজ্যিক প্লাস্টিক বোতলে ৪°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়।

সয়া দুধের সাথে গাভি, মহিষ, ছাগলে ও মাতৃদুগ্ধে বিদ্যমান পুষ্টিমানসমূহের তুলনা (প্রতি ১০০ মিলি লিটারে) নিম্নের ছকে দেখানো হলো-

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান সমূহ | সয়াবিন | গাভীর দুধ | মহিষের দুধ | ছাগলের দুধ | মাতৃদুগ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | আমিষ (গ্রাম) | ৩.৫ | ৩.৪ | ৩.৮ | ৩.৩ | ১.২ |
| ২. | চর্বি (গ্রাম) | ১.৫ | ৩.৭ | ৭.৫ | ৪.১ | ৩.৮ |
| ৩. | ক্যালরি (Kcal) | ৩৫ | ৬৯ | ১০০ | ৭৬ | ৭১ |
| ৪. | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.) | ২১ | ১২৫ | ২১০ | ১৩০ | ৩৩ |

উৎস : সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার- বি.এ.আর.আই, ২০০৮ ইং

**সয়া মাংস বা সয়া ছানা:** দেড় লিটার সয়া দুধ জ্বাল দিয়ে ফুটন্ত দুধে পরিমাণমত লেবুর রস বা সিরকা মিশিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হয় এবং দুধ জমতে শুরু করলে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হয়। ২-৩ মিনিটের মধ্যে সবটুকু দুধ জমে যাবে। জমা দুধ পরিষ্কার পাতলা কাপড় দ্বারা ছেঁকে সবটুকু ছানা আলাদা করে নিতে হবে। কাপড় খুব জোরে চেপে যতটুকু সম্ভব পানি বের করে নিতে হবে। কাপড়টি ১৫-২০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখার পর কাপড় থেকে ছানা বের করতে হয়। উক্ত ছানা পছন্দ অনুযায়ী আকার দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে ভেজে মসলা মিশিয়ে তরকারিতে মাংসের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। টুকরোগুলো ঠান্ডা পানিতে রাখলে এবং প্রতিদিন পানি পাল্টালে ৫-৬ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র ৫.১৫: সয়া মাংস

**সয়া দধি:** দেড় লিটার সয়া দুধের সাথে (১:৪) অনুপাতে গরুর দুধ বা গুঁড়া দুধ মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ৩০০ গ্রাম চিনি ও পছন্দমত মশলা মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হয়। দধি যে পাত্রে তৈরি করা হবে সে পাত্রটি প্রথমে ১ চা চামচ টক দধি দ্বারা মুছে কুসুম গরম দুধ ঢেলে নিয়ে ১০ মিনিট খোলা রাখতে হয়। পরে পাত্রের উপর পরিষ্কার সাদা কাগজ দ্বারা ঢেকে রাখলে ৬-৭ ঘন্টা পর সম্পূর্ণ দধি প্রস্তুত হয়।

চিত্র ৫.১৬: সয়া দই

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

**জবের নাম: সরিষার বীজ থেকে কাসুন্দি তৈরিকরণ।**

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড**

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ সরিষা হতে কাসুন্দি তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ কাসুন্দি তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ ভালো মানের সরিষা নির্বাচন করবে।

১.৫ সরিষা পানিতে ধুয়ে তারপর রোদে শুকাবে।

১.৬ কাসুন্দি তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

১.৭ কাসুন্দি তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

১.৮ তৈরিকৃত কাসুন্দি এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।

১.৯ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.১০ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

**প্রয়োজনীয় টুলস**

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- পানি
- রাই সরিষা ২৫০ গ্রাম
- শুকনা মরিচ ১-২ টি গুঁড়া করা
- হলুদের গুঁড়া ২ চা চামচ
- আদা বাটা
- জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
- লবণ ১ চা চামচ বা পরিমাণমত
- সাইট্রিক এসিড প্রতি কেজিতে ২-৩ গ্রাম
- কাচের বোতল
- দারুচিনি গুঁড়া ১ চা চামচ
- যোয়ান ১ চা চামচ
- মৌরি ১ চা চামচ
- ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
- তেজপাতা ১-২ টি

**প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট**

- ওয়েট ব্যালেন্স
- শিলপাটা/ব্লেন্ডার মেশিন

২০২৪

### কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- প্রথমে সরিষা ধুয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়।
- পরে তা শিলপাটায় বা গ্রাইন্ডিং মেশিন (Grinding Machine) এ গুঁড়া করে নিতে হয়।
- কড়াইতে পানি ফুটিয়ে তাতে সরিষার গুঁড়া, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া, আদা বাটা, লবণসহ অন্যান্য মশলা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়।
- চুলা থেকে নামানোর পূর্বে প্রতি কেজিতে ২-৩ গ্রাম সাইট্রিক এসিড (citric acid) মিশাতে হয়। সাইট্রিক এসিডের পরিবর্তে কয়েক টুকরা কাঁচা আম ব্যবহার করা যায়।
- এরপর কাসুন্দি মাটির পাতিলে ভরে পাতিলের মুখ বন্ধ করে ২-৩ দিন রেখে দিতে হয়। কাসুন্দি রাখার কাচের বৈয়াম গরম পানিতে জ্বাল দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। বোতলের উপরিভাগে ১/৮ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে রাখতে হয়। কাসুন্দি ভর্তি বোতল ৫-৭ দিন রোদে দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

**এই জবটি আট বার অনুশীলন করতে হবে ।**

### সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।

## জব নং-০২

### জবের নাম: সয়াবিন হতে সয়াদুধ তৈরিকরণ।

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

২.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

২.২ সরিষা হতে কাসুন্দি তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

২.৩ কাসুন্দি তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.৪ ভালো মানের সরিষা নির্বাচন করবে।

২.৫ সরিষা পানিতে ধুয়ে তারপর রোদে শুকাবে।

২.৬ কাসুন্দি তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

২.৭ কাসুন্দি তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

২.৮ তৈরিকৃত কাসুন্দি এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।

২.৯ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

২.১০ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

### প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

### প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পানি
- সয়া বিন ২৫০ গ্রাম
- ছাঁকার কাপড়
- তেজপাতা ১-২ টি
- দারুচিনি
- চিনি
- এলাচ ২-৩ টি
- জীবাণুমুক্ত কাচের বোতল

### প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- শিলপাটা/ব্লেন্ডার মেশিন

### কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পরিপুষ্ট, রোগমুক্ত, পরিষ্কার সয়াবিন ডাল ৭-৮ ঘণ্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২০২৪

- চুলায় পানি জ্বাল দিতে হবে। ফুটন্ত পানিতে ভিজানো সয়াবিন ৫-১০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ সয়াবিন নামিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার পানিতে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- খোসা ছাড়ানো সয়াবিনের সাথে অল্প অল্প গরম পানি মিশিয়ে শিল-পাটায় পিষে ১ লিটার বিশুদ্ধ পানিতে মিশালে সোয়া লিটার দুধ তৈরি হবে।
- পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে উক্ত দ্রবণ ছেঁকে নিলে যে তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে তাই সয়াদুধ।
- এই দুধ, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি ও পরিমাণমত চিনি দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। পরিবেশনের সময় সামান্য ভ্যানিলা বা চকলেট বা পাটালি গুড় মিশিয়ে দেয়া যায়।
- সয়া দুধের অবশিষ্টাংশ দিয়ে সয়া হালুয়া ও সয়া পিঠা তৈরি করা যায়।

**এই জবটি সাত বার অনুশীলন করতে হবে।**

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।
- বাটা সয়াবিনের সাথে ৫ গুণ পানি মেশাতে হবে।
- সয়াবিন কে ভালোভাবে ভেজানো ও সিদ্ধ করতে হবে অন্যথায় এর গন্ধ যাবে না।

## অনুশীলনী-৫

### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্যে তেলের আসল কাজ কী?
২. আমাদের দেশের তেল সমৃদ্ধ ফসল গুলো কী কী?
৩. আমাদের দৈনিক কতটুকু তেল খাওয়া প্রয়োজন?
৪. ১ গ্রাম তেল থেকে কত ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?
৫. সয়াবিন তেল কেন বহুমূত্র ও হৃদরোগীদের জন্য উপকারী?
৬. ঘানিতে সর্বাধিক কত ভাগ তেল নিষ্কাশন করা যায়?
৭. কোন এসিডের কারণে সরিষার তেল ঝাঁজযুক্ত হয়?
৮. সরিষার পাউডার কি কাজে লাগে?
৯. তিলের তৈরি কয়েকটি খাবারের নাম লেখ।

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্যে তেল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

২. উদ্বায়ী, অনুদ্বায়ী ও ভোজ্যতেল বলতে কী বুঝায়?

৩. সরিষার তেলের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

৪. চিনাবাদাম তেলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।

৫. ঘানি দিয়ে কীভাবে তেল নিষ্কাশন করে?

৬. সরিষা তেলের উপকারিতা ও অপকারিতা লখ।

৭. সরিষার পাউডার তৈরির পদ্ধতি লেখ।

৮. চিনাবাদাম থেকে কী কী খাদ্য তৈরি হয়?

৯. চিনাবাদামের বাটার কীভাবে তৈরি করা হয়?

১০. সয়া পিঁয়াজু তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১. সয়া ময়দা তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেলের পুষ্টি গুণাগুণ বর্ণনা কর।

২. সরিষা ও তিল তেলবীজ এর তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. চিনাবাদামের কী কী খাদ্য হয় এবং যেকোনো ৫টি খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৪. তিল থেকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৫. শিল্প পর্যায়ে সয়াবিন থেকে ময়দা, সয়া চানাচুর, সয়া দধি ও সয়া ছানা তৈরির প্রণালি লিখ।

৬. সাধারণ পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# আলুর পরিচিত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

# Introduction to Potato, Processing and Storage

আলু হল শর্করাসমৃদ্ধ একটি কন্দজাতীয় ফসল। আলুর জাতগুলো বিভিন্ন রঙ, আকার এবং আকৃতিতে দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বে অনেক দেশেই আলু প্রধান খাদ্য। পৃথিবীতে সবজি হিসেবে আলুর মোট উৎপাদন সর্বাধিক। আলু আমাদের দেশের আদি ফসল নয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চল থেকে প্রথমে ইউরোপে এবং তারপর পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উৎপাদনের দিক থেকে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই চতুর্থ স্থানে আছে আলু।

**এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-**

- আলুর পরিচিতি জানতে পারব।
- আলু থেকে তৈরিকৃত বিভিন্ন খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারব।
- আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারব।

## ৬.১ আলুর পরিচিতি

আলু বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান সবজি যা সারা বছর ধরে পাওয়া যায়। আলু একটি কন্দজাতীয়,এক বর্ষজীবী ফসল। সাধারণত ২ থেকে ৩টি চোখবিশিষ্ট কন্দের রোপণ খন্ডের মাধ্যমে আলুর বংশবিস্তার করা হয়। বীজ থেকে একই জাতের হুবহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যায় না। কান্ড সোজা বা ভূশায়ী, লিকলিকে, কাক্ষিক শাখাযুক্ত বা শাখাবিহীন। ফল গোলাকার, বাদামি সবুজ বা রক্তবর্ণের হয়। জনপ্রিয় জাতসমূহের কন্দ সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে।

### ৬.১.১ আলুর জাত, মৌসুম ও বৈশিষ্ট্য

আলুর প্রায় ৪০০০ এর উপরে জাত রয়েছে। আমাদের দেশে প্রধানত দুই (০২) জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে। যথা- দেশি জাত ও উচ্চফলনশীল উন্নত জাত।

বর্তমানে আলু চাষের মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে উন্নত জাতের আলু এবং ৩৫ ভাগ জমিতে দেশি জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে।

**দেশি জাত:** ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায়। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। কিছু দেশি জাত আছে যা উন্নত জাতের চেয়ে নাবি। দেশি জাতের আলু তুলনামূলকভাবে খেতে খুব সুস্বাদু। বর্তমানে বাজারমূল্যে উন্নত জাতের চেয়ে দেশি জাতের আলু বেশি দামে বিক্রি হয়। দেশি জাতসমূহের মধ্যে আউশা, চল্লিশা, দোহাজারী লাল, ফেইন্সাশীল, হাসরাই, লাল পাকরী, লালশীল, পাটনাই, সাদা গুটি, শীল বিলাতি ও সূর্যমুখী। দেশি জাতগুলো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। দেখা গেছে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেশি জাতের আলুর ফলন কমে যায়। তাই দেশি জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করে লাগানো উচিত।

**উচ্চফলনশীল জাত:** ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যেসব উন্নত জাতের আলুর চাষ হচ্ছে তার মধ্যে হিরা, আইলসা, পেট্রোনিস, মুল্টা, ডায়ামন্ট, কার্ডিনাল, মন্ডিয়াল, কুফরী সিন্দুরী, চমক, ধীরা, গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা ও চিনেলা জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে। বারি টিপিক্রস-১ এবং বারি টিপিক্রস-২ নামে ২টি হাইব্রিড জাতের আলু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে অবমুক্তি পাওয়া কিছু জাতের নাম, উৎপাদনের মৌসুম, হেক্টর প্রতি ফলন, ও বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নে দেয়া হলো-

**সারণি-৬.১: আলুর জাত, মৌসুম, ফলন ও বৈশিষ্ট্য**

| ক্রমিক নং | জাতের নাম | উৎপাদনের মৌসুম | হেক্টর প্রতি ফলন (টন) | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বারি আলু-১ (হীরা) | রবি মৌসুম | ২৫-৪০ | মৌসুমের আগে অথবা পরেও রোপন করা যায়। মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহনশীল। |
| ২. | বারি আলু-২ (মরিনি) | রবি মৌসুম | ২৫-৩০ | আলু সাদা, ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকারের। |
| ৩. | বারি টিপিএস-১ (টিউবারলেট) | রবি মৌসুম | সিডিলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০ | ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব। |
| ৪. | বারি টিপিএস-২ | রবি মৌসুম | সিডিলিং টিউবার | ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন |
| | (টিউবারলেট) | | ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০ | সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব। |

### ৬.১.২ আলুর পুষ্টিমান

আলু ভাতের চেয়ে পুষ্টিকর। শর্করার জোগান দেওয়ার পাশাপাশি আলু নানা ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা মেটায়। পাশাপাশি খাদ্য আঁশ থাকায় আলু হজমে সহায়ক এবং রক্তে শর্করার হার ঠিক রাখে। নিম্নের সারণিতে আলু ও চালের তুলনামূলক পুষ্টিমান দেখানো হলো।

**সারণি-৬.২: আলুর পুষ্টিমান**

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | আলু | |
|---|---|---|---|
| | | টাটকা | সেদ্ধ |
| ১. | পানি (%) | ৭৭.৫ | ৭৯.৮ |
| ২. | আমিষ (%) | ২.১ | ২.০ |
| ৩. | স্নেহ (%) | ০.১ | ০.১ |
| ৪. | মোট শর্করা (%) | ১৮.৫ | ১৮.৫ |
| ৫. | আঁশ (%) | ২.১ | ১.৩ |
| ৬. | ক্যালরি | ৮০.০ | ৭৬.০ |
| ৭. | ছাই (%) | ১.০ | ০.৯ |

### ৬.১.৩ আলুর ব্যবহার

আলুর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। নিচের আলুর ব্যবহার উল্লেখ করা হল-

- সবজি/তরকারি হিসেবে আলু ব্যবহার করা হয়।
- ভর্তা হিসেবে খাওয়া হয়।
- আলু ভাজি হিসেবে খাওয়া যায়।
- আলু হতে স্টার্চ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।
- আলুর ডাল রান্না করে খাওয়া যায়।
- আলু থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য যেমন- ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপস ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

### ৬.১.৪ আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

**আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ:** যে পদ্ধতিতে আলুকে পরিষ্কার করে আকার-আকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অথবা না ঘটিয়ে এবং ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা যায় তাকে আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। যেমন- আলুর তরকারি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপস তৈরি করে বাজারজাতকরণ ইত্যাদি।

#### আলুর সংরক্ষণ পদ্ধতি

উৎপাদন মৌসুমে আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বিধায় আলু সংরক্ষণ করতে হয়। আলু দুইভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যথা-

**স্থানীয়ভাবে ঘরে সংরক্ষণ:** মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে আলু-উত্তোলন করা ঠিক নয়। আলু সকালের দিকে উত্তোলন করতে হয়। আলু সম্পূর্ণভনে পরিপক্ব হলে তুলতে হয়। আলু তোলার ৭-১০ দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে আলুর ছাল বা চামরা শক্ত করতে হয়। তাতে সংরক্ষণ গুণ বাড়ে। আলু তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোদাল বা লাঙ্গলের আঘাতে আলু কেটে না যায়। আলু তোলা শেষে পরিবহনের জন্য চটের বস্তা ব্যবহার করাই ভালো। সাধারণত বস্তায় আলু ভরার সময় প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার

করা উত্তম। যদি বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঝুড়ির মাঝখানে চট বা ছালা বিছিয়ে সেলাই করে নিতে হয়। আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে আলু ক্ষেতে রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিছিয়ে পাতলা কাপড় বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বাড়িতে এনে আলু পরিষ্কার, শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। আলু ঢালার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন বেশি জোরে বেশি উঁচু থেকে আলু ঢালা না হয়। আলু সংগ্রহ শেষে ১-৭ দিন পরিষ্কার ঠান্ডা জায়গায় আলু বিছিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিতে হয়। এতে আলুর গায়ের ক্ষত সেরে যাবে ও পোকার আক্রমণ থেকে আলু রক্ষা পাবে। এভাবে আলু রেখে দেওয়ার পদ্ধতিকে আলুর কিউরিং (Curing) বলে। আলু সংরক্ষণ করার আগে কাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করতে হয়। সংগ্রহের ৭-১০ দিনের মধ্যে আলু পরিষ্কার করে আকার অনুযায়ী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রেড করতে হয়। বাছাই করা আলু ঠান্ডা ও বাতাসযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হয়। আলু সংরক্ষণের জন্য ছনের ছাউনি দেয়া ও বড় গাছের ছায়ায় অবস্থিত ঘর সবচেয়ে উপযোগী। মেঝেতে বা বাঁশের মাচায় প্রথমে পাতলা করে ঔষধ মিশ্রিত বালু (৩ টন শুকনা বালুর সাথে ১ কেজি সেভিন পাউডার কীটনাশকের গুঁড়া মিশাতে হবে) বিছিয়ে তার উপর আলুর অনধিক ১৫ সে.মি. পুরু স্তর বসাতে হবে এবং তা আবার বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এছাড়া ঘরের তাকে ও চৌকির নিচে আলু বিছিয়ে রাখা যায়। সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হয়। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পচা আলু দেখা মাত্র ফেলে দিতে হবে। আলু সুতলি পোকা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে বাছাই করে অনেক দূরে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

**হিমাগারে আলু সংরক্ষণ:** আলু মাঠের উষ্ণ তাপমাত্রা থেকে এনে সরাসরি হিমাগারে রাখা সমীচীন নয়। আলু উঠানোর পর পরিষ্কার করে ৭-১০ দিন শুকানোর পর মূল হিমকক্ষে না রেখে ২৪ ঘন্টা প্রি-কুলিং (Precooling) করতে হয়। হিমাগারের র‍্যাকে ৫-৬টি স্তর করে আলু রাখা হয়। আলু উঠিয়ে শুকানোর পর হিমাগারে ৭-১০ দিনের মধ্যে আলু বস্তায় ভরে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। হিমাগারে প্রথম ১৫-২০ দিন প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৫-১০ মিনিট করে হিমকক্ষগুলোতে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। এ কাজটি রাতের বেলায় করা উচিত। পরবর্তী ৩ মাসে ৫ দিন অন্তর ১ বার এবং অবশিষ্ট সময়ে ৭ দিন অন্তর ১ বার করে উপরোক্ত কাজটি করতে হয়। এছাড়া হিমাগারের আলু জুন মাসে ও আগস্ট মাসে বস্তাগুলোর স্থান পরিবর্তন করে নিচের র‍্যাকের আলু উপরে ও উপরের আলু নিচে রাখা হয়। হিমাগারে বীজ আলু খাবার আলুর চেয়েও নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় কারণ নিম্ন তাপমাত্রায় খাবার আলু মিষ্টি ভাবাপন্ন হয়ে যায়। হিমাগার থেকে বের করে আলু সরাসরি উষ্ণ তাপমাত্রায় না নিয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রায় (১৩°- ১৮°সে.) প্রি হিটিং (Preheating) চেম্বারে ২৫ ঘন্টা রাখতে হয়। এ ছাড়া আলু ভালো অবস্থায় রাখার জন্য গুদামঘরের মেঝে ও দেওয়ালসমূহে কপার সালফেটের ($CuSO_4$) দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

**সংরক্ষিত আলুর ক্ষতিকারক পোকামাকড়:** বাংলাদেশে বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে যে পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে তার নাম হচ্ছে আলুর সুতলি পোকা (Potato tuber worm)। এরা খাদ্য হিসেবে শুধু আলুই খেয়ে থাকে। সুতলী পোকার ক্রীড়া বা লার্ভা আলুর ভেতরে সুড়ঙ্গ করে খায় এবং এতে আলু নষ্ট হয়ে যায়। শুধু লার্ভা অবস্থাতেই এরা আলুর ক্ষতি করে থাকে। এ ছাড়া সুতলী পোকার তৈরি করা সুড়ঙ্গ দিয়ে

ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক আলুর ভিতর প্রবেশ করে আলুকে পচিয়ে দেয়। পূর্ণাঙ্গ সুতলী পোকা একটি মথ। এটি দেখতে অত্যন্ত ছোট। পাখা ছড়ানো অবস্থায় ১৫ মি.মি. চওড়া। এদের দেহের রঙ রুপালি বা হাল্কা গোলাপি বর্ণের। এদের পাখায় গাঢ় বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা ও কিনারায় সরু লোমের ঝালর যুক্ত। স্ত্রী মথ গুদামে রক্ষিত আলুর চোখে বা তার আশপাশে ডিম পাড়ে। এ ছাড়া এরা রক্ষিত আলুর বস্তায় ও ডিম পাড়ে।

**প্রতিকার**

- বাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ার একটি স্তর ( আলুর উপরে ০.৫ সে.মি.) দিয়ে দিতে হবে।
- আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলী পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।

## ৬.২ আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন খাবারের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

- আলুর রুটি বা চাপাতি
- আলুর তরকারি
- আলুর সালাদ
- আলুর ডাল বা স্যুপ
- আলুর চপ
- আলু ভাজা
- আলুর পিঠা
- আলুর মিষ্টান্ন
- আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই
- আলুর চিপস
- আলুর সিঙ্গাড়া
- আলুর আচার
- আলুর চটপটি
- আলুর সস্ ইত্যাদি।

### ৬.২.১ আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন ঝাল জাতীয় খাদ্য

আলু এমন এক খাদ্য যা বহুবিধ উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে হিমায়িত (Frozen) অবস্থায় বহুদিন রাখা যায়। প্রক্রিয়াজাতকৃত আলু সংরক্ষণ ও পরিবহণ খুবই সহজ। নিম্নে আলু হতে প্রক্রিয়াজাতকৃত কয়েকটি খাদ্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

চিত্র ৬.১: আলুর চিপস

**আলুর চিপস (Potato Chips):** আলু ছিলে পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আলু বঁটি বা ছুরি দিয়ে ১.৫ মিমি. পুরু গোল করে কেটে লবণ পনিতে (১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ লবণ) ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত সয়াবিন তেলে কাটা আলু ভেজে আলু চিপস তৈরি করা যায়। শুকনো চিপস বানাতে হলে লবণ পানি থেকে আলুর টুকরোগুলো পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার পাতলা কাপড় বা মশারির নেটের উপর রেখে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর বায়ুরোধী টিন বা পলিব্যাগে ভরে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। খাওয়ার সময় তেলে ভেজে লবণ ছিটিয়ে নিতে হবে।

২০২৩

**ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (French Fry):** আলুর প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের ব্যবহার সর্বাধিক। প্রথমে বড় ও লম্বা আলু ছিলে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। খোসা ছাড়ানো আলু ৫-১০ সেমি লম্বা ফালি করে কেটে নিয়ে লবণ, মরিচ বাটা ও গোল মরিচের গুঁড়া মাখিয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। অনেক সময় ফালি সোজা না করে খাঁজ কাটা অবস্থায় কাটা হয়। অতঃপর এ ফালিগুলো ফুটন্ত তেলে ডুবিয়ে ভাজা হয়। তেল ঝরিয়ে মাংস সহযোগে পরিবেশন করলে উপাদেয় হয়। ১০০ কেজি আলু থেকে ৫০-৭৫ কেজি ফ্রাই তৈরি হয়। হিমায়িত অবস্থায় এই ফ্রাই বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র ৬.২: আলুর ফ্রেঞ্চ

**আলু ভাজি:** আলু চিকন ফালি করে কেটে ধনে, হলুদ, জিরা, পেঁয়াজ ইত্যাদি মসলা সহযোগে তেলে ভেজে নিতে হয়। প্রথমে বাটা মসলাসহ আলু তেলে কষিয়ে পানি যোগ করতে হবে। পানির পরিমাণ এমন হবে যেন এটা শুকিয়ে আসার সাথে সাথে আলুও সিদ্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় আলুর সাথে শিম, বেগুন, করলা ইত্যাদি সবজি মিশানো হয়। আলু ভাজি আমাদের অতি প্রিয় খাদ্য, যা ভাত, রুটি ও পরোটার সাথে খাওয়া যায়।

**আলু ভর্তা:** সিদ্ধ আলু খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ডলে কাই করা হয়। এরপর এর সাথে কাঁচামরিচ বা শুকনো পোড়া মরিচ, পেঁয়াজ ও সরিষার তেল ভালো করে মিশিয়ে সুস্বাদু ভর্তা (Mashed potato) তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে ভর্তা শুধু ভাতের সাথে খাওয়া হয় কিন্তু এটা প্রধান খাদ্য এবং নাস্তা হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। মাখন, সিদ্ধ কাঁচা মরিচ, গাজরের কুচি ইত্যাদি দিয়ে ভর্তা তৈরি করা যেতে পারে। এতে স্বাদ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়। বিদেশে এরূপ ভর্তা প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয় এবং দোকানে হিমায়িত বা ফ্রোজেন (Frozen) অবস্থায় পাওয়া যায়।

**আলুর দম:** ছোট আলু সিদ্ধ করে মসলা সহযোগে তেলে কষাতে হবে। তারপর সামান্য পানি দিয়ে কিছুক্ষণ পর চুলা থেকে নামালে তা আলুর দম হয়। আলুর দম হলো এক ধরনের আলুর নিরামিষ তরকারি ছাড়া কিছুই নয়।

**আলুর চপ:** সিদ্ধ আলু ভালো করে ডলে কাই তৈরি করে তাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ লবণ, রসুন, কাঁচা মরিচের কুঁচি, ধনিয়া বা পুদিনা পাতা, গোল মরিচের গুঁড়া ইত্যাদি মিশিয়ে নেওয়া হয়। আলাদাভাবে মাংসের কিমা সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে তেলে ভেজে নেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট আকৃতির চপ তৈরি করে ভিতরে পুর হিসেবে ভাজা কিমা বা সিদ্ধ ডিমের টুকরা ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র ৬.৩: আলুর চপ

**আলুর রুটি ও পরোটা:** আটা এবং ময়দার সাথে সিদ্ধ আলুর কাই বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুটি ও পরোটা তৈরি করা যেতে পারে। আলুর পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগের বেশি হবে না, অন্যথায় কাই বা মিশ্রণের আঠালোভাব নষ্ট হয়ে রুটি তৈরি হবে না।

**আলু মাংস স্যুপ:** কোনো খাবারের প্রারম্ভে যে তরল বা পানীয় জাতীয় আইটেম খেতে দেয়া হয় তাই স্যুপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্যুপ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য দেয়া হয়। প্রথমে মাংস তেলে ভেজে বাদামি করতে হয়। তারপর পানি দিয়ে হাড় থেকে মাংস খুলে না আসা পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হয়। এরপর মাংসের পানি ছেঁকে

নিয়ে তাতে মাংস ভেঙ্গে মেশাতে হবে। আলুর টুকরা, গাজর, তেজপাতা, পেঁয়াজ, লবণ, টমেটো, মরিচ একসাথে আধা ঘণ্টা জ্বাল দিতে হবে। এরপর তৈরি স্যুপের সাথে ধনে পাতার কুচি দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করা যায়।

**আলুপুরি:** আলুপুরি তৈরিতে ময়দা, সিদ্ধ আলু, আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ ইত্যাদি দিতে হবে। প্রথমে আলু পরিমাণমত পানি, আদা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ দিয়ে মৃদু আঁচে সিদ্ধ করতে হবে। আলু সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে ভালোভাবে নেড়ে নামাতে হবে। মরিচ ভেজে গুঁড়া করতে হবে। পেঁয়াজ বেটে পেস্ট তৈরি করতে হবে। আলুর সঙ্গে গুঁড়া মরিচ, পেঁয়াজ পুদিনা পাতা ও লবণ মিশাতে হবে। আদার সঙ্গে ২ চামচ লবণ ও ৬ টেবিল চামচ তেল বা ডালডা দিয়ে মাখাতে হবে। আধা কাপ পানি দিয়ে ময়দা মাখাতে হবে। তবে খামির নরম করা যাবে না। ময়দা এবং আলু সমান ভাগ নিতে হবে। এক ভাগ গোল করে মাঝে আলু ভরে মুখ বন্ধ করতে হবে। পিঁড়িতে হালকা ময়দা ছিটিয়ে পুরির মুখ বন্ধ দিক নিচে রেখে বেলতে হয়। সাবধানে বেলতে হবে যেন আলু বের না হয়। আলুপুরি ডুবো তেলে কম আঁচে মচমচে করে ভাজতে হয়। সস, চাটনি বা আচার দিয়ে পরিবেশন করলে খেতে সুস্বাদু হয়।

চিত্র ৬.৪: আলু পুরি

### ৬.২.২ আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাদ্য

**আলুর হালুয়া ও বরফি:** সিদ্ধ আলু ভালো করে কাই তৈরি করে তার সাথে পরিমাণমত চিনি ও গরম মসলা মিশিয়ে ঘি কিংবা ডালডায় কষিয়ে নিয়ে হালুয়া তৈরি করতে হবে। কষাবার সময় সর্বক্ষণ নাড়তে হবে যাতে এটি পুড়ে পাত্রের গায়ে লেগে না যায়। একটি ট্রেতে ঘি মাখিয়ে তার উপর গরম হালুয়া ঢেলে সমান করে নিতে হবে। উপরে কিসমিস, বাদাম কুঁচি বসিয়ে দিতে হবে। এরপর নরম থাকতেই ছুরি দিয়ে কেটে বরফি তৈরি করতে হবে।

চিত্র ৬.৫: আলুর জিলাপি ও বরফি

**আলুর জিলাপি:** সমপরিমাণ সিদ্ধ আলু ও ময়দা নিতে হবে। আলু ছিলে ডলে কাই করে ময়দা, রঙ, পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ময়ান তৈরি করতে হবে। মিশ্রণ এমন হবে যাতে ঢেলে ফেলা যায় কিন্তু পানির মতো পড়ে ছড়িয়ে যাবে না। একটি পাত্রে চিনি জ্বাল দিয়ে সিরা তৈরি করা হয়। লোহার কড়াইতে সয়াবিন তেল বা ডালডা গরম করতে হয়। তেল গরম হলে ৩০×৩০ সে.মি. কাপড়ের মাঝখানে ছিদ্র করে ভিজিয়ে নিতে হয়। কাপড়ের ভিতর মিশ্রণ নিয়ে পুঁটলি তৈরি করে চাপ দিলে ছিদ্র দিয়ে মিশ্রণ নলাকারে বের হয়। এবার কড়াইয়ের উপর চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আড়াই প্যাঁচের জিলাপি বানাতে হয়। একটু শক্ত হলে উল্টিয়ে দিতে হয়। বাদামি রঙ ধারণ করলে ঝাঁঝরি হাতা দিয়ে তুলে সিরায় ডুবিয়ে দিতে হয়। মিনিটখানেক পর তুলে সিরা ঝরিয়ে ডিশে আলুর জিলাপি সাজিয়ে রাখতে হয়।

# ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

**জবের নাম: আলুর চিপস প্রস্তুতকরণ।**

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড**

১.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
১.২ আলুর চিপস তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
১.৩ আলুর চিপস তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
১.৪ আলুর চিপস তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
১.৫ চিপস তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
১.৬ তৈরিকৃত আলুর চিপস এয়ার টাইট পাত্র/পলিথিনে সংরক্ষণ করবে।
১.৭ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
১.৮ চেক লিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

**প্রয়োজনীয় টুলস**

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা
- পলিথিন
- চাকু
- ছিদ্রযুক্ত হাতা
- চালুনি
- ট্রে/কাগজের শীট
- কড়াই

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- সয়াবিন তেল ৩০০ গ্রাম
- লবণ ২-৩ গ্রাম
- আলু ৩০০ গ্রাম
- ভাজা মরিচ গুঁড়া ২ গ্রাম
- হলুদের গুঁড়া ১ গ্রাম
- জিরা গুঁড়া ২ গ্রাম
- লবঙ্গ ও দারুচিনি গুঁড়া পরিমাণমত
- প্রিজারভেটিভ
- পানি

চিত্র ৬.৬: আলুর স্লাইস ও চিপস

**প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট:** ওয়েট ব্যালেন্স

**কার্যপদ্ধতি**

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- ছুরি বা স্লাইসারের সাহায্যে ১-১.৫ মি.লি. পুরু করে আলুর চিপস কাটতে হবে এবং লবণ পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- স্লাইসগুলো চালুনি বা বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখে পানি ঝরাতে হবে। স্লাইসগুলো কিছুদিন সংরক্ষণ করতে হলে ব্লাঞ্চিং করে পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট (KMS) দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিতে হবে।
- কড়াইতে ডুবো তেল এ স্লাইসগুলো ছেড়ে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত হাতা দিয়ে না
- আলুর স্লাইসগুলো বাদামি হলে চিপসগুলো হাতার সাহায্যে তেল ঝরিয়ে ট্রে বা কাগজের শিটের উপর রাখতে হবে। ভাজার পরে ছবি
- চিপ্স ঠান্ডা হওয়ার পূর্বেই লবণের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হয়। যাতে চিপসের গায়ে লবণ বসে যায়।

**এই জবটি ছয় বার অনুশীলন করতে হবে** ।

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।

# জব নং-০২

## জবের নাম : আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরিকরণ।

### পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

১.১ স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ আলুর ফ্রেঞ্চ  ফ্রাই তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ আলুর ফ্রেঞ্চ  ফ্রাই তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ আলু ভালো করে পরিষ্কার করে ফালি করে কাটবে।

১.৫ আলুর ফ্রেঞ্চ  ফ্রাই তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

১.৬ ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসারে আলুর ফ্রেঞ্চ  ফ্রাই তৈরির করবে।

১.৭ আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

১.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৯ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

### প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

### প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা
- পলিথিন
- চাকু
- ছিদ্রযুক্ত হাতা
- চালুনি
- ট্রে/কাগজের শীট
- কড়াই

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

- সয়াবিন তেল ৩০০ মি.লি.
- লবণ ৫-৭ গ্রাম
- আলু ১ কেজি
- ভাজা মরিচ গুঁড়া ২ গ্রাম
- হলুদের গুঁড়া ১ গ্রাম
- জিরা গুঁড়া ২ গ্রাম
- লবঙ্গ ও দারুচিনি গুঁড়া পরিমাণমত
- প্রিজারভেটিভ
- পানি

চিত্র ৬.৭: আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

**প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট :** ওয়েট ব্যালেন্স

### কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- আলু ধুয়ে শুকিয়ে খোসা ছিলে নিতে হবে।
- ছুরির সাহায্যে ১ সে.মি. প্রস্ত ও ১ সে.মি. পুরু এবং যতটুকু সম্ভব লম্বা করে ফালি কাটতে হবে।
- ফালিগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে চালুনিতে উঠায়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- কর্তিত ফালিগুলোকে গরম পানিতে আধা সিদ্ধ করে শর্করার হার কমিয়ে তেলের শোষণতা ৬% এ নামিয়ে আনতে হবে।
- তারপর ফালিগুলো লবণ, গোলমরিচ ও লাল মরিচের গুঁড়ো ও সামান্য পানি দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে।
- তেল বা ঘি গরম করে তাতে ফালিগুলো ঢেলে দিয়ে ওলটপালট করে ৩-৫ মিনিট ভাজতে হবে।
- ভাজা হলে নামিয়ে গরম গরম সসের সাথে পরিবেশন করতে হবে।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে** ।

### সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।

## জব নং-০৩

### জবের নাম : মিষ্টি আলুর হালুয়া প্রস্তুতকরণ।

**পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড**

১.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ মিষ্টি আলু ছোট ছোট করে কেটে পরিমাণমত দুধ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।

১.৫ ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসারে মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির করবে।

১.৬ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৭ মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

**প্রয়োজনীয় পিপিই**

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

**প্রয়োজনীয় টুলস**

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা
- পলিথিন
- চাকু
- ছিদ্রযুক্ত হাতা
- চালুনি
- ট্রে/কাগজের শীট
- কড়াই

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

- দুধ ১ কাপ

- চিনি বা গুড় ১ কাপ
- মিষ্টি আলু ২ কাপ
- ঘি ১ কাপ
- গোলাপ জল ১ টেবিল চামচ
- পেস্তা বাদাম কুচি পরিমাণমত সাজানোর জন্য
- এলাচ গুঁড়া ১ চা চামচ
- দারুচিনি ছোট ২ টুকরা
- জাফরান ১ চিমটি
- লবণ স্বাদমত
- পানি

## প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- শিলপাটা/ব্লেন্ডার মেশিন
- হ্যান্ড/ডিজিটাল রিফ্রাক্টোমিটার

## কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো মিষ্টি আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- মিষ্টি আলু ধুয়ে পানি ঝেড়ে নিতে হবে এবং ছোট টুকরা করে কাটতে হবে।
- কাটা মিষ্টি আলু সসপ্যানে দুধ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ মিষ্টি আলু চটকিয়ে ম্যাশ করে নিতে হবে।
- কড়াইতে ঘি দিয়ে গরম করে এলাচ গুঁড়ো, দারচিনি দিয়ে মিষ্টি আলুর ম্যাশ দিয়ে নাড়তে হবে।
- মিষ্টি আলু ফুটতে শুরু করলে চিনি দিয়ে হালকা আঁচে নাড়তে হবে।
- পানি কমে আসলে জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে।
- এখন মাখা মাখা হয়ে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে পেস্তা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করব।

**এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে।**

**সতর্কতা**

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।
- চুলার তাপ ভালো করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

## অনুশীলনী-৬

### অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলু কোন ধরনের ফসল?
২. আলুর তৈরির দুইটি খাদ্যের নাম লেখ।
৩. আলুতে শর্করার পরিমাণ কত?
৪. ভাজা আলু দিয়ে কী কী খাবার তৈরি করা যায়?
৫. আলুর দম বলতে কী বুঝায়?
৬. ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বলতে কী বুঝায়?
৭. আলুতে আমিষের পরিমাণ কত?
৮. আলুতে শতকরা কত ভাগ পানি থাকে?

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলুর পরিচিতি বর্ণনা কর।
২. বারি আলু ১ ও ২ জাত দুটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
৩. বাংলাদেশে উৎপাদিত ৫টি আলুর জাতের নাম লেখ।
৪. দেশি জাতের আলুর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৫. আলুর সুতলী পোকা আক্রমণের ধরন বর্ণনা কর।
৬. প্রধান খাদ্য হিসেবে আলুর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৭. আলুর চিপস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কীভাবে তৈরি করা হয়?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশি আলু ও উচ্চ ফলনশীল আলুর বর্ণনা দাও।

২. আলুর পুষ্টিমান ও স্থানীয়ভাবে আলু সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. আলু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

৪. খাদ্য হিসেবে আলুর গুরুত্ব বর্ণনা কর?

৫. মিষ্টি আলুর হালুয়া প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।

# এগ্রোবেসড ফুড-১

# Agrobased Food-1

দ্বিতীয় পত্র

## দশম শ্রেণী

২০২৪

## প্রথম অধ্যায়

# গম ও ভুট্টার পরিচিতি, পুষ্টিমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

# Introduction to Wheat and Maize, Nutrition, Processing and Preservation

বাংলাদেশে চাষকৃত দানা ফসলসমূহের মধ্যে গম ও ভুট্টার চাষ খুবই সম্ভাবনাময়। গম ও ভুট্টা বিভিন্নভাবে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গম থেকে খাদ্য হিসেবে আমরা আটা, ময়দা ও সুজি পেয়ে থাকি। গমের ময়দা, আটা ও সুজি থেকে বিভিন্ন ধরনের বেকারি খাদ্য যেমন- পাউরুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বিশেষ জাতের ভুট্টার দানা শুকিয়ে পপকর্ণ হিসেবে ভেজে খাওয়া হয়। আবার ভুট্টার দানাকে মিলিং প্রক্রিয়ায় গুঁড়া করে ভুট্টার স্টার্চ বা ভুট্টার আটা তৈরি করা হয়। ভুট্টার পুষ্টিমান চাল ও গমের চেয়ে বেশি। ভুট্টা থেকে ছাতু, নাড়ু, শিশু খাদ্য, খৈ, পিঠা ইত্যাদি বহু ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়। ভুট্টার খৈ ও কর্নফ্লেইকস সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বেশ সমাদৃত। জনপ্রিয় কর্ণস্যুপ তৈরিতেও ভুট্টা ব্যবহার করা হয়। এ অধ্যায়ে গম ও ভুট্টার পরিচিতি, পুষ্টিমান এবং এদের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- গম ও ভুট্টা চিহ্নিত করতে পারব।
- গম ও ভুট্টার পুষ্টিমান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গম থেকে আটা, ময়দা ও সুজি তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- ময়দা থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য (ডোনাট, নিমকি, খাজা, কেক ইত্যাদি) তৈরি করতে পারব।
- ভুট্টার খৈ তৈরি করতে পারব।

## ১.১ গমের পরিচিতি

গম এক প্রকার ঘাস জাতীয় ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ। গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানা ফসল (Cereals)। এটি রবি মৌসুমের ফসল। বিশ্বে উৎপাদিত দানা ফসলের প্রায় অর্ধেকই গম। বাংলাদেশে উৎপাদিত দানা ফসলের ৬-৮% গম থেকে আসে। গম সমগ্র পৃথিবীতে শর্করার অন্যতম প্রধান উৎস।

চিত্র ১.১ গম গাছের বিভিন্ন অংশ

### ১.১.১ গমের জাত ও মৌসুম

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গমকে একটি সম্ভাবনাময় ফসল হিসেবে এর গবেষণা জোরদার করা হয়। বর্তমানে এদেশে অধিক আবাদকৃত গম জাতের মধ্যে কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী ও প্রতিভা রয়েছে। তাছাড়া সৌরভ (বারি গম-১৯) ও গৌরব (বারি গম-২০) নামে ২টি উচ্চ ফলনশীল নতুন গমের জাত অনুমোদিত হয়েছে।

**কাঞ্চনঃ** এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি। কুশির সংখ্যা ৬-৭টি। গাছের নিশান পাতা খাড়া। শীষ বের হতে ৬০-৬৮ দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৩৫-৪০টি দানা থাকে। দানা সাদা এবং হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম। অন্যান্য জাতের তুলনায় দানা আকারে বড়। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৬-১১২ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.৬ টন ফলন হয়। জাতটি দেশের সকল অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী। বর্তমানে সারা দেশে কাঞ্চন গম খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮০ ভাগ এলাকায় কাঞ্চন গমের আবাদ হচ্ছে।

**আকবরঃ** এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি। কুশির সংখ্যা ৬-৭টি। পাতা কিছুটা হেলানো। নিশান পাতা খুবই চওড়া ও লম্বা। শীষ বের হতে ৫০-৫৫ দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৫০-৫৫টি দানা থাকে। দানা সাদা, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন ৩৭-৪২ গ্রাম হয়। ফসল বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ১০৩-১০৮ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.৫ টন হয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলায় এ জাতের ফলন বেশি হয়। তবে আকবর জাতের গম দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও চাষের জন্য উপযোগী।

**অঘ্রাণীঃ** এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি, কুশির সংখ্যা ৫-৬টি। পাতা কিছুটা হেলানো, নিশান পাতা বড়। গাছের পাতা ও কাণ্ডে পাতলা মোমের আবরণের মতো বস্তু লক্ষ করা যায়। শীষ বের হতে ৫৫-৬০ দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৫০-৫৫টি দানা থাকে। দানার রং সাদা, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন

৩৮-৪২ গ্রাম হয়। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩ ১১০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.০ টন হয়। দেরীতে বপনের জন্য অঘ্রাণী জাতের গম বিশেষভাবে উপযোগী।

**প্রতিভাঃ** এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫-৯৫ সেমি। কুশির সংখ্যা ৬-৭টি। গাছের নিশান পাতা খাড়া। শীষ বের হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা ও প্রতি শীষে ৩৫-৪৫ টি দানা থাকে। দানা সাদা, আকারে বড় ও হাজার দানার ওজন ৪২-৪৮ গ্রাম। ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৪.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। প্রতিভা জাতের গমদেশের সকল অঞ্চলে চাষ করা যায়।

**সৌরভঃ** এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি। কুশির সংখ্যা ৫-৬টি। পাতা চওড়া, হেলানো ও গাঢ় সবুজ। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। নিশান পাতার নিচের তলে মোমের মতো পাতলা আবরণ থাকে। কাণ্ড মোটা ও শক্ত, ঝড় বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না। শীষ বের হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা, প্রতিটি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৮টি, দানার রং সাদা এবং হাজার দানার ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে আবাদ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৩.৫-৪.৫ টন পাওয়া যায়। সৌরভ গম দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।

**গৌরভঃ** এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯০-১০২ সেমি। কুশি ৫-৬টি। পাতা গাঢ় সবুজ। নিশান পাতা খাড়া, সরু ও ঈষৎ মোড়ানো। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা, অগ্রভাগ সরু। প্রতি শীষে ৪৫-৫০টি দানা থাকে। দানার রং সাদা এবং হাজার দানার ওজন ৪০-৪৮ গ্রাম। জীবনকাল ১০০-১০৮ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩.৬-৪.৮ টন ফলন পাওয়া যায়। এ জাতটি তাপ সহিষ্ণু তাই দেরিতে বপন করলে ভাল ফলন দেয়। বাংলাদেশে আবাদকৃত অন্যান্য জাতের তুলনায় এ জাতের গমে ১০-১২ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া যায়।

**গমের মৌসুম:** এ গম শীত মৌসুমের ফসল। আমাদের দেশে রবি মৌসুমে গম উৎপাদন করা হয়। গম চাষে সেচ কম লাগে। যে জমিতে সেচের সুবিধা নেই অথচ মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকে সে জমিতে বিনা সেচেও সফলভাবে এ গম চাষ করা যায়। গমের উৎপাদন খরচ কম এবং পোকা ও রোগের আক্রমণও কম। তাই আমাদের দেশে গম ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গমের আটা খাদ্য তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে।

## ১.১.২ গম দানার বিভিন্ন অংশ

গম মাড়াইয়ের পর সম্মুখ দিক থেকে লক্ষ করলে অতি সহজেই বীজের মাঝ বরাবর একটি খাঁজ বা দাগ দেখা যায়। গমের দানার বিভিন্ন অঙ্গসমূহ ছবিতে দেখানো হলো:

**গম দানার অঙ্গসমূহ:**

**ক. ব্রান (Bran) বা ভুসি :** গম বীজের দানা ঘিরে একটি পুরু আবরণ বা আস্তরণ থাকে

চিত্র ১.২ গম দানার বিভিন্ন অংশ

যাকে ছাল বা ভুসি বলে। এটার রং অনুযায়ী গমের আটা লাল বা সাদা রঙের হয়। এটি দানা বা ফলের আবরণের সাথে যুক্ত থাকে বলে একে পেরিকার্প বা বীজত্বক বলে। গমের ৭-৮ ভাগ হচ্ছে ব্রান বা ভুসি।

**খ. অ্যালিউরন (Aleurone) স্তর :** গম দানার ভ্রূণ (Embryo) এবং এন্ডোস্পার্ম (Endosperm) ঘিরে একটি পাতলা স্তর থাকে যাকে অ্যালিউরন স্তর বলে। এই স্তর গম ভাঙানোর সময় অপসারিত হয়ে ব্রান বা ভুসি সৃষ্টি করে। গমে অ্যালিউরন স্তর ও ভুসি মিলে মোট দানার ১৪% হয়।

**গ. এন্ডোস্পার্ম (Endosperm) বা সস্য :** গম দানার ভুসি, অ্যালিউরন স্তর ও ভ্রুন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশকে এন্ডোস্পার্ম বলে। এটি প্রধানত শ্বেতসার জাতীয় তবে এতে কিছুটা আমিষও আছে। এটি গম দানার প্রায় ৮৩%।

**ঘ. ভ্রূণ (Embryo/Germ):** গম দানার নিচের দিকে কোণায় সবচেয়ে পুষ্টিকর অংশকে ভ্রূণ বা অঙ্কুর বলে। এখানে গমের অধিকাংশ প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ থাকে। এছাড়া কিছু পরিমাণ শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থও এখানে পাওয়া যায়। এই ভ্রূণ থেকেই গমের চারা সৃষ্টি হয়। এন্ডোস্পার্ম ও ভ্রূণকে একত্রে অন্তবীজ বা কার্নেল (Kernel) বলে ।

## ১.১.৩ গমের পুষ্টিমাণ

**গমের পুষ্টিমাণ:** সকল প্রকার দানা শস্যের মধ্যে গমে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। যদি গমের উপরের লাল আবরণসহ ভাঙানো হয় তখন তা লালচে বাদামী রঙের হয় বলে একে বাদামী আটা বলে। আর যখন গমের খোসা ফেলে দিয়ে ভাঙানো হয় তখন আটা অপেক্ষাকৃত সাদা রঙের হয় যাকে ময়দা (Refined wheat flour) বলা হয়। আটা এবং ময়দার মধ্যে একটি প্রাথমিক পার্থক্য হলো আটা আস্ত গম (Whole wheat) থেকে তৈরি করা হয় আর ময়দা খোসা ফেলে দিয়ে শুধু ভিতরের সাদা অংশ (Refined wheat) থেকে তৈরি করা হয়। তাই আটা সাধারণত ময়দা থেকে কিছুটা লালচে রঙের হয়। আটাতে থাকা আঁশ, পুষ্টি উপাদান, ফাইটোকেমিক্যালস ইত্যাদি দেহে ইনসুলিনের কার্যকারিতা উন্নত করে এবং গ্লুকোজ শোষণের মাত্রা বাড়ায়। ময়দার তুলনায় আটা বেশি ভিটামিন এবং মিনারেলস সমৃদ্ধ। আস্ত গমের আটা বা লাল আটা ফোলেট, রিবোফ্লাভিন এবং ভিটামিন বি ১, বি ৩, বি ৫ সহ কতিপয় ভিটামিন ধারণ করে থাকে। কিন্তু Refined Wheat Flour বা ময়দা পরিশোধনের সময় এ সকল ভিটামিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাদামী আটার ফাইটোকেমিক্যালস এবং মিনারেলস (যেমন: ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম, কপার) আমাদের দেহকে ক্যান্সার হতে সুরক্ষা দেয় যা ময়দাতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গমে গ্লুটেন (Gluten) নামক যে আমিষ থাকে তা পানির প্রভাবে আটাকে এক ধরনের নরম, আঠালো ও স্থিতিস্থাপক খামিরে পরিণত করে ফলে সহজেই রুটি, পাউরুটি, কেক ইত্যাদি বানানো যায়। নিচের সারণিতে গমের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ দেখানো হলো।

**সারণি ১.১: গমে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান**

| ক্রমিক নং | উপাদানের নাম | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|
| ১। | শর্করা | ৬৩-৬৭ |
| ২। | জলীয় অংশ | ১৪ |

২০২৫

| | | |
|---|---|---|
| ৩। | আমিষ | ৯-১৪ |
| ৪। | চর্বি | ২-২.৫ |
| ৫। | আঁশ | ২ |
| ৬। | খনিজ লবণ | ১.৫ |

## ১.১.৪ গম সংরক্ষণ

মাড়াইকৃত বীজ পর পর ২-৩ বার রোদে শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজের আর্দ্রতা ১২% এর নিচে থাকে। এ আর্দ্রতা দাঁতে চিবিয়ে পরীক্ষা করা যায়। যদি বীজ চিবানোর সময় কট করে শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। পুষ্ট বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ১.৭৫-২.৫০ মি.মি. ছিদ্র বিশিষ্ট চালনিতে বাছাই করে নিতে হবে। সঠিকভাবে গমবীজ সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে। গম সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো পাত্র হলো ড্রাম, টিনের পাত্র, পলিথিন ব্যাগ ও মাটির কলস বা মটকা। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো-

**ক. টিনের পাত্র :** কেরোসিন বা বিস্কুটের টিনে গমবীজ সংরক্ষণ করা সবচেয়ে উত্তম। টিন অবশ্যই ছিদ্রমুক্ত হতে হবে। পাত্রটি নিশ্চিতভাবে ছিদ্রমুক্ত করার জন্য পাত্রের বাহিরে বা সম্ভব হলে ভিতরে আলকাতরা বা যেকোনো রঙের প্রলেপ দেওয়া ভালো।

চিত্র ১.৩ টিনের পাত্র

গমবীজ পাত্রে ভরে ঢাকনাটি শক্তভাবে আটকাতে হবে। ঢাকনার চারপাশে মোম বা পলিথিন দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বাতাস পাত্রের ভিতরে না যায়। এতে বীজের আর্দ্রতা ঠিক থাকে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় না। টিন সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচায় রাখা উত্তম।

**খ. মাটির কলসি বা মটকা :** মাটির কলসি বা মটকার বাইরে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। আলকাতরার প্রলেপ দিলে মাটির পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বাইরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বীজের আর্দ্রতা ঠিক থাকে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় না। বীজ ভর্তি করে পাত্রের মুখ পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে রাখতে হবে বা কাদামাটি দিয়ে ঢাকনা আটকিয়ে রাখতে হবে। মাটির পাত্রে গরম বীজ ১২ ঘন্টা সময় ধরে ঠান্ডা করে রাখতে হবে। যাতে পাত্রের ভিতরে খালি না থাকে, সেজন্য শুকনা ছাই পাত্রের নিচে ও বীজের উপর দিয়ে ভর্তি করে পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে রাখতে হবে।

চিত্র ১.৪ মাটির কলস বা মটকা

সংরক্ষিত গমবীজ পাত্র মেঝেতে না রেখে মাচার উপর রাখতে হবে, যাতে পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। মাটির সংস্পর্শে আসলে পাত্রের তলার মাটি থেকে রস নিয়ে বীজের আর্দ্রতা বেড়ে যেতে পারে। বাহিরের পোকা থেকে রক্ষার জন্য সংরক্ষিত পাত্রের চারদিক পরিষ্কার রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় পোকার আক্রমণ দমন করার জন্য ফসটক্সিন ট্যাবলেট বা ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ন্যাপথালিন ব্যবহার করা গম খাওয়া যাবে না।

**গ. ঢাকনাযুক্ত বড় ড্রাম :** বেশি পরিমাণে গম সংরক্ষণের জন্য ঢাকনাযুক্ত পরিষ্কার ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। গম ড্রামে ভর্তির পুর্বে ড্রামের মাঝখানে ১২-১৫ সে.মি. ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত টিনের পাত্র বা ধাতব পাইপ ঢুকাতে হবে। এরপর এ পাইপের চারপাশ দিয়ে ড্রামের মধ্যে গম ভর্তি করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পাইপের ভিতর যেন গম প্রবেশ করতে না পারে। গম ভর্তি করার পর পাইপের উপরের মাথা খোলা থাকবে এবং গমের উপরিতলের কিছুটা উপরে পাইপের মাথা থাকবে। প্রতি ১০ কেজি গমের জন্য ৩০০ গ্রাম শুকনা পাথর চুন একটি কৌটায় ভরে পাইপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে । কৌটাটি এমন আকারের হবে, যাতে চুন কৌটার তিন ভাগের দুই ভাগ ভর্তি হয়। চুনের পাত্র ছিদ্রযুক্ত পাইপের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়ে ড্রামের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। ঢাকনাটি ভালোভাবে এঁটে দিয়ে ঘরের মধ্যে শুকনা, ঠান্ডা এবং উঁচু স্থানে রাখতে হবে। এভাবে রাখা গম প্রায় ১ বছর ভালো থাকে।

চিত্র ১.৫ ঢাকনাযুক্ত বড় ড্রাম

**ঘ. পলিথিন ও চটের বস্তা :** ছিদ্রমুক্ত মোটা (১২ মিমি পুরু) পলিথিন ব্যাগে গমবীজ ভরে চটের ব্যাগের মুখ সেলাই করে দিতে হবে। পলিব্যাগ পাতলা হলে ২-৩টি ব্যাগ একত্র করে রাখা যায়। এ বস্তাগুলো বড় বড় গুদাম ঘরে কাঠের বা বাঁশের তৈরী 'ডানেজ'-এর উপরে স্তুপাকারে সাজিয়ে রাখা যাবে। ডানেজ হলো কাঠের বা বাঁশের তৈরী এক ধরনের পাটাতন যা মেঝে থেকে মাত্র ১০-১৫ সেমি উঁচু হয় এভাবে সংরক্ষণ করা গম ১ বছর ভালো থাকে। তবে পলিথিনের মধ্যে প্রতি ১০০ কেজি গমের জন্য আগাম শুকনো পাথুরে চুন ব্যবহার করা যায়। পাথুরে চুন চোষ কাগজের প্যাকে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১.৬ পলিথিন ও চটের বস্তা

## ১.১.৫ গোলাজাত গম শস্যের ক্ষতিকারক পোকামাকড়

গুদামজাত শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে কীটপতঙ্গ, ইঁদুর এবং ক্ষুদ্র পোকামাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। এইসব আপদ বা বালাইয়ের আক্রমণে পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহের প্রায় ১০% নষ্ট হয়ে থাকে।

নিম্নে গোলাজাত গম ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের নাম ও ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হলো-

- ধানের শুঁড় পোকা বা রাইস উইভিল
- কেড়ি পোকা বা লেসার গ্রেইন বোরার
- লাল শুসরী পোকা বা রেড গ্রেইন বিটল
- খাপড়া বিটল
- ধানের সুরুই পোকা বা রাইস মথ
- শুসরী পোকা বা স টুথড গ্রেইন বিটল
- কাডেল পোকা বা কাডেল বিটল

উপরোক্ত ০৭টি পোকা গুদামজাত ফসলে বেশি আক্রমণ করে থাকে। এর মধ্যে প্রথম ০৫টি পোকার পরিচিতি, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন পদ্ধতি ১ম পত্রের ৩য় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী ০২টি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

- **শুসরী পোকা বা স-টুথড গ্রেইন বিটল :** এই পোকা আর্দ্র শস্য বিশেষ করে চাল ও গমের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। গুদামজাত গমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার ক্ষতি করে। এই পোকায় আক্রান্ত গমের স্বাদ নষ্ট হয় এবং বিক্রির অযোগ্য হয়ে পড়ে। ভালোভাবে প্যাকেট করা দ্রব্যও এদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। শরীর চ্যাপ্টা বলে এরা অতি সহজেই গমের বস্তা এবং প্যাকেটের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।

চিত্র ১.৭ শুসরী পোকা

- **ক্যাডেল পোকা বা ক্যাডেল বিটল :** এরা গম দানা ও আটা খেয়ে নষ্ট করে। আটার মিলে আটা খায় এবং পূর্ণাঙ্গ পোকা অন্য পোকা মেরে খেয়ে ফেলে। এছাড়া এরা মোড়কজাত খাদ্যের প্যাকেট বা কার্টুন নষ্ট করে ফেলে।

চিত্র ১.৮ ক্যাডেল পোকা

## ১.১.৬ গম ভাঙানোর পদ্ধতি

**গম ভাঙানো বা মিলিং:** গম দানা হতে যান্ত্রিক উপায়ে আটা বা ময়দা করার পদ্ধতিকে মিলিং বলে।মিলিং এর পর আমরা গম থেকে আটা , ময়দা ও সুজি পেয়ে থাকি। গম মিলিং করার সময় যে ভুসি পাওয়া যায় তাতে গমের বহি:স্তর ও অ্যালিউরন স্তর ছেটে যায়। এমনকি গমের অঙ্কুরও বাদ পড়ে যায়।

**ময়দা তৈরির পদ্ধতিঃ** গম ভাঙানোর কাজ প্রধানত তিন পর্যায়ে হয়ে থাকে। যথা-

ক. গম পরিষ্কারকরণ

খ. গম কন্ডিশনিং

গ. গম মিলিং

**ক. গম পরিষ্কারকরণ :** মাঠ থেকে গম সংগ্রহের পর গমের সাথে বিভিন্ন প্রকার শস্যদানা, ধুলোবালি, খড়কুটো, কীটপতঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মলমূত্র ইত্যাদি মিশে থাকে। এগুলো অপসারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চালনি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যেগুলো গমের দানার চেয়ে ছোট সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ ধরনের চালনিসহ অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করা হয়।

**খ. গম কন্ডিশনিং :** গম থেকে ময়দা তৈরি করতে চাইলে গমের ত্বক বা ভুসি ছাটতে হয়। সেক্ষেত্রে গমকে কন্ডিশনিং করে নরম করে ছাটার উপযোগী করে নিতে হয়। গম পরিষ্কার করার পর তাতে কিছু পানি মিশ্রিত করে ১২-২৪ ঘন্টা একটি বড় পাত্রের মধ্যে রেখে দিতে হয়। অথবা পানি মিশ্রিত গমকে কন্ডিশনার নামক যন্ত্রে ৪৯°সে. তাপমাত্রায় আধা ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা রাখার পর ভাঙানোর জন্য ক্রাশিং রোলে পাঠানো হয়। এ সময় গম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি শোষণ করে ফলে গমের খোসা নরম হয় এবং সহজে তা অপসারণ করা যায়।

**গ. গম মিলিং :** মিলিং করে গম থেকে ময়দা পেতে নিম্নের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন-

- **ব্রেকিং :** রোলার মিলে ভিজানো গম ভাঙানো হয়। এই যন্ত্রে দুইটি রাবার রোলার থাকে যাতে দুই ধরনের ঘূর্ণন গতি থাকে। এর ফলে গমগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এরপর চালনি দিয়ে চেলে বড় আকৃতির টুকরোগুলো পুনরায় হপার দিয়ে যন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে ভাঙানো হয়।
- **চালা ও ছাল ঝাড়া :** ক্রাশিং রোলার দ্বারা গমের ত্বক বা ছাল আলাদা করার সময় কিছু গমের এন্ডোস্পার্ম বা সস্য সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়ে ময়দা হয়ে যায়। এগুলো সূক্ষ্ম চালনি দিয়ে চেলে আলাদা করা হয়।
- **সূক্ষ্ম গুঁড়াকরণ :** গম মিলিং যন্ত্রে ৮-১০ জোড়া রোলার থাকে এগুলোকে রিডাকশন রোলার বলে। ভাঙা গমকে পর্যায়ক্রমে কয়েকবার মসৃণ রোলার দ্বারা ভেঙে সুক্ষ্ম বা মিহি গুঁড়ায় পরিণত করা হয়।
- **পিউরিফিকেশন :** বড় বড় মিলে রিডাকশন রোলার ব্যবহারের ফলে গমের কণা বেশি সূক্ষ্ম হয়ে ময়দায় পরিণত হয়। এ সূক্ষ্ম কণাকে বায়ু প্রবাহের দ্বারা ভ্যাকুয়াম স্থানে উঠিয়ে দেওয়া হয়। কণার আকার ও ওজনের ভিত্তিতে উড়ন্ত অবস্থা থেকে ময়দার কণা পৃথক করা হয়। এই পৃথক করার পদ্ধতিতে পিউরিফিকেশন বলে।

নিম্নে গম থেকে ময়দা তৈরির ফ্লো-চার্ট দেয়া হলো-

গম → ব্রেকিং → চালা ও ছাল ঝাড়া → সূক্ষ্ম গুঁড়াকরণ → পিউরিফিকেশন → ময়দা

## ১.১.৭ গম থেকে আটা, ময়দা ও সুজি প্রস্তুতকরণ

**আটা :** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গম মিলে ভাঙালে যে গুঁড়ি পাওয়া যায় তাই আটা। গমের প্রায় সমস্ত পুষ্টি উপাদান আটায় বর্তমান থাকে। আটাতে চাল অপেক্ষা বেশি আমিষ, প্রচুর ভিটামিন বি, ম্যাঙ্গানিজ লবণ পাওয়া যায়। গমের বহিঃস্তর বা খোসার ফাইটিক এসিড আটাতেও থাকে। ফাইটিক এসিড স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য আটা চালনি দিয়ে চেলে ভুসি বাদ দিয়ে খাওয়া উচিত।

**ময়দা :** গমের ভুসি বা ব্রান ছেঁটে ফেলে শুধু দানার ভেতরের শ্বেতসার অংশ মিলে ভাঙালে যে গুঁড়ি পাওয়া যায় তাই ময়দা। উন্নতমানের গম থেকে ৭০-৭২% ময়দা পাওয়া যায়। ময়দা পানিতে মেশালে ময়দায় অবস্থিত গ্লুটেন নামক আমিষ এক প্রকার আঠালো পিণ্ড বা খামিরে পরিণত হয়। এজন্য ময়দা পানিতে মিশিয়ে সহজেই রুটি বা লুচি তৈরি করা হয়। ময়দায় গ্লুটেন কম হলে বিস্কুট বা কেক তৈরির উপযোগী হয়। কিন্তু পাউরুটি বা রুটি তৈরির উপযোগী হয় না।

**সুজি :** উন্নতমানের ভালো পরিষ্কার গম মেশিনে ভাঙায়ে সুজি তৈরি করা হয়। মেশিনে গম ভাঙায়ে সুবিন্যস্ত করে শোধন করার পর যে মধ্যম মানের বস্তু পাওয়া যায় তাই সুজি। সুজির রং হালকা ঘিয়ের মত সাদা এবং এতে বিশেষ ধরনেরস্বাদ ও গন্ধ বিদ্যমান।

নিম্নের ছকে আটা ও ময়দার পার্থক্য এবং পরবর্তী ছকে আটা, ময়দা ও সুজির উপাদান দেখানো হলো —

**সারণি ১.২: আটা ও ময়দার পার্থক্য**

| ক্র নং | আটা | ময়দা |
|---|---|---|
| ১ | প্রতি কেজি গম থেকে আটার পরিমাণ বেশি হয়। | ময়দার পরিমাণ কম হয়। |
| ২ | আটা দেখতে আঁশযুক্ত ও নিম্নমানের। | ময়দা দেখতে সুন্দর ও উন্নতমানের। |
| ৩ | রান্না হতে বেশি সময় লাগে। | দ্রুত রান্না করা যায়। |
| ৪ | দামে সস্তা। | দাম বেশি। |
| ৫ | দানার ফাইটিক এসিড অপসারিত না হওয়ায় হজমে অসুবিধা হতে পারে। | ফাইটিক এসিড অপসারিত হওয়ায় দ্রুত শোষিত হয়। |
| ৬ | স্বাস্থ্যসম্মত। | ততটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। |

**সারণি ১.৩: আটা, ময়দা ও সুজির খাদ্য উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)**

| ক্রমিক নং | খাদ্য উপাদান | আটা | ময়দা | সুজি |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ৬৯.৪ | ৭৩.৯ | ৭৪.৮ |
| ২ | আমিষ (গ্রাম) | ১২.১ | ১১.০ | ১০.৪ |
| ৩ | চর্বি (গ্রাম) | ১.৭ | ০.৯ | ০.৮ |
| ৪ | ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম) | ৪৮ | ২৩ | ১৬ |
| ৫ | লৌহ (মি. গ্রাম) | ১১.৫ | ২.৫ | ১.৬ |
| ৬ | ফসফরাস (মি. গ্রাম) | ৩৫৫ | ১২১ | ১০২ |
| ৭ | থায়ামিন (মি. গ্রাম) | ০.৪৯ | ০.১২ | ০.১১ |
| ৮ | রাইবোফ্লাবিন (মি. গ্রাম) | ০.১৭ | ০.১৭ | ০.০৩ |
| ৯ | থায়াসিন (মি. গ্রাম) | ৪.৩ | ২.৪ | ১.৬ |
| ১০ | শক্তি (কিলোক্যালরি) | ৩৪১ | ৩৪৮ | ৩৪৮ |

## ১.১.৮ গম থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য

গম থেকে আমরা আটা, ময়দা ও সুজি খাদ্য হিসেবে পেয়ে থাকি। বিভিন্ন প্রকার গম পৃথিবীতে উৎপন্ন হলেও গমকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- শক্ত গম ও নরম গম। শক্ত গমে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রোটিন থাকে এবং উত্তম ধরনের ময়দা উৎপন্ন হয় যা থেকে স্থিতিস্থাপক খামির পাওয়া যায়। অপর পক্ষে নরম গমে প্রোটিন কম থাকে এবং ময়দা হয় দুর্বল প্রকৃতির এবং এ ময়দা কেক তৈরির জন্য ভালো।

আটা, ময়দা ও সুজি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার খাবারের একটি ছক নিম্নে দেওয়া হলো-

**সারণি ১.৪: গম (আটা, ময়দা ও সুজি) থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য**

| আটা থেকে খাদ্য | ময়দা থেকে খাদ্য | | | সুজি থেকে খাদ্য |
|---|---|---|---|---|
| স্যাঁকা রুটি | নোনতা খাবার | মিষ্টি খাবার | বেকারি | |
| তন্দুর রুটি | লুচি | খাজা, গজা | বিস্কুট, কুকিজ | সুজির রুটি |
| পুরি | পরোটা | মুরালি | কেক | সুজির হালুয়া |
| ডালপুরি | মোগলাই | বালুশাহী/বালুসাই | পাউরুটি | সুজির বরফি |
| আটার হালুয়া | বাখর খানি | ডোনাট | নান খাতাই | নেশেস্তার হালুয়া |
| | সিঙাড়া, সমুচা | সেমাই, লাচ্ছা সেমাই | পিৎজা | সুজির পায়েস |
| | নুডলস | | বার্গার | |
| | নিমকপারা/নিমকি | | রোল | |
| | পাস্তা | | পেটিস | |
| | | | চিকেন বন | |

## ১.১.৯ সেমাই ও নুডলস তৈরি

**সেমাই :** মিষ্টান্নের মধ্যে সেমাইয়ের নাম প্রথমে আসে। শক্ত ও অর্ধশক্ত গম থেকে প্রাপ্ত ময়দা বা সুজি দিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। এক্সট্রুডার (Extruder) মেশিন দিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। কাঁচা সেমাই শুকানোর জন্য ওভেন বা ড্রায়ারের প্রয়োজন হয়। সেমাই তৈরিতে ময়দা, লবণ, তেল, প্রিজারভেটিভ, ও স্টার্চ সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড প্রয়োজন হয়। পানি ও তেলের সাথে ময়দা, প্রিজারভেটিভ, লবণ, হাইড্রোজ ইত্যাদি মিশিয়ে উচ্চ চাপে দ্রুত এক্সট্রুডিং করতে হয়। তারপর ওভেনে শুকিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। সেমাই প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়।

চিত্র ১.৯ লাচ্ছা সেমাই

**লাচ্ছা সেমাই :** ময়দা, ঘি, লবণ, অ্যারারুট সহযোগে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ হাতে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করা হয়। ময়দায় পানি মিশিয়ে ভালোভাবে মেখে খামির তৈরি করা হয়। উক্ত খামির থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করা হয়। অতঃপর এ বলগুলোকে ছিদ্র করে রিং আকৃতি করা হয়। রিং এর ফাঁকে ফাঁকে ঘি ও অ্যারারুট মিশাতে হয়। ছোট রিং টেনে বড় রিং করা হয় আর বার বার ঘি ও অ্যারারুট মিশাতে হয়। এ প্রক্রিয়া কয়েকবার করতে হয়। তারপর প্রতিটি রিং

ছিঁড়ে ছোট ছোট ৭-৮টি বল তৈরি করা হয়। ঘি ও অ্যারারুট মেশানোর ফলে উক্ত বলে অসংখ্য সুতার ন্যায় স্তর সৃষ্টি হয়। উক্ত বল বা গুটিকে হাতে চেপে চ্যাপ্টা করে বেলনে গোল করে বেলে ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ভাজা হয়। তেল ঝরিয়ে লাচ্ছা সেমাই টুকরিতে তোলা হয়। অতঃপর বাজারজাত করা হয়।

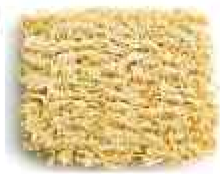

চিত্র ১.১০ নুডলস

**নুডলস :** নুডলস হচ্ছে ময়দা দিয়ে তৈরি সরু, লম্বা শলাকা আকৃতির খাদ্যদ্রব্য। তবে সেমাই থেকে মোটা। নুডলস সোজা বা প্যাঁচানো থাকে। এটি দেশীয় খাবার না হলেও বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। এটি ভাত ও রুটির বিকল্প হিসেবে খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে।

**প্রস্তুত প্রণালি :** উপকরণ হিসাবে ৩০০ গ্রাম ময়দা, ১ টেবিল চামচ লবণ ও ১৫০ মি.লি. পানি লাগে।

- কড়াইতে পানি গরম করে লবণ মিশাতে হয়। বড় গামলায় ময়দা রেখে লবণ পানি যোগ করতে হয়। হাত দিয়ে মিশিয়ে গোলাকার করে ময়দার খামির করতে হয়। রুটি বেলা পিঁড়ির উপর ময়দার খামির (Dough) নিয়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দলা করে নিতে হয়।
- মাখা ময়দার দলা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে ভরে কমপক্ষে ৩০ মিনিট রেখে দিতে হয়। তারপর পিঁড়ির উপর অল্প ময়দা ছিটিয়ে তার উপর ময়দার দলা গড়িয়ে নিতে হয়।
- এবার বেলন দিয়ে বেলে মোটামুটি ৩ মিলিমিটার পুরু একটি রুটি বানাতে হয়। তারপর অল্প ময়দা ছিটিয়ে রুটিটি কয়েক ভাঁজ করে চওড়ায় ৬-৭ সে.মি. করতে হয়। তার উপর ময়দা দিতে হয়। আবার রুটিটা বেলে প্রায় ৩ মিলি মি. পুরু রুটি বানাতে হয়। ৩ মিলি মি. পুরু রুটিটাকে লম্বালম্বি করে কেটে স্তর গুলো আলাদা করতে হয়। নিশ্চিত হতে হবে যেন কাটা অংশে হালকা ময়দার আবরণ থাকে।
- বড় একটি সসপ্যানে পানি ফুটিয়ে নুডলসগুলোকে ৮-১০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। পানি ফেলে দিয়ে নুডলস ধুয়ে আবারও পানি ফেলে দিতে হয়। এভাবে দেশীয় পদ্ধতিতে নুডলস তৈরি করা হয়। তবে আমরা যে প্যাকেটজাত নুডলস বাজারে পেয়ে থাকি তা অত্যাধুনিক মেশিনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

## ১.১.১০ আটা থেকে রুটি, তন্দুর রুটি তৈরি

চিত্র ১.১১ স্যাঁকা রুটি

- **স্যাঁকা রুটি :** আটা চালনি দিয়ে চেলে তাতে লবণ, পানি পরিমাণমত দিয়ে ভালো করে ডলে (Kneading) কাই বা খামির তৈরি করতে হয়। খামির কেটে ছোট ছোট কয়েকটি রুটির বল তৈরি করে নিয়ে পিঁড়িতে বেলন দিয়ে বেলতে হয়। রুটি বেলার সময় পিঁড়িতে একটু আটা ছিটিয়ে নিতে হয়। অন্যথায় রুটি বেলতে অসুবিধা হয়। আটাতে পানি দেওয়ার পর আটার গ্লুটেন স্থিতিস্থাপক ও আঠালো হয়। বেলনে বেলার সময় আটার বলের আকার বৃদ্ধি পায় এবং পাতলা হয়ে গোলাকার হয়।

তারপর স্যাঁকা হয়। মাঝারি আঁচের চুলায় রুটি খুন্তি দ্বারা উল্টেপাল্টে বাদামি রং ধারণ করা পর্যন্ত স্যাঁকা হয়। নরম পাতলা কাপড় কয়েক প্রস্থ ভাজ করে তার উপর স্যাঁকা রুটি রেখে ঐ কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়। ১ কেজি আটা থেকে প্রায় ১৫-১৬টি রুটি তৈরি হয়। বর্তমানে আটার রুটি মেশিনে তৈরি ও স্যাঁকা হয়।

চিত্র ১.১২ তন্দুর রুটি

- **তন্দুর রুটি :** বিশেষ ধরনের চুলা 'তন্দুরে' এই রুটি স্যাঁকা হয় বলে একে তন্দুর রুটি বলে। এ চুলা মাটির তৈরি। রুটি বানাবার ৩ ঘন্টা পুর্বে আটার সাথে কিছু বেকিং পাউডার মিশিয়ে খামির তৈরি করে রেখে দেওয়া হয়। পরে একেকটি রুটির পরিমাণ খামির নিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করা হয়। বলগুলো রুটি বানানোর বেলনে বেলে রুটির আকার দেওয়া হয়। এই কাঁচা রুটি কাপড়ের পুঁটুলির উপর রেখে তা চুলার উত্তপ্ত দেয়ালে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। চুলার আগুনের প্রচন্ড উত্তাপে স্যাঁকার ফলে ফোলা ফোলা তন্দুর রুটিতে পরিণত হয়। তন্দুর রুটি স্যাঁকা রুটির চেয়ে দ্বিগুণ মোটা হয়। অতঃপর দুটি লোহার লম্বা শলাকার সাহায্যে চুলার দেয়াল থেকে ভাজা তন্দুর রুটি তুলে আনতে হয়। সবজি, মাংসের ঝোল ও বুটের ডাল দিয়ে এ রুটি খেতে ভালো লাগে।

চিত্র ১.১৩ পুরি

- **পুরি :** পুরি তৈরির জন্য আটার খামির থেকে ছোট ছোট লেচি বা বল নিতে হয়। তারপর তার মধ্যে গর্ত করে মিষ্টি বা ঝাল জাতীয় কোন খাবারের অংশ (পুর) ভরে মুখটা আটকায়ে দেওয়া হয়। এই বল বেলনে বেলে রুটির ন্যায় তৈরি করে ডুবো তেলে ভাজা হয়।

- **ডালপুরি :** ছোলার ডাল সিদ্ধ করে বিভিন্ন মসলা দিয়ে ভেজে আলাদা পুর তৈরি করতে হয়। পুর আটার বলে ঢুকিয়ে পুরির মতো রুটি তৈরি করে ডুবো তেলে ভাজলে ডালপুরি তৈরি হয় ।

## ১.১.১১ ময়দা থেকে লুচি, পরোটা, সিঙাড়া, সমুচা, নিমকপারা তৈরি

চিত্র ১.১৪ লুচি

**লুচি :** ময়দা ও লবণ পরিমাণমত নিয়ে এর সাথে পানি ও ঘি মিশিয়ে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হয়। খামির তৈরি হলে ছোট ছোট রুটির বল তৈরি করতে হয়। তারপর পিড়িতে ঘি মাখিয়ে রুটির বল বেলে ছোট ছোট পাতলা রুটির মতো বানাতে হয়। কড়াইতে ঘি বা তেল গরম করে রুটিগুলো ডুবো তেলে এপিঠ ওপিঠ উল্টিয়ে ভেজে তুলতে হয়। পাত্রে ভাজা লুচি একটির উপর আরেকটি রেখে তেল ঝরিয়ে নিতে হবে।

**পরোটা:** পরিমাণমত  ময়দা, লবণ ও পানি দিয়ে ভালো করে মিশাতে হয়। প্রতি কেজি ময়দায় ৭৫ গ্রাম হিসেবে তেল দিয়ে উক্ত খামির ময়ান দিতে হয়। অতঃপর ছোট ছোট বল করে পিড়িতে বেলতে হয়। রুটিতে ঘি দিয়ে তিন ভাজ করে পুনরায় বেলতে হয়। বেলন দিয়ে বেলে চার কোণা/গোলাকার আকৃতিতে তৈরি করে তাওয়ায় ঘি গরম করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে তুললে পরোটা তৈরি হয়।

চিত্র ১.১৫ পরোটা

**সিঙাড়া:** আলুর টুকরা, নারিকেল কুচি, মটর ডাল, ফুলকপির টুকরা, চিনাবাদাম ইত্যাদির সাথে লবণ, মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়াসহ অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ঘিয়ে ভেজে সিঙাড়ার পুর তৈরি করা হয়। এ পুরে মাছ, মাংসের কিমা, কলিজা, পনির ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে। তারপর রুটির খামির তৈরি করে ডিমের আকারের ন্যায় রুটি বেলে মাঝ বরাবর কাটা হয়। কর্তিত অংশ হাতে নিয়ে পানের খিলির মতো ভাজ দিয়ে তার মধ্যে পুর ভরে দিতে হয়। সামান্য পানি দিয়ে সিঙাড়ার খোলা মুখ জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চোখা মুখ উপরে রেখে থালায় সাজিয়ে রাখতে হয়। কড়াইয়ে তেল গরম করে হালকা আঁচে ১৫-২০ মিনিট ভাজতে হয়। হালকা বাদামি ও মচমচে হলে চুলা থেকে নামিয়ে সসসহ খাওয়া যায়।

চিত্র ১.১৬ সিঙাড়া

**নিমকপারা:** ময়দায় বেকিং পাউডার ও ঘি বা ডালডা মিশিয়ে ময়ান দিতে হয়। তারপর পরিমাণমত  লবণ, পানি মিশিয়ে ময়দার খামির তৈরি করতে হয়। ময়দায় কালিজিরা মিশিয়ে রুটির জন্য বল তৈরি করতে হয়। পিঁড়িতে ময়দা ছিটিয়ে রুটি বেলতে হয়। ছুরি দিয়ে রুটি ছোট ছোট বরফি আকারে কাটতে হয়। ডুবো তেলে উক্ত বরফি হালকা আঁচে অনেকক্ষণ ভাজতে হয়।

চিত্র ১.১৭ নিমকপারা

**সমুচা:** আদা, রসুন, মরিচ, গোলমরিচ, এলাচি বেটে নিতে হয়। মাংস কিমা করে বাটা মসলা, তেজপাতা, লবণ, তেল পানি দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে রান্না করতে হয়। মাংসে কারি পাউডার দেওয়া যেতে পারে। পানি শুকালে পেঁয়াজ, ধনে পাতা, কাঁচা মরিচ দিয়ে ভেজে নামাতে হয়। ময়দা, পানি ও লবণ মিশিয়ে ময়ান দিতে হয়। ময়দার খামির তৈরি হয়ে গেলে রুটির জন্য ছোট ছোট বল করে নিতে হয়। একটি রুটির উপর তেল দিয়ে তার উপর আর একটি রুটি নিয়ে আবার তেল লাগাতে হয়। এভাবে ৩-৫টি রুটির পাতলা স্তর করে বেলে বড় করতে

চিত্র ১.১৮ সমুচা

হয়। তাওয়া গরম হলে বড় রুটিগুলো একসাথে গরম করে নামিয়ে সাবধানে আলাদা করতে হয়। রুটি যেন বেশি ভাজা না হয়। সব নামিয়ে রুটি আলাদা করার পর ছুরি দিয়ে ২০×৮ সে.মি. সাইজ করে কাটতে হয়। সামান্য ময়দা পানির মধ্যে গুলিয়ে লেই তৈরি করে রাখতে হয়। এক টুকরা কাটা রুটি ত্রিভুজ আকারে তিন ভাঁজ করে তার মধ্যে কিমার পুর দিতে হয়। অতঃপর সমুচা ডুবো তেলে ভেজে সস বা চাটনিসহ পরিবেশন করতে হয়।

## ১.১.১২ ময়দা থেকে মিষ্টি খাদ্য

চিত্র ১.১৯ গজা

**গজা:** ময়দা, তেল, লবণ, চিনি ও গুঁড়ো দুধ দিয়ে শক্ত খামির বানাতে হয়। ১৫ মিনিট ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এবার ওই খামির দিয়ে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি পুরু রুটি বেলতে হয় এবং ওই মাপে চিকন করে লম্বা গজার মতো কেটে নিতে হয়। তেল হালকা গরম করে ওই তেলে গজাগুলো ছেড়ে মাঝারি আঁচে বাদামি না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হয়। এরপর তেল থেকে তুলে টিস্যুতে ছড়িয়ে দিতে হয়। ১ কাপ চিনি ও আধা কাপ পানি চুলায় দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হয়। এরপর তাতে গজাগুলো দিয়ে আবার নাড়তে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত গজাগুলো ঝরঝরা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে হয়।

চিত্র ১.২০ খাজা

**খাজা:** এক কেজি ময়দায় ২৫০ গ্রাম ঘি দিয়ে ভালো করে মেখে খামির তৈরি করতে হয়। খামির থেকে ছোট ছোট গোলাকৃতির গুটি বা লেচি কেটে ৫-৮ সে.মি. চওড়া ও ১৫-১৮ সে.মি. লম্বা করে রুটি বেলে নিতে হয়। তারপর রুটিতে ঘি এর প্রলেপ দিয়ে দুইভাজ করে তার উপর ঘি ছড়িয়ে ময়দার ঠুঙ্গির মতো করতে হয়। ঠুঙ্গিটা পিঁড়ির উপর রেখে হাত দিয়ে চ্যাপ্টা করতে হয়। আবার দুই ভাজ করে ঘি মিশাতে হয়। এ রকম কয়েকবার কুণ্ডলী পাকানো ও ঘি মিশাতে হয়। শেষে লুচির মতো ভেজে পাত্রে তুলে রাখতে হয়।

**মুরালি:** ময়দা, লবণ, খাবার সোডা ও পানি ভালো করে মিশিয়ে খামির বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। তারপর বেলন বা পিঁড়ির সাহায্যে রুটি তৈরি করতে হয়। ছুরি দিয়ে উক্ত রুটি থেকে ১×৮ সে.মি. আকৃতির টুকরা করতে হয়। কড়াইতে তেল গরম করে হালকা আঁচে ভেজে তুলতে হয়। চিনি, রং ও পরিমাণমত পানি দিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। সিরা আঁশ আঁশ হলে ভাজা মুরালি দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হয়। চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে মুরালি খাওয়া ও বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়। গ্রামে ও গঞ্জের মেলায় এ মুরালি বেশি পাওয়া যায়।

চিত্র ১.২১ মুরালি

**ডোনাট :** মুরগির ডিমে সামান্য দুধ, চিনি ও ঘি দিয়ে ফেটানো হয়। ময়দার সাথে বেকিং পাউডার ও ফেটানো ডিম এক সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে ময়ান করে মন্ড বা খামির তৈরি করতে হয়। পিঁড়িতে সামান্য শুকনা ময়দা দিয়ে তাতে আধা সেমি. পুরু করে রুটি বেলে নিতে হয়। ডোনাট কাটার দিয়ে রুটি কেটে তা ডুবোতেলে ভেজে নিলেই ডোনাট তৈরি হয়ে যাবে। যে কোনো বিস্কুট কাটার নকশা দিয়েও ডোনাট কাটা যায়।

চিত্র ১.২২ ডোনাট

**জিলাপি :** জিলাপি তৈরির জন্য ময়দা ঘন করে গুলিয়ে শীতের দিনে দুই দিন এবং গরমের দিনে একদিন ঢেকে রাখতে পারলে ভালো হয়। এছাড়া ময়দা ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জিলাপি তৈরি করা হয়। চিনি পানিতে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ফোটাতে হয়। ময়লা ভেসে উঠলে ছেঁকে নিতে হয়। তারপর গোলাপ জল বা কেওড়া জল মিশিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। ভিজা ময়দার উপর ২/১টি বুদবুদ উঠলে জিলাপি তৈরির উপযোগী হয়। ময়দার উপরের জমানো পানি ফেলে দিয়ে সামান্য জাফরান রং মিশিয়ে ময়দা ও পানি ভালো করে ঘুঁটে বা নেড়ে (Stirring) ঘন গোলা তৈরি করতে হয়। চারকোণা মোটা কাপড়ের এক টুকরার মাঝে ছিদ্র করে ভিজিয়ে ভাজতে হয়। তারপর ভিজা কাপড়ে ময়দার গোলা নিয়ে পুঁটলির আকার করতে হয়। কড়াইতে তেল বা ঘি গরম করে ময়দার গোলার পুঁটলি কড়াইয়ের উপর ধরতে হয়। গোলা চাপ দিয়ে প্রথমে গোল করে এক প্যাঁচ, দ্বিতীয়বার এক প্যাঁচ এবং তৃতীয়বার অর্ধেক প্যাঁচ করে গোলা গরম তেলে দিতে হয়। এভাবে আড়াই প্যাঁচের জিলাপি পরপর লম্বা করে তৈরি করতে হয়। অল্প আঁচে বাদামি বর্ণের না হওয়া পর্যন্ত উল্টেপাল্টে দিয়ে ডুবো তেলে ভাজা হয়। ভাজার পর চিনির সিরায় ৮-১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে সিরা ঝরিয়ে প্লেটে তুলতে হয়। জিলাপি গরম গরম খেতে বেশ সুস্বাদু লাগে।

চিত্র ১.২৩ জিলাপি

## ১.১.১৩ সুজি থেকে নেশেস্তার হালুয়া, বরফি ও পায়েস তৈরি

**সুজি থেকে খাদ্য :** সুজি থেকে উৎপাদিত সাধারণ খাদ্যগুলো হচ্ছে সুজির রুটি, হালুয়া, বরফি, পায়েস ও নেশেস্তার হালুয়া ইত্যাদি।

- **সুজির রুটি:** পরিমাণমত সুজি, লবণ ও পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে একটি মন্ড বা দলা পাকিয়ে নিতে হয়। মন্ডটা ফুটন্ত গরম পানিতে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। সিদ্ধ মন্ড ভালো করে ময়দা ছানার মতো ছেনে খামির তৈরি করা হয়। অতঃপর খামির পিঁড়ি ও বেলন দ্বারা রুটি তৈরি করে ভেজে নিতে হয়।

চিত্র ১.২৪ সুজির রুটি

**সুজির হালুয়া:** একটি পাত্রে ২ কাপ চিনি এবং ঘন দুধ ১ কাপ নিয়ে এক সঙ্গে জ্বাল দিতে হয়। অন্য কড়াইতে আধা কাপ ঘি এক কাপ সুজি দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে হয়। এরপর দুধ ও চিনির মিশ্রণ যোগ করে নাড়তে হয়। ১৫-২০টি কিশমিশ, পরিমাণমত বাদাম ও আধা চা চামচ এলাচ গুঁড়া দিতে হয়। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করতে হয়। শক্ত হলে কেটে পরিবেশন করতে হয়।

চিত্র ১.২৫ সুজির হালুয়া

**সুজির পায়েস:** কড়াইতে সুজি বাদামি করে ভেজে নিতে হয়। অন্য পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হয়। এর সাথে চিনি দিয়ে আরো ঘন করতে হয়। তারপর সুজি দিয়ে অল্প জ্বাল দিতে হয়। বেশি সময় জ্বাল দেওয়া যাবে না। নামাবার সময় কিশমিশ ও এলাচ দিয়ে পায়েস পরিবেশন করতে হয়।

চিত্র ১.২৬ সুজির পায়েস

**নেশেস্তার হালুয়া:** ১৫০ গ্রাম সুজি ৬-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ধীরে ধীরে সুজি থেকে ঘোলা ঘোলা পানি বা মাড় বা শর্করা বের হতে থাকে। পাতলা কাপড় দিয়ে একটি পাত্রে দ্রবণ ছেঁকে নিতে হয়। এই দ্রবণের সাথে ২৫০ গ্রাম চিনি মেশাতে হয়। অন্য পাত্রে ১০০ গ্রাম ঘি নিয়ে তাতে ঐ শর্করা দ্রবণ ঢেলে দিতে হয়। সামান্য ফুড কালার দেওয়া হলে হালুয়া দেখতে আকর্ষণীয় হয়। জ্বাল দেওয়া শুরু হলে ৮-১০ মিনিটের মধ্যে মিশ্রণটি থকথকে হয়ে ওঠে। বাকি সব উপকরণ যেমন- কিশমিশ, পেস্তা বাদাম কুঁচি, এলাচ গুঁড়া, গোলাপজল পরিমাণমতো দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। ঘন হয়ে এলে ঘি মাখানো ট্রেতে ঢেলে ঠান্ডা করে নিতে হয়। ঠান্ডা হলে পছন্দমতো টুকরা করে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হয়। জেলির মতো দেখতে এই হালুয়া খুবই সুস্বাদু ও আকর্ষণীয়।

চিত্র ১.২৭ নেশেস্তার হালুয়া

## ১.১.১৪ ময়দা থেকে বেকারি খাদ্য তৈরি

**বিস্কুট তৈরি:** আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের বিস্কুট তৈরি হচ্ছে। কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে রপ্তানিযোগ্য বিস্কুটও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু মফস্বল শহর ও গ্রামে ইট ও মাটি নির্মিত চুল্লিতেই বিস্কুট তৈরি হয়ে থাকে। বিস্কুট তৈরির অনেক ফর্মুলা আছে। নিম্নে বিস্কুট তৈরির একটি সাধারণ পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো-

চিত্র ১.২৮ বিস্কুট

**উপকরণ :**

| ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ | ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | গমের ময়দা | ৩২০ গ্রাম | ০৬ | ডিম | ২টা |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০২ | চিনি (পাউডার) | ১৫০ গ্রাম | ০৭ | খাবার লবণ | ২ গ্রাম |
| ০৩ | দুধ (পাউডার) | ৫ গ্রাম | ০৮ | বেকিং পাউডার | ৩ গ্রাম |
| ০৪ | অথবা তরল দুধ | ১৫ মি.লি | ০৯ | ভ্যানিলা | ০.৫ মিলি |
| ০৫ | ঘি | ১০ গ্রাম | ১০ | অরেঞ্জ অয়েল | ২.৫ মিলি |

চিত্র ১.২৯ বিস্কুট কাটার

**প্রস্তুতপ্রণালি :** একটি পাত্রে ময়দা, লবণ, দুধ ও বেকিং পাউডার মিশানো হয়। মিশানোর পর চালনিতে ছাঁকা যেতে পারে। ভ্যানিলা, অরেঞ্জ অয়েল, ডিম ও ঘি দুই মিনিট ধরে উত্তমভাবে মেশানো হয়। আগের তৈরি শুষ্ক মিশ্রণ এতে আস্তে আস্তে যোগ করা হয়। প্রায় ৩ মিনিট ধরে মেশানোর কাজ চলে। খামির বা ডো তৈরি হলে তা ১৫ মিনিট রেখে দেওয়া হয় তারপর এমনভাবে ঘূর্ণায়মান যন্ত্র (বেলন) দ্বারা চাপ প্রয়োগ করা হয় যাতে ৩ মি.মি. পুরু হয়। তারপর বিস্কুট কাটার দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাটা হয়। অয়েল পেপার (Baking paper) বিছানো বা তৈলাক্ত ট্রেতে বিস্কুটগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয়। বিস্কুটের উপরিভাগে ডিম বা দুধ বা চর্বি দ্বারা হালকা প্রলেপ দেওয়া হয় এবং ১০ মিনিট এভাবে রেখে দেওয়া হয়। চুল্লিতে ২০৪°সে.ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হালকা বাদামি বর্ণনা হওয়া পর্যন্ত ১০ মিনিট তাপ দেওয়া হয়। তারপর কক্ষ তাপমাত্রায় বিস্কুট ঠান্ডা করা হয়। পলিথিন কাগজের মোড়ক বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে বিস্কুট সিল করা হয়। চুল্লির পরিবর্তে ঘরোয়া ওভেনেও বিস্কুট তৈরি করা যায়।

**কেক তৈরি :** কেক তৈরির উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

| ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ | ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ময়দা | ৩০০ গ্রাম | ০৬ | ডিম | ৩-৪ টি |
| ০২ | চিনি (পাউডার) | ২৫০ গ্রাম | ০৭ | খাবার লবণ | ৩ গ্রাম |
| ০৩ | দুধ (পাউডার) | ৪০ গ্রাম | ০৮ | বেকিং পাউডার | ৮-১০ গ্রাম |
| ০৪ | তরল দুধ | ১০০ মি.লি | ০৯ | ভ্যানিলা | ০.৫ মি.লি |
| ০৫ | বাটার | ২০০ গ্রাম | | | |

চিত্র ১.৩০ কেক

**প্রস্তুত প্রণালি:** একটি পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার ও লবণ মেশানো হয়। বাটার বা মাখনের সাথে ভ্যানিলা যোগ করে ভালোভাবে মিশানো হয়। এর সাথে আস্তে আস্তে চিনি যোগ করে এমনভাবে নেড়ে মেশানো হয় যাতে সম্পূর্ণ চিনি গলে যায় এবং মিশ্রণ অনেকটা হালকা হয়ে যায়। দুধ ও ডিম উপরোক্ত মিশ্রণে যোগ করে এমনভাবে নেড়ে মেশানো হয় যাতে মিশ্রণটি আরও হালকা বা তরল হয়। প্রথম ধাপে তৈরিকৃত শুষ্ক মিশ্রণ তরল মিশ্রণে ধীরে ধীরে যোগ করে ভালোভাবে মিশানো হয়। কেকের ফর্মা বা ছাঁচের ভিতরের অংশ অয়েল পেপার (Baking paper) দ্বারা মোড়ানো হয়। এরপর পরিমাণমত মিশ্রণ ছাঁচে ঢেলে নিয়ে ১৬০°সে.

তাপমাত্রায় ৪০-৪৫ মিনিট ধরে ওভেনে তাপ দেওয়া হয়। কেক তৈরি হলে কক্ষ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা হয়। তারপর প্যারাফিন কাগজের মোড়কে রাখা হয়।

**পাউরুটি তৈরি :** পাউরুটি আমাদের দেশের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা পর্যন্ত সর্বত্র পাউরুটি একটি জনপ্রিয় খাদ্য। পাউরুটি তৈরির কৌশল সহজ ও নিরাপদ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে ঝামেলামুক্ত। বর্তমানে দেশে পাউরুটি তৈরির অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি এসেছে এবং প্যাকেজিং এর গুণগতমানের উন্নতি ঘটেছে। পাউরুটি তৈরির প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে (১) ময়দা (২) পানি (৩) ইস্ট (৪) লবণ এবং ঐচ্ছিক উপাদানগুলো হলো - চিনি, চর্বি/তেল, মল্ট. ময়দা, গুঁড়া দুধ, জারক পদার্থ (পটাশিয়াম ব্রোমেট), মিনারেল ইস্ট ফিড, ওয়াটার কন্ডিশনার, মোল্ড ও জীবাণু প্রতিষেধক (সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট) ইত্যাদি।

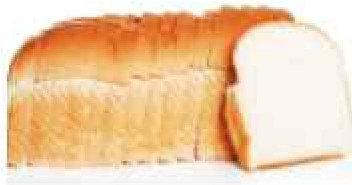

চিত্র ১.৩১ পাউরুটি

পাউরুটি তৈরির উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| ময়দা | ১ কেজি |
| পানি | পরিমাণমতো |
| ইস্ট | ২০ - ৫০ গ্রাম |
| লবণ | ১০ গ্রাম |
| চিনি | ২০ – ৮০ গ্রাম |
| গুঁড়া দুধ | ২০ গ্রাম |
| বা তরল দুধ | ১০০ গ্রাম |
| ডিম | ১২ টি |
| সয়াবিন তেল | ২০ গ্রাম |
| পটাশিয়াম ব্রোমেট বা পটাশিয়াম আয়োডেট | ১ গ্রাম |
| সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট | ১ গ্রাম |
| অ্যাসিটিক অ্যাসিড | ৫ সিসি – ১০ সিসি |

**প্রস্তুত প্রণালি:**

- **চালনিতে ছ্যাঁকা:** ময়দা থেকে অপদ্রব্য পরিষ্কার ও ঝরঝরে করে ময়দায় বাতাস প্রবেশ করানো হয়।
- **ওজন দেওয়া:** সব উপাদানসমূহ (প্রধান ও ঐচ্ছিক) পরিমাণমত মেপে নেয়া হয়।
- **মেশানো:** একটি মিক্সিং মেশিনে বা পাত্রে সবগুলো উপাদান ভালোভাবে মেশানো হয়। মিশ্রণটি বেশি শক্ত হবে না, আবার বেশি পাতলাও হবে না। মেশানোর অনুমোদিত সময় হচ্ছে ৩ মিনিট।

২০২৩

**গাঁজন (Fermentation):** মিশ্রণ বা খামির ফারমেন্টেশন চেম্বারে ২৬-২৭°সে. তাপমাত্রায় ২ ঘন্টা রাখা হয়। এ সময় খামিরের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। যেমন- চিনির সাথে ইস্ট ক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন যা ময়দার পরতে পরতে জমা হয়। ফলে খামিরের আয়তন বেড়ে যায়।

**গ্যাস দূরীভূতকরণ (Knock back):** ফুলে ওঠা খামিরের উপর বাহির থেকে চাপ প্রয়োগ (হাত দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে) করা হয় যাতে খামির থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দূরীভূত হয়। চাপ প্রয়োগ করতে হয় কয়েকবার ।

**মধ্যবর্তীকালীন প্রুফ:** নক ব্যাকের পর প্রায় ২৫ মিনিট কাল এমনি রেখে দিতে হয়।

**মোল্ডিং:** আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চাপ প্রয়োগ করে বের করা হয় এবং পাকানো হয়। অনেক সময় প্রেসার বোর্ডের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত করা হয়। তারপর মোল্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাখা হয়।

চিত্র ১.৩২ পাউরুটি প্রুফিং

**চূড়ান্ত প্রুফ:** মোল্ডে ভর্তি করার পর ৩২°সে. তাপমাত্রায় এবং ৮০% আর্দ্রতায় প্রায় ৫৫ মিনিট রাখা হয়। এ সময় খামিরের অভ্যন্তরে গ্যাস উৎপন্ন হয়ে রুটির আয়তন বাড়ে। তাছাড়া ময়দার গ্লুটেন নরম ও কোমল হওয়ার কারণে রুটির সর্বত্র গ্যাস ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। রুটির ভেতরের গঠন সুন্দর ও নরম তুলার মত (Spongy) হয়। তবে এটা ময়দার শক্তি, জারণ দ্রব্যের প্রকৃতি এবং কন্ডিশনারের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে।

**বেকিং (Baking) :** বেকিং সাধারণত বৈদ্যুতিক ওভেনে করা হয়। চুল্লিতে ২৪৫°সে. তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট রাখা হয়। এসময় রুটির উপরিভাগ বা ক্রাস্ট (Crust) এর রং সোনালি হলে রুটি তৈরি সম্পন্ন হয়। বেকিং এর সময় ওভেনের মধ্যে একটি পাত্রে পানি রেখে স্টিম বা বাষ্প তৈরি করা হয়। এতে রুটির উপরিভাগ উজ্জল হয়, ফাটার সম্ভাবনা থাকে না।

**ঠান্ডা করা (Cooling) :** কক্ষ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয় বলে জলীয় কণা ঘনীভূত হতে পারে না। ফলে রুটি সহজে স্টেলিং (Staling) বা নষ্ট হয় না।

**টুকরা বা ফালিকরণ :** ছুরি দিয়ে ছোট ছোট স্লাইস করা হয়।

**প্যাকেজিং :** পলিথিন ব্যাগের মোড়কে ভর্তি করে সিল করা হয়।

### ১.১.১৫ ময়দা থেকে ফাষ্টফুড তৈরি

চিত্র ১.৩৩ স্যান্ডউইচ

**স্যান্ডউইচ তৈরি :** বর্তমানে এ খাদ্য অতি মুখরোচক ও অতি সহজেই পুষ্টিকরভাবে তৈরি করা যায়। সাধারণত পাউরুটি বা রুটির ভিতর রান্না করা ডিম, মাছ, মাংস, সবজি, পনির, আচার, মাখন, মেয়নেজ, সালাদ ইত্যাদি ড্রেসিং দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি

করা হয়। পাউরুটি ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে তার মধ্যে পছন্দনীয় পুর দিতে হয়। পুরে আকর্ষণীয় রঙের সবজি ও বিভিন্ন স্বাদের খাবার থাকলে ভালো হয়। স্যান্ডউইচ টিস্যু কাগজে বা পলিথিনে মুড়ে ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। পাউরুটির প্রতি স্লাইসে মাখন বা মেয়নেজ লাগিয়ে, এবং লাগানো পিঠে পুর দিয়ে অন্য একটি স্লাইসে মাখন বা মেয়নেজ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এভাবে ২-৩টি স্যান্ডউইচ তৈরি করে একটার উপর আরেকটা স্যান্ডউইচ রেখে ছুরি দিয়ে পাউরুটি স্লাইসগুলোর চতুর্দিক থেকে পোড়া ও শক্ত অংশ কেটে ফেলতে হয়। তারপর প্রতিটি স্যান্ডউইচ কোনাকুনি কেটে ত্রিকোণাকৃতি আকারে পেপারে মুড়ে পরিবেশন করা হয়।

**টোস্ট:** টোস্ট তৈরি করতে পাউরুটির স্লাইসগুলো আগুনে সেঁকে মচমচে হয়ে এলে তা নামিয়ে নিতে হয়। তারপর স্লাইসগুলোর উপর যে পোড়া দাগ পড়ে তা ফেলে দিতে হয়। দুইখানা স্লাইস পাশাপাশি ঘষলেও ময়লা গুঁড়াগুলো পড়ে যেতে পারে। গরম পাউরুটির স্লাইসের উপর মাখনের প্রলেপ দিয়ে তার উপর চিনি বা গোল মরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে টোস্ট তৈরি করতে হয়।

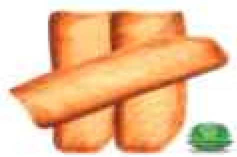

চিত্র ১.৩৪ টোস্ট

**ফ্রেঞ্চ টোস্ট:** ডিম ভেঙে ভালো করে ফেটিয়ে তার সাথে পেঁয়াজ বাটা, লবণ ও মরিচের গুঁড়া মিশাতে হয়। তারপর এ মিশ্রণের মধ্যে পাউরুটির স্লাইস ডুবিয়ে নিয়ে কড়াইয়ে তেল গরম করে এপিঠ ওপিঠ লাল করে ভেজে নিতে হয়। এভাবে ফ্রেঞ্চ টোস্ট তৈরি করে নাস্তা হিসেবে খাওয়া যায়। একে বোম্বে টোস্টও বলে।

চিত্র ১.৩৫ ফ্রেঞ্চ টোস্ট

**পিৎজা:** এটি ময়দার রুটি, মাংস ও অন্যান্য মসলা সহযোগে তৈরি আকর্ষণীয় একটি ফাস্টফুড। ময়দা, ইস্ট, লবণ ও তেল দিয়ে ভালো করে খামির তৈরি করতে হয়। পুরু করে রুটি তৈরি করে পিৎজা তৈরির পাত্রে ভরতে হয়। টমেটো সিদ্ধ, পনির স্লাইস, তেলে ভাজা পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, টমেটো সস ও প্রয়োজনীয় মসলা পাতলা ও চ্যাপ্টা মতো পুরু করে রুটির মাঝে ও চারদিকে বসাতে হয়। তারপর তা ২০৪°সে. তাপমাত্রায় ওভেনে ২০-৩০ মিনিট ধরে গরম (Baking) করে মজাদার পিৎজা তৈরি করা যায়।

চিত্র ১.৩৬ পিৎজা

**ভেজিটেবল রোল:** আলু, ফুলকপি টুকরা করে, চীনাবাদাম, লবণ, মরিচ, গরম মসলার গুঁড়া ইত্যাদি মিশিয়ে অল্প পানি দিয়ে ঘিয়ে ভেজে পুর তৈরি করতে হয়। পেস্তাবাদাম, গাজর, মটরশুঁটি, বরবটি ইত্যাদিও উক্ত পুরে দেয়া যায়। ময়দায় তেল দিয়ে পরিমাণমতো লবণ ও পানি মিশিয়ে ময়ান করা হয়।

চিত্র ১.৩৭ ভেজিটেবল রোল

খামির তৈরি হলে রুটি করার জন্য ছোট ছোট বল তৈরি করা হয়। পিড়িতে যতদূর সম্ভব পাতলা করে বেলে রুটি তৈরি করা হয়। অত:পর রুটির মাঝে সবজির পুর দিয়ে রুটি মুড়ে রোল করা হয়। রোলের দুই মাথা মুড়ে দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলতে হয় ।

## ১.২ ভুট্টার পরিচিতি

ভূট্রা একটি অধিক ফলনশীল দানা শস্য। এটি একটি একবর্ষজীবী, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। একই গাছে পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল জন্মে । পুরুষ ফুলে একটি মঞ্জুরী বিন্যস্ত আকারে গাছের মাথায় বের হয়। একে টাসেল (Tassel) বলে। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি অবস্থানে কাণ্ড ও পাতার অক্ষ থেকে বের হয়। স্ত্রী ফুল পরাগায়িত হয়ে ফল মঞ্জুরী বা মোচায় পরিণত হয়। মোচার ভিতরে দানা সৃষ্টি হয়। ভূট্রা একটি বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য উচ্চ ফলনশীল ফসল। ভূট্রা খাদ্যশস্য, পশু খাদ্য, জ্বালানী ও শিল্পজাত দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভুট্টা বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, চিনাবাদাম, আলু এবং আলু জাতীয় ফসলের সাথেও আবাদ করা যায়। ভূট্রা কিছুটা খরাসহিষ্ণু ফসল। এতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়ে থাকে।

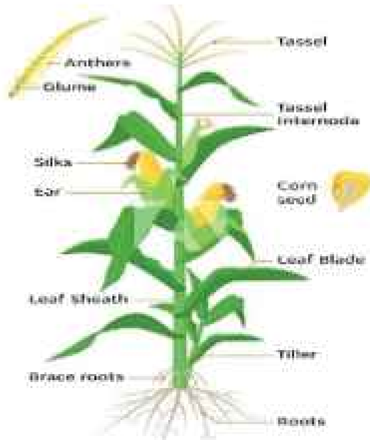


চিত্র ১.৩৮ ভুট্টা গাছের বিভিন্ন অংশ

### ১.২.১ ভুট্টার জাত ও চাষের মৌসুম

**ভুট্টার জাত:** ভুট্টার জাত সংগ্রহ ও বাছাইকরণের মাধ্যমে বিএআরআই আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাতে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন জাতের ভুট্টা চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

**বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ :** এটি আমিষ সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত । এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন ও খরিফ মৌসুমে ৯৫-১০৫ দিন। জাতটির দানা উজ্জ্বল আকর্ষণীয় কমলা রঙের এবং হাজার দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি ফলন রবি মৌসুমে ৯-১০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৭-৭.৫ টন।

**বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭:** এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৩৫-১৪১ দিন ও খরিফ মৌসুমে ৯৫-১০০ দিন। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের এবং হাজার দানার ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম।

**বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯:** এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫০ দিন ও খরিফ মৌসুমে ১০৫-১১০ দিন। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের এবং হাজার দানার ওজন ৩৭০-৩৭৫ গ্রাম।

**বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২:** এই জাতটি স্বল্প সেচে উৎপাদনক্ষম এবং মধ্যম মাত্রার খরা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল সাদা দানা বিশিষ্ট। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন।

**বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩:** ভুট্টার এই জাতটি স্বল্প সেচে উৎপাদনক্ষম এবং মধ্যম মাত্রার খরা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল সাদা দানা বিশিষ্ট। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫২ দিন। মোচা পরিপক্ব হওয়ার

পরও জাতটির গাছ ও পাতা সবুজ থাকে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী।

**বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪ :** এই জাতটি খরিফ মৌসুমে ফুল আসার পর্যায়ে অধিক তাপ সহিষ্ণু এবং মধ্যম ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১১৫ দিন। জাতটি দানা সাদা বর্ণের।

**বারি মিষ্টি ভুট্টা-১ :** মিষ্টি ভুট্টা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয়। তাই দানা যখন নরম থাকে তখনই মোচা সংগ্রহ করতে হয়। সিল্ক বের হবার ২০-২৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ বপনের মাত্র ১১৫-১২০ দিনে খাওয়ার উপযোগী মোচা সংগ্রহ করা যায়। এর হলুদ দানা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ।

**ভুট্টার মৌসুম :** ভুট্টা রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের ৩য় সপ্তাহ অর্থাৎ নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত ভুট্টা বীজ বপন করা হয়। খরিফ মৌসুমে ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ভুট্টা বীজ বপন করা যায়।

**১.২.২ ভুট্টার দানার গঠন :** ভুট্টায় ধানের মতো কোন তুষ নেই। এতে ফলত্বক ও বীজত্বক একসাথে মিশে থাকে তাই ফল ও বীজ আলাদা করে চেনা যায় না। বীজ চ্যাপ্টা ও আয়তাকার। বীজের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা নিচে দেওয়া হল-

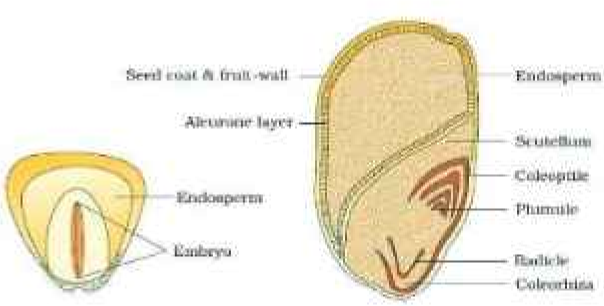


চিত্র ১.৩৯ ভুট্টা দানার বিভিন্ন অংশ

**বীজত্বক :** বীজত্বক ও ফলত্বক মিলে ভুট্টা দানাকে ঘিরে একটি সোনালি অর্ধস্বচ্ছ আবরণ সৃষ্টি করে। এ স্তর দুটি অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ আলাদা করা যায় না।

**অন্তর্বীজ:** বীজত্বকের ভিতর সমুদয় অংশকে অন্তর্বীজ বা কার্নেল (Kernel) বলে। অন্তর্বীজের মধ্যে সস্য ও ভ্রূণ থাকে।

**সস্য বা অ্যান্ডোস্পার্ম:** অন্তর্বীজের অধিকাংশ জুড়ে থাকে সস্য। সস্যে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ ও কিছু আমিষ থাকে।

**ভ্রূণ:** ভুট্টার ত্বকের উপর ত্রিকোনাকার একটি সাদা অবতল অংশ দেখা যায়। এ অবতলে ভ্রূণ অবস্থান করে। ভ্রূণ ভ্রূণাক্ষ ও বীজপত্র নিয়ে গঠিত। বীজপত্র সস্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ভ্রূণকে সরবরাহ করে।

## ১.২.৩ ভুট্টার পুষ্টিমান

ভুট্টা যথেষ্ট পুষ্টিকর ও শক্তিদায়ক খাদ্য। খাদ্যের প্রায় সবকটি উপাদান এতে বিদ্যমান। পুষ্টিমানের হিসাবে ভুট্টা গমের সমমানের হলেও চালের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর। ভুট্টায় যথেষ্ট ক্যারোটিন (ভিটামিন 'এ' এর উৎস) আছে যা চালে নেই। তবে গমে ভুট্টার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্যারোটিন থাকে। চাল ও গমের তুলনায় ভুট্টায় চর্বির পরিমাণও অনেক বেশি থাকে।

**সারণি ১.৫: ভুট্টার দানা, গমের আটা (পুরো) ও চাল (কলে ছাঁটা) এর পুষ্টি উপাদান**

| ক্রমিক নং | উপাদান | ভুট্টার দানা (১০০ গ্রাম) | | গমের আটা (১০০ গ্রাম) | চাল (১০০ গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | শুকনা | কাঁচা | | |
| ০১. | শর্করা (গ্রাম) | ৬৬.২ | ২৪.৬ | ৬৯.৪ | ৭৯.০ |
| ০২ | আমিষ (গ্রাম) | ১১.১ | ৪.৭ | ১২.১ | ৬.৪ |
| ০৩. | চর্বি (গ্রাম) | ৩.৬ | ০.৯ | ১.৭ | ০.৪ |
| ০৪. | খনিজ দ্রব্য (গ্রাম) | ১.৫ | ০.৮ | ২.৭ | ১.৭ |
| ০৫. | আঁশ (গ্রাম) | ২.৭ | ১.৯ | ১.৯ | ০.৩ |
| ০৬. | ক্যারোটিন (মি.গ্রাম) | ৯০.০ | ৩১.০ | ২৯.০ | - |
| ০৭. | থায়ামিন (মি.গ্রাম) | ০.৪ | ০.১ | ০.৫ | ০.২ |
| ০৮. | জলীয় অংশ | ১৪.৯ | ৬৭.১ | ১২.২ | ১৩.৩ |
| ০৯. | শক্তি (কিলোক্যালরি) | ৩৪২ | ১২৫ | ৩৪১ | ৩৪৬ |

ভুট্টার আমিষে লাইসিন ও ট্রিপটোফেন নামক দুইটি অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণ খুব কম। ফলে প্রোটিনের গুণাগুণ ততটা উন্নত নয়।

ভুট্টার তেল বর্ণহীন ও গন্ধহীন। শিশুদের বৃদ্ধি, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য বিশেষ উপকারী। ভুট্টার তেল লিভার ও কিডনির জন্য উত্তম। এছাড়া ভুট্টার তেল কোলেস্টেরল মুক্ত বিধায় এ তেল খেলে হৃদরোগের আশঙ্কা কম থাকে। ভুট্টা মানুষের মতো হাঁস-মুরগির জন্যও পুষ্টিকর এবং নিয়মিত ভুট্টার দানা খাওয়ালে হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। প্রচলিত গো খাদ্যের তুলনায় ভুট্টার পাতা ও গাছ উত্তম গো খাদ্য।

## ১.২.৪ ভুট্টা সংরক্ষণ

**উন্নতমানের টিন পাত্রে সংরক্ষণ:** এমএস (Mild steel) শীট দিয়ে এ পাত্র তৈরি করা হয়। মুখের ঢাকনা এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে এর চারদিকে তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বাতাস চলাচল বন্ধ করা যায়। ঢাকনায় ২.৫ × ২.৫ সে.মি. মাপের এক টুকরা কাঁচ বসানো থাকে তাই ঢাকনা না খুলেও পাত্রের ভিতরের বীজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

**উন্নত মাটির পাত্রে সংরক্ষণ:** মাটির তৈরি পাত্রের ভিতরে পুরু পলিথিন ব্যাগ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ভুট্টা বীজ রেখে তাপ দিয়ে ব্যাগের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাটির পাত্রের মুখ এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে সিলিং পদার্থ আটকে দিয়ে বায়ু চলাচল রোধ করা যায়।

**পলিথিনসহ পাটের ব্যাগে সংরক্ষণ:** পাটের তৈরি ব্যাগের ভিতরে শুধু পলিথিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভুট্টার দানা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ভরে এর মুখ তাপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর ব্যাগের মুখ দড়ি দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে ব্যাগটি ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

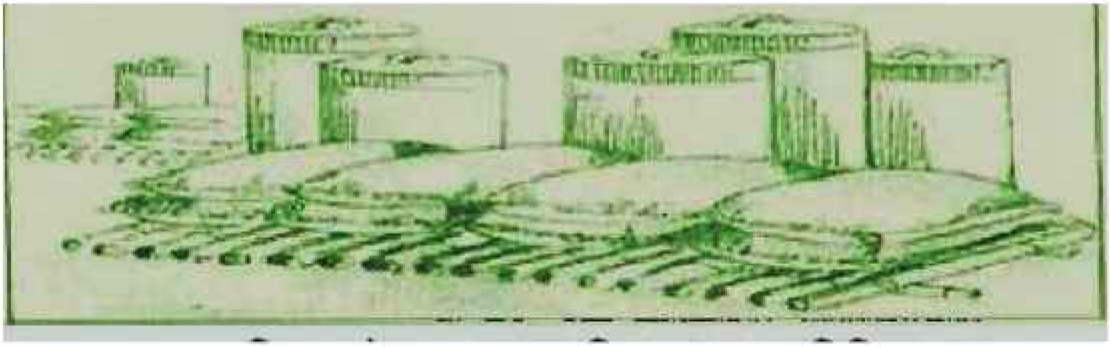

চিত্র ১.৪০ ভুট্টা সংরক্ষণের টিন, পাত্র ও পলিথিন

## ১.২.৫ গোলাজাত ভুট্টার পোকামাকড়

গুদামজাত ভুট্টার ক্ষতিকারক পোকামাকড়  মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- চালের শুঁড় পোকা বা রাইস উইভিল।
- ধানের সুরুই পোকা বা রাইস মথ।
- ভুট্টার শুঁড় পোকা বা মেইজ উইভিল।

উপরোক্ত পোকার মধ্যে প্রথম দুইটি পোকার ক্ষতির প্রকৃতি সম্পর্কে নবম শ্রেণির ৩য় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় শুধু ভুট্টার শুঁড় পোকার বর্ণনা দেওয়া হলো-

**ভুট্টার শুঁড় পোকা বা মেইজ উইভিল :** এই পোকা চালের শুঁড় পোকার মতোই তবে দেখতে কিছুটা কালো এবং লম্বায় বড় (৩.৫-৪.০ মি.মি)। এ পোকা ভুট্টার দানা ছাড়াও চাল, গম ও যবের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার আক্রমণ ও লক্ষণ চালের শুঁড় পোকার মতোই।

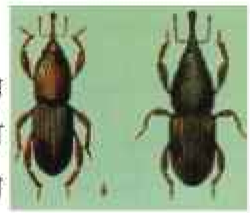

চিত্র ১.৪১ ভুট্টার শুঁড় পোকা

## ১.২.৬ গোলাজাত ভুট্টার পোকামাকড় দমন

### ক. সতর্কতা অবলম্বন

- ভুট্টার শস্যদানা গোলাজাত করার পূর্বে ৩-৪ বার ভালোভাবে শুকিয়ে দানার আর্দ্রতা ১০-১২% এর মধ্যে রাখতে হবে।
- দানা গোলাজাত করার পূর্বে গোলাঘরের দেয়াল বা মেঝেতে কোনোরূপ ফাটল থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। ঘরের চারপাশ পরিষ্কার করতে হবে।
- গোলাঘর, ভুট্টা রাখার ব্যাগ বা পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে সেভিন বা ম্যালাথিয়ন ১০% পাউডার দ্বারা শোধন করা যেতে পারে। অথবা ডেসিস ২.৫ অনুমোদিত হারে স্প্রে করা যায়।

চিত্র ১.৪২ ভুট্টা সংরক্ষণ গোলাঘর

- গোলা ঘরে (চিত্র) প্রয়োজনমত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বৃষ্টির দিনে যেন পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- সঠিক পাত্রে সঠিকভাবে ভুট্টা সংরক্ষণ করতে হবে।
- মাঝে মাঝে ভুট্টার দানা শুকাতে হবে যাতে ভেতরের কীড়া মারা যায়।

**খ. কীটনাশক প্রয়োগ**

- প্রতি কেজি দানাশস্যে ১ গ্রাম সেভিন বা ম্যালাথিয়ন ১০% পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
- গুদাম ঘরে স্তূপীকৃত প্রতি টন শস্যের জন্য ৩-৬টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গুদাম ঘরে বস্তায় রাখা স্তূপীকৃত প্রতি ১০০০ ঘনফুট দানার জন্য ১৫-২৫ টিফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা প্রিমিফস মিথাইল (একটেলিক) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রতি কেজি ভুট্টার বীজে ১০মিলি হারে নিম তেল ব্যবহার করে শুঁড় পোকা দমন করা যেতে পারে। এ ছাড়া নিশিন্দা, বিষকাটালী ও ল্যান্টানা নামক জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ১.২.৭ ভুট্টা মিলিং

ভুট্টা মিলিং করলে ভুট্টা থেকে ভুট্টার আটা পাওয়া যায়। এটি গম ভাঙানোর মিলে করতে হয়। তবে ভুট্টা ভাঙানোর জন্য ভিন্ন ধরনের চাকতি ব্যবহার করা হয়। ভুট্টা থেকে আটা তৈরির দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যথা-শুকনা মিলিং ও ভিজা মিলিং।।

**শুকনা মিলিং:** ভুট্টা থেকে আটা তৈরির জন্য শুকনা মিলিং পদ্ধতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা (ক) ভ্রূণসহ মিলিং ও (খ) ভ্রূণ ছাড়া মিলিং।

ভ্রূণসহ মিলিং করে যে আটা পাওয়া যায় তা বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না, কারণ ভ্রূণে ৮৫% তেল জাতীয় পদার্থ থাকে। তাই ভুট্টা ভ্রূণ ছাড়া শুকনো মিলিং পদ্ধতিতে ভাঙানো হয়ে থাকে। জার্ম সেপারেটরের সাহায্যে ভুট্টার ভাঙা দানা ও স্টার্চ থেকে ভ্রূণকে আলাদা করা যায়।

ভুট্টার দানা প্লেট গ্রাইন্ডার বা চাকতির মাধ্যমে গুঁড়া করা হয়। চাকতি যত বেশি জোরে ঘুরবে আটার কণা তত সূক্ষ্ম হবে। চাকতি যদি প্রতি মিনিটে ৫০০-৬০০ আরপিএম (রোটেশন পার মিনিট) এ ঘুরে তবে আটার মান ভালো হয়। যদি চাকতির গতি এর চেয়ে কম হয় তবে আটার কণা মোটা হয়। চাকতির গতি যদি ৩০০ আরপিএম হয় তবে আটার পরিমাণ ১৪.৫-২০ ভাগে নেমে আসে।

ভুট্টার আটা গ্লুটেনমুক্ত। তাই গমের আটার চেয়ে ভুট্টার আটা তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে পানি শোষণ করে। গমের ১০০ গ্রাম আটা যেখানে ৫০ মি.লি. পানি শোষণ করতে পারে সেখানে ভুট্টার আটা ১২০ মি.লি. পানি শোষণ করে। ভুট্টার আটা মিলিং করার পর পরই কোন পাত্রে বন্ধ রাখলে আটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই মিলিং এর পর এ আটা ওলট পালট করে কয়েক ঘন্টা রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ভুট্টার আটায় গ্লুটেন না থাকার কারণে এর সাথে ২০ ভাগ গমের আটা মিশিয়ে রুটি তৈরি করতে হয়। এ ধরনের মিশ্রিত আটার রুটি নরম ও খেতে সুস্বাদু হয়।

নিয়ে ভুট্টার শুকনা মিলিং এর প্রবাহ চিত্র দেওয়া হলো-

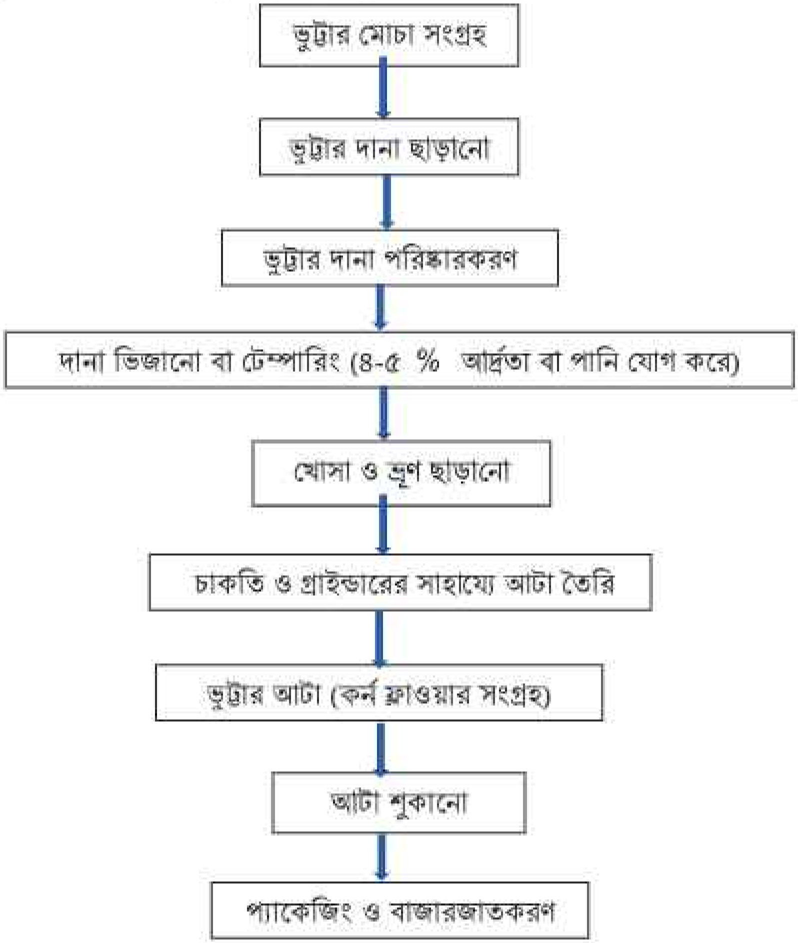


**ভিজা মিলিং :** এ পদ্ধতিতে ভুট্টা মিলিং করার জন্য ভিজানো হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপগুলো নিয়ে বর্ণনা করা হলো –

**ভুট্টা সংগ্রহকরণ:** পুষ্ট, দোষমুক্ত উন্নত মানের ভুট্টা সংগ্রহ করতে হয়।

**ভুট্টা শুষ্ক ও পরিষ্কারকরণ:** ভালোভাবে রোদে বা প্রয়োজনে যান্ত্রিক ড্রায়ারে ৪৫°সে. তাপমাত্রায় শুকানো ভুট্টা ভালোভাবে ঝেড়ে ধুলোবালি, কাঁকর বা খড়কুটা, পোকামাকড়ের মল ও লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হয়।

**ভুট্টা ভিজানো বা স্টিপিং:** প্রায় ৫০°সে. সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভুট্টাকে ৩০-৪০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এ সময় যাতে ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাক জন্মাতে না পারে সেজন্য ০.১% হারে সালফার-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করে দেয়া হয়। ভুট্টা পানিতে ভিজালে দানার আয়তন বেড়ে যায় এবং খোসা, আঁশ ও অঙ্কুর বা ভ্রূণ ইত্যাদি আলাদা করা সহজ হয়।

**অঙ্কুর বিচ্ছিন্নকরণ:** ভেজানো ভুট্টা দানাকে হালকাভাবে ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে দানা থেকে ভ্রূণের অংশটি আলাদা হয়ে যায়। এরপর ভ্রূণ আলাদাকরণ বা জার্ম সেপারেটর মেশিন দ্বারা ভুট্টার ভ্রূণ ও স্টার্চ আলাদা করা হয়।

**অঙ্কুর আলাদাকরণ:** তেল সমৃদ্ধ ভুট্টার ভ্রূণগুলো ভালো করে চিকন চালনি দিয়ে ছেঁকে ধুয়ে পরিষ্কার করে আলাদা করা হয়। মোটা কাপড়ের সাহায্যে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে স্টার্চ মুক্ত করা হয়। তারপর ভ্রূণ থেকে নিষ্কাশন পদ্ধতিতে ভুট্টার তেল আহরণ করা হয় এবং পশুখাদ্য হিসেবে খৈল পাওয়া যায়।

**মিলিং:** অবশিষ্ট ভুট্টার কণা ও খোসাসহ পানির দ্রবণ থেকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দ্বারা স্টার্চ আলাদা করা হয়।

**স্টার্চ ড্রাইং:** ভুট্টার স্টার্চ ড্রায়ার দ্বারা শুকিয়ে বিশুদ্ধ স্টার্চ বা ভুট্টার আটা পাওয়া যায়। সুতরাং একই সাথে ভুট্টার তেল, খৈল, আমিষ ও স্টার্চ (মোট চারটি পদার্থ) পাওয়া যায়।

**প্যাকেজিং:** এরপর এই আটা শুকিয়ে বাজারজাত করা হয়। অথবা এই আটা কর্ন সিরাপ, ডেক্সট্রোজ, স্টার্চ, কাগজ গাম বা খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

**ভুট্টার ভিজা মিলিং ফ্লোচার্ট নিম্নে দেওয়া হলো**

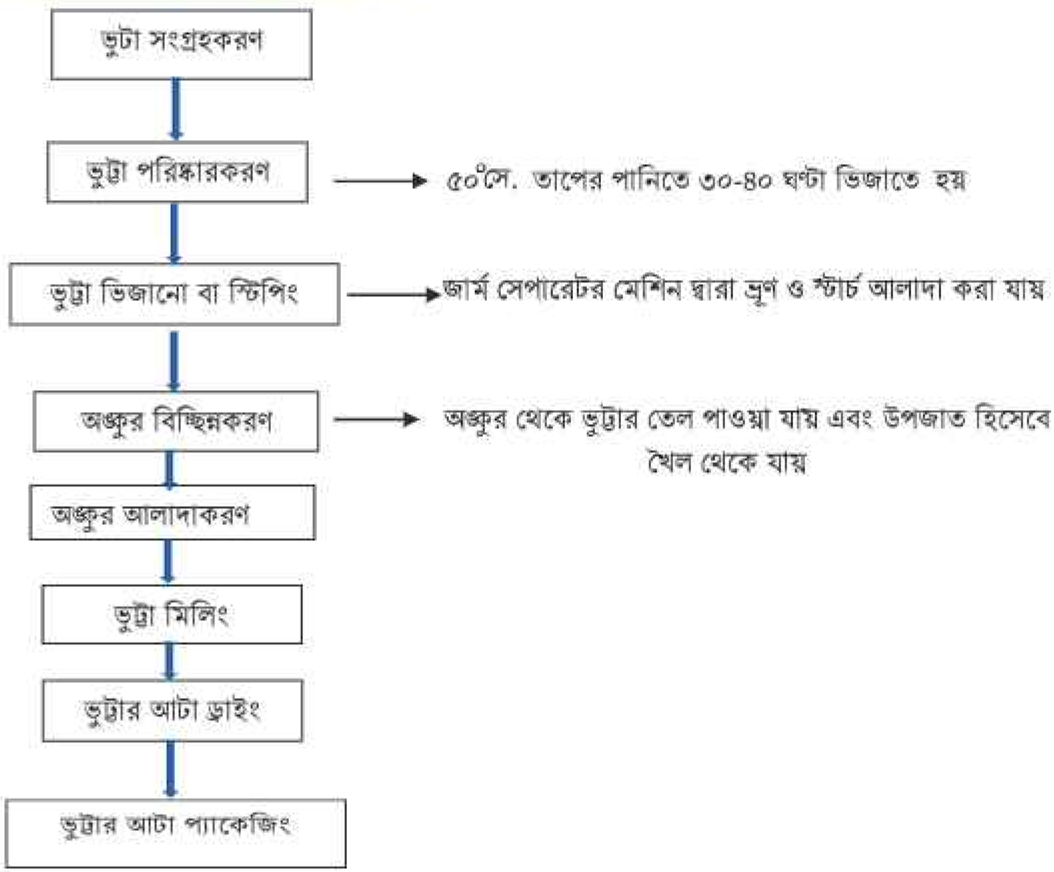

## ১.২.৮ ভুট্টা থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য

ভুট্টা থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেমন-

### ক) ভুট্টার আটা ও দানা ভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য:

১. মিশ্র রুটি
২. মিশ্র পরোটা
৩. মিশ্র লুচি
৪. ভুট্টার গজা
৫. আলু ভুট্টা রুটি
৬. ভুট্টার ছাতু
৭. ভুট্টার ডাল পুরি
৮. ভুট্টার খিচুড়ি
৯. ভুট্টার ফিরনি
১০. ভুট্টার ক্ষীর
১১. শিশু খাদ্য
১২. মিষ্টি ভুট্টার স্যুপ
১৩. মিষ্টি ভুট্টা দানার স্যুপ
১৪. চিকেন কর্ন স্যুপ
১৫. ভুট্টার পোলাও
১৬. ভুট্টার ময়দা ও ভুট্টা চূর্ণের মিশ্র

### খ. কাঁচা মোচা ভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য:

১. মোচা পোড়ায়ে বা ঝলসানো খাবার। ২. মোচা সিদ্ধ।
৩. কঁচি মোচার সবজি। ৪. ভুট্টার তরকারি।

### গ. খই ভুট্টাভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য:

১. খই ২. মোয়া ৩. মুড়কি ৪. নাড়ু

### খাদ্য হিসেবে ভুট্টার উপকারিতা

- চাল ও গমের চেয়ে ভুট্টায় তেলের পরিমাণ বেশি।
- ভুট্টার তেল গন্ধহীন ও বর্ণহীন।
- ভুট্টার তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকায় রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কম।
- চাল ও গমের চেয়ে ভিটামিন এ (ক্যারোটিন) ভুট্টায় বেশি।
- সহজ উপায়ে রান্না করে খাওয়া যায়।
- তাপ উৎপাদনকারী খাদ্য হিসেবে গম ও ভুট্টা পাশাপাশি অবস্থানে।
- ভুট্টায় আঁশের পরিমাণ বেশি বলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।
- ভুট্টা মানুষের এবং পশুপাখির খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

## ১.২.৯ ভুট্টার আটা ও দানা ভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য

**ভুট্টার আটার রুটি:** এই রুটি তৈরি করতে ভুট্টার আটা ও গমের আটা ৪:১ বা ২:১ বা ১:১ অনুপাতে মিশানো যায়। দুই ধরনের আটা মেপে একত্রে গরম পানি ও লবণ মিশিয়ে ভালো করে ডলে খামির

২০২৫

তৈরি করতে হয়। খামির থেকে ছোট ছোট গোলা বা বল নিয়ে পিঁড়ি ও বেলনের সাহায্যে রুটি বেলে নিতে হয়। চুলায় তাওয়া গরম হলে রুটি সেঁকে নিতে হয়।

**ভুট্টার আটার পরোটা:** ভুট্টার আটা ১ ভাগ, গমের আটা ২ ভাগ, তেল বা ঘি, লবণ ও পানি পরিমাণমত নিতে হয় । তারপর রুটি বানানোর মতো খামির তৈরি করতে হয় । পিঁড়ি ও বেলনে বেলে চারকোণা ও একটু মোটা করে বেলতে হয়। তারপর ঘি বা তেলে একটু বাদামি করে ভেজে তুললেই পরোটা হয়ে যায়।

**আলু ভুট্টা রুটি:** এ রুটি তৈরি করতে ১০০ গ্রাম ভুট্টার আটার সাথে মাঝারি সাইজের ৪টি আলু নিতে হয়। ঘি ২০ গ্রাম, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ ও লবণ পরিমাণমত নিতে হয়। আলু সিদ্ধ করে খোসা ছিলে চটকে নিতে হয়। ভুট্টার ময়দা, চটকানো আলু এবং সব মসলা একত্রে ডলে খামির তৈরি করতে হয়। এরপর ছোট ছোট করে গোলা বা বল তৈরি করে রুটি বানাতে হয়। ঘি দিয়ে রুটির উভয় পিঠ সেঁকে নিতে হয়। প্রয়োজনে আরও ঘি বা তেল দিয়ে তাওয়ায় রুটি ভেজে নিতে হয়। খাওয়ার জন্য গরম থাকতে পরিবেশন করতে হয়।

**ভুট্টার খিচুড়ি:** এই খিচুড়ি তৈরি করতে কঁচি ভুট্টার দানা ১৫০ গ্রাম, চাল ৩০০ গ্রাম, ঘি আধাকাপ, আদা বাটা, সরিষা, লবণ ও পানি পরিমাণমত নিতে হয়। চাল দু ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। হাঁড়িতে ঘি গরম করে সব শুকনা মসলা দিয়ে চাল ও ভুট্টা ছেড়ে দিতে হয়। অবশেষে লবণ, আদা বাটা এবং পানি দিতে হয়। চাল ও ভুট্টার দানা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয়। পানি শুকিয়ে খিচুড়ি ঝরঝরে হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

**ভুট্টার পোলাও:** সিদ্ধ কঁচি ভুট্টার দানা ২৫০ গ্রাম, চাল ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা মরিচ কুচি ও ঘি পরিমাণমত, স্বাভাবিক পোলাওর অন্যান্য মসলা দিয়ে পোলাও রান্না করতে হয়। চাল ধুয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হয়। ঘি গরম করে মসলা, চাল ও ভুট্টা একটু ভাজতে হয়। তারপর তিন কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। চাল ও ভুটা সিদ্ধ হবার পর চুলা থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

**ভুট্টার পোরিজ বা ফিরনি:** ফিরনি তৈরি করার জন্য ভাঙা ভুট্টা ৬০ গ্রাম, দুধ ১০০ গ্রাম, গুড় বা চিনি ৫০ গ্রাম, ঘি ৫০ গ্রাম এবং পানি পরিমাণমত নিতে হয়। ভাঙা ভুট্টা পানিতে প্রায় ১ ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর পানি ঝরিয়ে ভুট্টা ঝলসাতে হবে যে পর্যন্ত উষ্ণ বাদামি রঙের না হয়। ঘি গরম করে এই ভুট্টা আরও পাঁচ মিনিট ভাজতে হয়। তারপর পানি দিয়ে কম তাপে সিদ্ধ করতে হয়। ভুট্টা নরম হলে চিনি বা গুড় দিয়ে ভালো করে মিশাতে হয়। তারপর চুলা থেকে নামাতে হয়। পরিবেশনের সময় দুধ মিশিয়ে খেতে হয়।

**শিশুর পরিপূরক খাদ্য:** এই খাদ্য তৈরিতে ভুট্টার ময়দা ৬০ গ্রাম, ননীযুক্ত গুঁড়োদুধ ১৫ গ্রাম এবং চিনি ১০ গ্রাম নিতে হয়। ময়দা চেলে গুঁড়োদুধ মিশাতে হয়। অল্প পরিমাণ পানি মিশিয়ে সেদ্ধ করা

২০২৫

হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করার সময় অনবরত নাড়তে হয় যেন তলায় না লেগে যায়। রান্নার সময় চিনি বা লবণ দিয়ে না গলা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয়। শিশুর পরিপূরক এ খাদ্য থেকে ৩১০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। দুধের পরিবর্তে ডিম দিয়েও এ খাদ্য তৈরি করা হয়।

চিত্র ১.৪৩ সুইট কর্ন স্যুপ

**সুইট কর্ন স্যুপ:** মাঝারি আকারের একটি কচি ভুট্টার মোচা, ১ চা চামচ চিনি, সাদা গোল মরিচের গুঁড়া, পরিমাণমত টেস্টিং সল্ট, সয়া সস, কর্ন ফ্লাওয়ার বা অ্যারারুট দিয়েএই স্যুপ তৈরি করা যায়। ভুট্টার মোচা থেকে খোসা ও সুতা বা সিল্ক ছাড়িয়ে নিতে হয়। আস্ত ভুট্টার মোচা পানি দিয়ে চুলায় বা প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে হয়। ভুট্টার দানা নরম হলে ঠাণ্ডা করে ছুরি দিয়ে আধা কাপ ভুট্টা ছাড়িয়ে নিয়ে বাকি আস্ত ভুট্টা কুরানি দিয়ে কুরে নিতে হয়। এবার পানিতে ভুট্টার দানা ও কুরানো ভুট্টা জ্বাল দিতে হয়। তারপর লবণ, চিনি, গোল মরিচের গুঁড়া ও সয়া সস মিশাতে হয়। সবকিছু তিন মিনিট ফুটানোর পর এক টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার বা অ্যারারুট মিশাতে হয়। স্যুপ অনবরত নাড়তে হয়। অল্প আঁচে জ্বাল দিয়ে ফুটে উঠলে নামিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করতে হয়। অনেকটা একই পদ্ধতিতে মিষ্টি ভুট্টা দানার সাথে মুরগির ডিম ও সিদ্ধ করা মুরগির মাংস দিয়ে চিকেন কর্ন স্যুপ তৈরি করা যায়।

## ১.২.১০ ভুট্টার কাঁচা ও মোচাভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য

চিত্র ১.৪৪ ঝলসানো ভুট্টার মোচা

**ঝলসানো ভুট্টার মোচা:** দানা নরম থাকা অবস্থায় ভুট্টার মোচার খোসা ছাড়াতে হয়। তারপর কয়লার আগুনে ঝলসাতে হয়। আগুনের উপর রেখে মোচা পোড়ালে আরও ভালো হয়। এছাড়া গরম বালুতেও মোচা ঝলসানো যায়। আগুনে পোড়ানো এই ভুট্টা খেতে বেশ সুস্বাদু।

**সিদ্ধ ভুট্টা:** পানিতে ভুট্টার মোচা সিদ্ধ করে আলাদা করে নিতে হয়। কাঁচা মরিচ ও পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে ঘি দিয়ে ভাজতে হয়। এর সাথে সিদ্ধ ভুট্টার দানা, লবণ ও ধনে পাতা ছেড়ে দিতে হয়। কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

**ভাজা ভুট্টা:** কঁচি ভুট্টার মোচা থেকে দানা আলাদা করতে হয়।দুধ গরম করে ফুটন্ত দুধে দানাগুলো ছেড়ে দিতে হয়। জ্বাল দেবার পর ভুট্টার দানা যখন দুধ চুষে নেয় বা দুধ যখন শুকিয়ে আসে তখন চুলা থেকে নামাতে হয়। কড়াইতে ঘি গরম করে জ্বাল দেওয়া ভুট্টার দানা মিশিয়ে নিয়ে ভেজে ঠান্ডা করে পরিবেশন করা হয়।

**ভুট্টা ভাজি:** মোচা থেকে দানা ছাড়িয়ে নিয়ে চুলায় সিদ্ধ করতে হয়। নরম ও দৃঢ় হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হয়। কড়াইতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে তেল দিয়ে বাদামি করে ভাজতে হয়। তারপর আলুর

২০২৩

টুকরা ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। এ সময় প্রয়োজনমত মসলা ও ভুট্টা দিয়ে নাড়তে হয়। পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং ৩-৪ মিনিট চুলায় রেখে পরিবেশন করা যায়।

## খৈ ভুট্টার ভিত্তিক খাদ্যদ্রব্য

চিত্র ১.৪৫ ভুট্টার খৈ তৈরির মেশিন

**ভুট্টার খৈ:** ভুট্টার সকল জাতের দানা থেকে খৈ তৈরি করা যায় না। শুধুমাত্র খৈ ভুট্টা জাতের ভুট্টার দানা থেকে সুন্দর খৈ তৈরি করা যায়। প্রথমে ভুট্টার দানা ধুয়ে নিতে হয়। নিশ্চিত হতে হবে যে দানায় ১৪-১৫% আর্দ্রতা আছে। তবেই খৈ সর্বাধিক ফোলে উঠবে। বড় তলা বিশিষ্ট পাত্রে কিছু সয়াবিন তেল দিয়ে গরম করতে হয়। তেল গরম হলে (ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত ) ৫০ গ্রাম ভুট্টার দানা পাত্রে ঢেলে দিয়ে সাথে সাথে ঢাকনা লাগিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। মুখ বন্ধ করে পাত্রটি ধীরে ধীরে ঘুরাতে হয় যে পর্যন্ত খৈ ফুটার আওয়াজ বন্ধ না হয়। প্রয়োজনমতো লবণ যোগ করতে হয়। খৈ ভাজা হলে ঠান্ডা করে পলি ব্যাগে প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়। বর্তমানে ভুট্টার খৈ ভাজার ছোট যন্ত্র ভ্যানগাড়িতে বসিয়ে শহরে বন্দরে ভুট্টা ভেজে গরম গরম বিক্রি করা হয়। যা সকলের নিকট খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

**ভুট্টার মোয়া:** প্রথমে খৈ তৈরি করে নিতে হয়। তারপর একটি পাত্রে পরিমাণমত পানি দিয়ে আখের গুড় জ্বাল দিতে হয়। প্রায় ৫-৭ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে খৈ ছেড়ে দিতে হয়। তারপর গরম পাত্রটি নামিয়ে দ্রুত হাতা দিয়ে নাড়তে হয় যাতে গুড় সমস্ত খৈ এ সমানভাবে মেখে যায়। এবার গরম থাকতেই গুড় মাখানো খৈ হাতে নিয়ে মুঠ করে চেপে মোয়া তৈরি করতে হয়। মনে রাখতে হবে গরম গুড়ের আঠাতেই কেবল সুন্দর মোয়া তৈরি হয়। গুড় ঠান্ডা হয়ে গেলে মোয়া তৈরি করা যায় না।

**ভুট্টার মুড়কি :** প্রথমে খৈ ভুট্টার দানা ২০০ গ্রাম, সয়াবিন তেল ১০০ মিলি লিটার, গুঁড় ৩০০ গ্রাম ও লবণ পরিমাণমতো নিতে হয়। ভুট্টার দানা থেকে খৈ ভেজে নিতে হয়। মোয়া তৈরির মতো একই প্রণালিতে একটি পাত্রে গুঁড় জ্বাল দিতে হয়। ফুটন্ত গুঁড়ের ভিতর খৈ ছেড়ে দেওয়া হয় অথবা খৈ-এর মধ্যে গুঁড় ছেড়ে হাতা দিয়ে তাড়াতাড়ি ওলটপালট করে নাড়তে হয়। গুঁড় ঠান্ডা হওয়ার আগেই খৈ এর সাথে সমস্ত গুঁড় মাখিয়ে ফেলতে হয়। কেননা ঠান্ডা হয়ে গেলে গুঁড় খৈ এর গায়ে লাগে না। খৈ-এ গুঁড় মাখায়ে ঝরঝরে করা হলে মুড়কি তৈরি হয়ে যায়। একইভাবে গুঁড়ের পরিবর্তে চিনি দিয়েও ভুট্টার মুড়কি তৈরি করা যায়।

**ভুট্টার নাড়ু:** খৈ ভাজার পর দেখা যায় কিছু কিছু ভুট্টার দানা খৈ হয় না। এ অফুটন্ত দানা নাড়ু তৈরির জন্য কিছুটা গুড়া করে নিতে হয়। একটি পাত্রে পরিমাণমত নরম গুড় বা ঝোলা গুড় বা শুকনো গুড়ের সাথে পানি মিশিয়ে ৬-৭ মিনিট জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে ভুট্টার দানা ছেড়ে দিতে হয়। এরপর পাত্রটি নামিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হয়। গরম থাকতেই হাতে তেল মেখে মুঠি করে গোলাকার নাড়ু তৈরি করা যায়। ভুট্টার গুড়ার সাথে তিলের গুঁড়া ও নারিকেল কোরা মিশিয়ে দিলে নাড়ু খুব মজাদার হয়।

চিত্র ১.৪৬ ভুট্টার নাড়ু

## ১.২.১১ ভুট্টা থেকে তৈরি শিল্পজাত দ্রব্য

**শিল্পজাত দ্রব্য:** বাংলাদেশে প্রতিবছরে ১৫-২০ হাজার টন স্টার্চ আমদানি করা হয়। সমপরিমাণ স্টার্চ তৈরি করতে ৩০-৪০ হাজার টন ভুট্টার প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভুট্টা চাষ তেমন প্রসার লাভ করেনি বিধায় ভুট্টা ভিত্তিক শিল্পকারখানা এখনও বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠেনি। ভুট্টা থেকে নিম্নের শিল্প উপাদান তৈরি করা যায়-

১. স্টার্চ
২. কর্ন ফ্লেক্স
৩. ভুট্টার তেল
৪. বলবর্ধনকারী খাবার
৫. কনফেকশনারি দ্রব্য
৬. কর্ন সিরাপ
৭. টিনজাত দ্রব্য
৮. ফুরফুরাল শিল্প
৯. ইথানল
১০. বিবিধ শিল্প

**স্টার্চ:** ভুট্টার শুকনো দানায় ৬৬-৭৮% স্টার্চ থাকে। ভুট্টাকে প্রক্রিয়াজাত করে সহজেই উক্ত স্টার্চ পাওয়া যায়। স্টার্চ টেক্সটাইল শিল্প, ভেষজ শিল্প, কাগজের মিল, অ্যাসবেস্টস বোর্ড, যন্ত্রাংশের ছাঁচ ও ড্রাইসেল ব্যাটারি ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহার হয়।

**কর্নফ্লেক্স:** ভুট্টার শর্করাকে হাইড্রোলাইসিস করে কর্ন সিরাপ উৎপন্ন করা হয় যা মিষ্টি বৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন প্রকার ডেক্সট্রিন, মালটোজ, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ বিদ্যমান থাকে। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হল মিষ্টি যৌগ। দুধ ও চিনি দিয়ে ভিজানো কর্নফ্লেক্স শিশু ও কিশোরদের কাছে বেশ মজাদার খাবার।

চিত্র ১.৪৭ কর্নফ্লেক্স

**কর্ন অয়েল :** ভুট্টার ভ্রূণ অপসারণ, নিষ্কাশন ও পরিশোধন করে বিশুদ্ধ ভুট্টার তেল বা কর্ন অয়েল পাওয়া যায়। ভুট্টার তেলে কোলেস্টেরল নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্রে এই তেলকে মেজোলা ওয়েল বলে। রান্না

চিত্র ১.৪৮ কর্ন অয়েল

ছাড়াও ভুট্টার তেল গোলাবারুদ, রং, বার্নিশ, কৃত্রিম রাবার, সাবান, বেকারি সামগ্রী, মেয়নেজ, মরিচারোধক দ্রব্য ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

**বলবর্ধনকারী খাবার:** হরলিক্স, মালটোভা, বুস্ট ইত্যাদি বলবর্ধনকারী খাবার তৈরিতে ভুট্টার দানা ব্যবহার করা হয়।

**কনফেকশনারি দ্রব্য:** বিভিন্ন প্রকার রুটি, বিস্কুট, কেক ও কনফেকশনারি দ্রব্য তৈরিতে ভুট্টার গুঁড়া ব্যবহার করা হয়।

**কর্ন সিরাপ:** ভুট্টার স্টার্চকে হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও ডেক্সট্রিন ইত্যাদি কর্ন সিরাপ তৈরি করা হয়। এই সিরাপ খাবার শিল্প, চামড়া শিল্প, সাবান শিল্প ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১.৪৯ কর্ন সিরাপ

**টিনজাত ভুট্টা:** ভুট্টার অপরিপক্ব মোচাকে খাওয়ার জন্য টিনজাত বা ক্যানিং করে বাজারজাত করা হয়।

**ইথানল:** ভুট্টার স্টার্চ থেকে গাঁজন বা ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথানল তৈরি করা যায়।

## ➢ ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

১। জবের নাম: **গম দানার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ।**

২। পারদর্শিতার মানদন্ড:

১.১ কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করবে।
১.২ কাজের জায়গা প্রস্তুত করবে।
১.৩ কয়েকটি গম দানা সংগ্রহ করবে।
১.৪ আতশি কাঁচ সংগ্রহ করবে।
১.৫ গম দানার বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করবে।
১.৬ অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।
১.৭ কাজ শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল সংরক্ষণ করবে।
১.৮ কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে।

## ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পাত্র
- প্লাস্টিকের বোল
- আতশি কাঁচ (বড় ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস)
- কিছু তাজা গম
- নিডল
- চিমটা
- পেন্সিল
- কাগজ
- রাবার

## ৪। ডায়াগ্রাম:

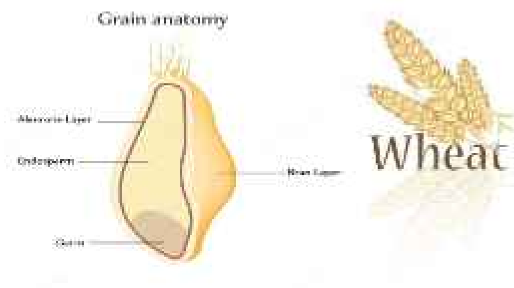


## ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ও বয়সের গম সংগ্রহ করতে হবে।
- গমের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে।
- গম বীজের দানা ঘিরে একটি পুরু আবরণ বা আস্তরণটি হলো ছাল বা ভুসি।

- গম দানার ভ্রূণ এবং এন্ডোস্পার্ম ঘিরে পাতলা স্তরটি হলো অ্যালিউরন স্তর।
- গম দানার ব্রান বা ভুসি, অ্যালিউরন স্তর ও ভ্রূন বাদ দিয়ে গম দানার অবশিষ্ট অংশটি হলো এন্ডোস্পার্ম।
- গম দানার নিচের দিকে কোণায় সবচেয়ে পুষ্টিকর অংশটি হলো ভ্রূণ বা অঙ্কুর।
- বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গমের বিভিন্ন অংশের ছবি বড় সাইজের ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে হবে।
- বিভিন্ন জাতের গম যেমন- শক্ত ও নরম গম ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারবে।
- কাগজে বা ড্রয়িং শীটে সনাক্তকৃত বিভিন্ন গমের চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে হবে।

### ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- গম তাজা হতে হবে।
- পরীক্ষণের সময় ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিতে হবে।
- অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস পরিধান করতে হবে।
- গমের বিভিন্ন অংশ সতর্কতার সাথে পৃথক করতে হবে।
- জবটি চারবার করতে হবে।

## জব নং-০২

### ১। জবের নাম: **ময়দা থেকে ডোনাট তৈরিকরণ।**

### ২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

২.১ ময়দা থেকে ডোনাট তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
২.২ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
২.৩ রেসিপি অনুসারে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।
২.৪ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে ময়দা থেকে ডোনাট তৈরি করবে।
২.৫ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।
২.৬ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

### ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- ডোনাট কাটার
- পিঁড়ি ও বেলন
- চুলা
- কড়াই
- হাতওয়ালা লম্বা চামচ

## উপাদান উপকরণ

- ঈস্ট ড্রাই-১ প্যাকেট
- দুধ -১ কাপ
- ডালডা- ১৫০ গ্রাম
- চিনি -আধা কাপ
- ময়দা সাড়ে-তিন কাপ
- ডিম- ১টি
- লবণ-১ টেবিল চামচ
- সয়াবিন তেল-পরিমাণমত

## ৪। ডোনাটের ছবি

## ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- মৃদু গরম পানিতে ঈস্ট ভিজিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- দুধ, ডালডা, চিনি এবং লবণ একটি বড় পাত্রে একসাথে মিশাতে হবে।
- ঈস্ট ও ডিম মিশাতে হবে । এখন এমনভাবে ময়দা মিশাতে হবে যেন খামির নরম হয়। ১০ মিনিট ধরে খামির ভালো করে মিশাতে হবে।
- ডালডা মিশানো প্যানে খামির ঢেকে রাখতে হবে।
- ১ ঘন্টা পর খামির ফোলে উঠলে ২-৩ বার খামির ভালো করে মিশিয়ে আবার ১ ঘন্টা ঢেকে রাখতে হবে।
- পিড়িতে ময়দা ছিটিয়ে খামির ৮ মি. মি. পুরু করে বেলতে হবে। ডোনাট কাটার দিয়ে কেটে আরও ৩০-৪০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে।
- ডোনাট ফোলে উঠলে চুলায় ডুবো তেলে ভাজতে হবে।
- গরম ডোনাটে গুঁড়া চিনি ছিটিয়ে পরিবেশন করতে হবে।
- ডোনাটের উপকরণে চকলেট দিয়ে চকলেট ডোনাট তৈরি করতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- ঈস্ট যেন পুরাতন না হয়।
- খামির ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে যাতে ফোলে উঠে।
- জবটি আটবার করতে হবে।

## জব নং-০৩

১। জবের নাম: **ময়দা থেকে নিমকি তৈরিকরণ।**

২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

৩.১ ময়দা থেকে নিমকি তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৩.২ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৩.৩ রেসিপি অনুসারে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে ।
৩.৪ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে ময়দা থেকে নিমকি তৈরি করবে।
৩.৫ তৈরিকৃত নিমকি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
৩.৬ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।
৩.৭ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পিড়ি ও বেলন
- চুলা
- কড়াই
- হাতওয়ালা লম্বা চামচ

### উপাদান উপকরণ

ময়ানের জন্য

- দুই কাপ ময়দা
- দুই চা চামচ তেল

- ১ চা চামচ লবণ
- ১/২ চামচ চিনি
- ১ চা চামচ কালোজিরা
- ১/২ কাপ পানি
- লবণ-১ টেবিল চামচ
- ভাজার জন্য ২ কাপ তেল।

## ৪। নিমকির ছবি

## ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- একটি বড় পাত্রে পানি বাদে ময়ানের জন্য বাকি সব উপকরণ- ময়দা, তেল, লবণ, চিনি এবং কালোজিরা নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
- এবার খুব অল্প অল্প করে পানি নিয়ে সব উপকরণ একসাথে মাখতে থাকবে। যতক্ষণ না আঙুল থেকে সব ময়দা ছেড়ে যাচ্ছে এবং মাখা ময়দার খামির সুন্দর মসৃণ নরম হচ্ছে, ততক্ষণ মাখতে থাকবে।
- প্রায় ৫-৬ মিনিট ধরে মাখলে তবে পছন্দসই খামির তৈরি হবে।
- মাখা ময়দার খামির একটা ভেজা সুতির কাপড় জড়িয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।
- পিঁড়ি ও বেলুনে সামান্য শুকনো ময়দা ছড়িয়ে নিতে হবে।
- ময়দার খামির থেকে ৫-৬টি সমান মাপের লেচি কেটে নিতে হবে।
- এক একটি লেচি শুকনো ময়দা ছড়ানো পিঁড়ির উপর রেখে পাতলা বড় রুটির আকারে বেলে নিতে হবে।
- এক একটি রুটি বেলা হয়ে গেলে প্রতিটি রুটি একটি ছুরি দিয়ে অনেক ছোট ছোট বরফির আকারে কেটে নিতে হবে।
- কড়াইয়ে ভাজার জন্য দুই কাপ তেল কড়াইয়ে ঢেলে তেল গরম হলে মাঝারি আঁচে বরফির আকারে কেটে নেওয়া ময়দার টুকরোগুলো ডুবো তেলে ভাজতে হবে।

- ভাজা নিমকির টুকরোগুলো পেপার টাওয়েলের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে, অতিরিক্ত তেল বেরিয়ে গিয়ে নিমকিগুলো মচমচে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- জবটি ছয়বার করতে হবে।

## জব নং-০৪

### ১। জবের নাম: **ময়দা থেকে মিষ্টি খাদ্য খাজা তৈরিকরণ।**

### ২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

৪.১ ময়দা থেকে মিষ্টি খাদ্য খাজা তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৪.২ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

৪.৩ রেসিপি অনুসারে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।

৪.৪ উপকরণগুলো পর্যায়ক্রমে একটি বড় পাত্রে মিশিয়ে খামির তৈরি করবে।

৪.৫ নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় আকৃতি প্রদান করবে।

৪.৬ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে ময়দা থেকে মিষ্টি খাদ্য খাজা তৈরি করবে।

৪.৭ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।

৪.৮ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

### ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- ডোনাট কাটার
- পিড়ি ও বেলন
- চুলা
- কড়াই
- হাতওয়ালা লম্বা চামচ

### উপাদান উপকরণ

**খামির তৈরির জন্যঃ**

ময়দা- ২ কাপ

তেল/ঘি-৪ টেবিল চামচ
লবণ- ১/৪ চা চামচ
বেকিং পাউডার- ১/৪ চা চামচ (না দিলেও হবে।)
পানি- ১/২ কাপ

**সিরা তৈরির জন্য:**

চিনি- ১ কাপ
পানি- ১ কাপ
গোলাপজল- ১/২ চা চামচ

**খাজা তৈরির জন্য:**

গলানো ঘি-১/৪ কাপ
চালের গুঁড়ো-২ টেবিল চামচ
ভাজার জন্য তেল বা ঘি

## ৪। খাজার ছবি

## ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- একটি বড় বাটিতে ময়দা, বেকিং পাউডার, লবণ নিতে হবে।
- ময়দাতে তেল দিয়ে দু'হাতে ভালো করে মেখে নিতে হবে।
- এরপর ১/২ কাপ বা প্রয়োজনমত ঠান্ডা পানি দিয়ে ময়দা ময়ান করে ডো তৈরি করতে হবে। ২০ মিনিট ঢেকে রেখে দিতে হবে।
- পানি ও চিনি জ্বাল দিয়ে ঘন হয়ে লেগে আসলে গোলাপজল দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।
- একটি ছোট বাটিতে ১/৪ কাপ ঘি ও চালের গুঁড়া মিশিয়ে রাখতে হবে।
- ময়দার খামির ১০ ভাগ করে নিবে। প্রতিটা ভাগ নিয়ে গোল পাতলা রুটি বানিয়ে নিতে হবে।
- একটি রুটি নিয়ে তার উপর ১ চা চামচ ঘি ও চালের গুঁড়ার মিশ্রন মেখে দিয়ে তার উপর আরেকটি রুটি দিতে হবে।
- রুটির উপর আবার ১ চা চামচ ঘি ও চালের গুঁড়ার মিশ্রন মেখে দিতে হবে। এভাবে ৫ টি রুটি করে নিতে হবে।

- ৫টি রুটি একসাথে রোল করে নিতে হবে। (একদম উপরের রুটিতেও ঘি ও চালের গুঁড়োর মিশ্রণ মেখে নিতে হবে)।
- এখন ছুরি দিয়ে রোল করা রুটি ১ ইঞ্চি করে কেটে নিবে। প্রতিটা খাজার পিস নিয়ে রুটি বেলার পিঁড়িতে চেপে বেলে কিছুটা পাতলা করতে হবে।
- কড়াইতে তেল দিয়ে গরম হলে ডুবো তেলে খাজাগুলো ভেজে তুলতে হবে।
- বাকি ৫টা রুটি দিয়ে একইভাবে করে নিতে হবে। হাল্কা গরম সিরাতে ১ মিনিট ভিজিয়ে উঠিয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে হবে মজাদার রসে ভরা মিষ্টি খাজা।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- জবটি ছয়বার করতে হবে।

## জব নং-০৫

### ১। জবের নাম: **ময়দা থেকে বেকারি খাদ্য কেক তৈরিকরণ।**

### ২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

৫.১ ময়দা থেকে বেকারি খাদ্য কেক তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৫.২ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৫.৩ রেসিপি অনুসারে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে ।
৫.৪ বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ ও ওভেন ব্যবহার উপযোগী কি-না চেক করবে।
৫.৫ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে ময়দা থেকে বেকারি খাদ্য কেক তৈরি করবে।
৫.৬ কেক তৈরি হলে কক্ষ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করবে। তারপর প্যারাফিন কাগজের মোড়কে রাখবে।
৫.৭ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।
৫.৮ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে ।

### ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- কেক ডাইস/ছাঁচ/ফর্মা
- প্যারাফিন কাগজ
- ওভেন / চুলা
- হ্যান্ড মিক্সার
- অয়েল পেপার (Baking paper)

## উপাদান উপকরণ

| ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ | ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ময়দা | ৩০০ গ্রাম | ০৬ | ডিম | ৩৪ টি |
| ০২ | চিনি (পাউডার) | ২৫০ গ্রাম | ০৭ | খাবার লবণ | ৩ গ্রাম |
| ০৩ | দুধ (পাউডার) | ৪০ গ্রাম | ০৮ | বেকিং পাউডার | ৮-১০ গ্রাম |
| ০৪ | তরল দুধ | ১০০ মি.লি | ০৯ | ভ্যানিলা | ০.৫ মি.লি |
| ০৫ | বাটার | ২০০ গ্রাম | ১০ | | |

৪। কেকের ছবি

### ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- একটি পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার ও লবণ মিশাতে হবে।
- বাটার বা মাখনের সাথে ভ্যানিলা যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।
- এর সাথে আস্তে আস্তে চিনি যোগ করে এমনভাবে নেড়ে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ চিনি গলে যায় এবং মিশ্রণ অনেকটা হালকা হয়ে যায়।
- দুধ ও ডিম উপরোক্ত মিশ্রণে যোগ করে এমনভাবে নেড়ে মিশাতে হবে যাতে মিশ্রণটি আরও হালকা হয়।
- প্রথম ধাপে তৈরিকৃত শুষ্ক মিশ্রণ, পরে তৈরি হালকা মিশ্রণে যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।
- কেকের ফর্মা বা ছাঁচে অয়েল পেপার ভরে পরিমাণমতো মিশ্রণ ছাঁচে ঢালতে হবে।
- ১৬০°সে. তাপমাত্রায় ৪০-৪৫ মিনিট ওভেনে তাপ দিতে হবে।
- কেক তৈরি হলে কক্ষ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে প্যারাফিন কাগজের মোড়কে রাখতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

### ৬। বিশেষ নির্দেশনা

জবটি আটবার করতে হবে।

## জব নং-০৬

### ১। জবের নাম: ভুট্টা দানার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ।

### ২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

৬.১ কয়েকটি ভুট্টা দানা সংগ্রহ করবে।
৬.২ আতশি কাঁচ সংগ্রহ করবে।
৬.৩ ভুট্টা দানার বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করবে।
৬.৪ অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।
৬.৫ কাজ শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল সংরক্ষণ করবে।

### ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পাত্র
- প্লাস্টিকের বোল
- আতশি কাঁচ (বড় ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস)
- কিছু তাজা ভুট্টা
- নিডল
- চিমটা
- পেন্সিল
- কাগজ
- রাবার

### ৪। ড্রয়িং বা ডায়াগ্রাম

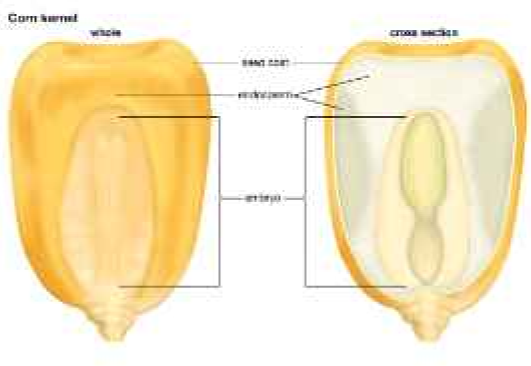


২০২৪

## ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ও বয়সের ভুট্টা সংগ্রহ করতে হবে।
- ভুট্টার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে।
- বীজত্বক ও ফলত্বক মিলে ভুট্টা দানাকে ঘিরে একটি সোনালি অর্ধস্বচ্ছ আবরণ সৃষ্টি করে।
- বীজত্বকের ভিতর সমুদয় অংশটি অন্তর্বীজ বা কার্নেল ।
- অন্তর্বীজের অধিকাংশ জুড়ে থাকে সস্য।
- ভুট্টার ত্বকের উপর ত্রিকোনাকার একটি সাদা অংশ দেখা যায়। এটি ডেলটয়েড অবতল। এ অবতলে ভ্রূণ অবস্থান করে।
- বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ভুট্টার বিভিন্ন অংশের ছবি বড় সাইজের ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে হবে।
- বিভিন্ন জাতের ভুট্টা চিহ্নিত করতে হবে।
- কাগজে বা ড্রয়িং শীটে সনাক্তকৃত বিভিন্ন ভুট্টার চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- ভুট্টা তাজা হতে হবে।
- পরীক্ষণের সময় ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিতে হবে।
- অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস পরিধান করতে হবে।
- ভুট্টার বিভিন্ন অংশ সতর্কতার সাথে পৃথক করতে হবে।
- জবটি ছয়বার করতে হবে।

# জব নং-০৭

## ১। জবের নাম: **ভুট্টার খৈ (Popcorn) তৈরিকরণ।**

## ২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

৭.১ ভুট্টার খৈ (Popcorn) তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৭.২ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

৭.৩ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে ।

৭.৪ বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ ও পপকর্ন মেশিন ব্যবহার উপযোগী কিনা চেক করবে।

৭.৫ পপকর্ন মেশিন পরিচালনা পূর্বক ভুট্টার খৈ তৈরি করবে।

৭.৬ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।

৭.৭ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

### ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পপকর্ন মেশিন
- চুলা
- পাতিল ঢাকনাসহ
- কড়াই

### উপাদান উপকরণ

ভুট্টার দানা-১/২ কাপ

লবণ-সামান্য

মাখন/সয়াবিন তৈল-১ টেবিল চামচ

চাট মসলা-সামান্য

### ৪। ভুট্টার খৈ এর ছবি

### ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রথমে ভুট্টার দানা গুলোকে সামান্য লবণ ও সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে খুব ভালো করে মেখে কিছুক্ষন রেখে দিতে হবে।
- প্রথমে একটি কড়াই বা পাতিল নিয়ে এতে ২ টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিতে হবে।
- চুলা কখনোই হাই হিটে রাখা যাবে না। যখন তেলটা গরম হয়ে যাবে তখন এর মাঝে কিছু পরিমাণ ভুট্টার দানা দিতে হবে।
- তারপর দেখতে হবে ভুট্টার দানা ও তেলের পরিমাপ ঠিক রয়েছে কিনা। যদি ভুট্টার দানা তেলের ভিতরে ডুবুডুবু অবস্থায় থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তেল দেওয়া পারফেক্ট রয়েছে আর যদি না হয় তাহলে এর মাঝে আর একটু তেল দিতে হবে।
- তারপর কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হবে এবং এর উপর একটি ঢাকনা দিতে হবে তা না হলে পপকর্ন গুলো ফুটে বাইরে পড়ে যাবে। এরপর থেকে দু মিনিট অপেক্ষা করলে ফুটে উঠবে ভুট্টার দানা গুলো আর তৈরি হয়ে যাবে মজাদার পপকর্ন ভাজা।
- পপকর্ন ভাজা হয়ে গেলে এর উপর চাট মসলা কিংবা অন্য কোন মসলা ব্যবহার করতে হবে বা বিট লবণও দিতে পারবে।
- এছাড়াও একইভাবে ভুট্টার খৈ ভাজার ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ভূট্টা ভেজে ভুট্টার খৈ তৈরি করতে পরবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

### ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- তেল ও ভুট্টার পরিমাণে যেন সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- জবটি ছয়বার করতে হবে।

## অনুশীলনী-১

### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের উৎপাদিত দানা ফসলের কত ভাগ গম থেকে আসে?

২. নরম ও শক্ত গমে আমিষের পরিমাণ কত?

৩. এন্ডোস্পার্ম ও গমের ভ্রূণকে একত্রে কী বলে?

৪. গমে কোন আমিষের উপস্থিতির কারণে আটা থেকে রুটি, কেক, পাউরুটি ইত্যাদি বানানো যায়?
৫. সংরক্ষণের জন্য গমের আর্দ্রতা কত এর নিচে হওয়া উচিৎ?
৬. গম সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে ভালো পাত্র কী কী?
৭. 'ড্যানেজ' বলতে কী বুঝায়?
৮. গুদামজাত গম ফসলে মোট কতটি পোকা বেশি আক্রমণ করে?
৯. গম কন্ডিশনিং বলতে কী বুঝায়?
১০. গম ভিজালে কতভাগ পানি শোষণ করে গম নরম হয়?
১১. গম মিলিং এর পর ময়দা পেতে কতটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়?
১২. অধিক আবাদকৃত গমের জাতগুলো কী কী?
১৩. ভাঙানোর সময় গমের জলীয় অংশ কত থাকা উচিত?
১৪. গমের ভুসি ছেঁটে বাদ দিলে কয় ভাগ ময়দা পাওয়া যায়?
১৫. ময়দা পানিতে মেশালে যে আঠালো পিণ্ড পাওয়া যায় তার নাম কী?
১৬. সেমাই তৈরি করার মেশিনের নাম কী?
১৭. নুডলস দেখতে কী রকম?
১৮. ভাজা তন্দুর রুটি চুলার ভেতর থেকে কীভাবে বের করা হয়?
১৯. পুরি কাকে বলে?
২০. পুরি ও ডালপুরির মধ্যে পার্থক্য কী?
২১. পরোটা তৈরিতে প্রতি কেজি ময়দায় কতটুকু তেল দিতে হয়?
২২. সাধারণত কয় প্যাঁচ দিয়ে জিলাপি বানানো হয়?
২৩. নেশেস্তার হালুয়া দেখতে কেমন?
২৪. চুল্লিতে কত তাপমাত্রা ও কত সময়ে বিস্কুট তৈরি করা হয়?
২৫. কেক তৈরিতে কত তাপমাত্রায় কতক্ষণ ওভেনে বেকিং করতে হয়?
২৬. পাউরুটিতে ইস্ট কেন দেয়া হয়?
২৭. ভুট্টার অন্তর্বীজ বা কার্নেল কাকে বলে?
২৮. ভুট্টার সস্য বা এন্ডোস্পার্মে কী থাকে?
২৯. ভুট্টার ভ্রূণ কী কী নিয়ে গঠিত?
৩০. ভুট্টায় ক্যারোটিনের পরিমাণ কত?
৩১. ভুট্টার দানায় কত ভাগ তেল থাকে?
৩২. ভুট্টার শস্যদানা গোলাজাত করার সময় আদ্রর্তা কত রাখতে হয়?
৩৩. গুদামঘরে ফসলের জন্য কী ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়?
৩৪. ভুট্টা মিলিং কতভাবে করা যায়?
৩৫. ভুট্টার আটা মিলিং করার পর পরই কী করা উচিত?
৩৬. স্টিপিং বলতে কী বুঝায়?
৩৭. কোন জাতের ভুট্টা পপকর্ন হিসেবে খাওয়া হয়?
৩৮. ভুট্টা পোরিজ মানে কী?

৪০. খৈ ভাজার ভুট্টার আদ্রর্তা কত থাকতে হয়?
৪১. ভুট্টার শুকনা দানাতে কতভাগ স্টার্চ থাকে?
৪২. কর্নফ্লেইরস কী?

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. গমের মৌসুম ও গম দানার বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
২. গম ফসলের ক্ষতিকারক ৫ টি পোকার নাম লেখ।
৩. গম মিলিং এর ৪টি ধাপ কী কী?
৪. নরম ও শক্ত গমের উপকারিতা ও অপকারিতা কী?
৫. ময়দা থেকে সহজেই রুটি বানানো যায় কেন?
৬. গ্লুটেনের প্রয়োজনীয়তা কী?
৭. আটা ও ময়দার মধ্যে পার্থক্য কী?
৮. আটা ও ময়দার পুষ্টিমান লেখ?
৯. সেমাই কীভাবে তৈরি করা হয়?
১০. শিঙাড়া কীভাবে তৈরি করা হয়?
১১. সমুচা ভাজার প্রক্রিয়া লেখ।
১২. গজা ও খাজার মধ্যে পার্থক্য কী?
১৩. সুজির হালুয়া তৈরি করার পদ্ধতি লেখ ।
১৪. বিস্কুট ও কেক তৈরির উপকরণগুলো কী কী?
১০. ভুট্টার তেলের উপকারিতা কী কী?
৩১. ভুট্টার শুকনা মিলিং-এর প্রবাহচিত্র লেখ।
১৭. ভুট্টার ভিজা মিলিং-এর প্রবাহচিত্র লেখ।
১৮. ভুট্টার আটা ও দানাভিত্তিক খাদ্যগুলো কী কী?
১৯. ভুট্টার খৈ ভাজার প্রক্রিয়া লেখ।
২০. ভুট্টার স্টার্চ ও তেল কী কাজে লাগে?
২১. কর্নফ্লেইরস ও কনসিরাপ কীভাবে তৈরি করা হয়?

## রচনামূলক প্রশ্ন :

১. গমের প্রধান ৫টি জাত, মৌসুম ও গম বীজের বিভিন্ন অঙ্গাসমূহ বর্ণনা কর।

২. গম সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৩. গোলাজাত গম ফসলের ক্ষতিকারক ৭টি পোকার নাম এবং যে কোনো ২টি পোকার ক্ষতির বর্ণনা দাও।

৪. গম কন্ডিশনিং ও গম মিলিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৫. গম থেকে কী কী খাদ্য তৈরি হয়? আটা, ময়দা ও সুজির বর্ণনা দাও।

৬. সেমাই, লাচ্ছা সেমাই ও নুডলস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭. আটা ও ময়দার পার্থক্য লেখ। আটা থেকে রুটি, তন্দুর রুটি ও পুরি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. বিস্কুট ও কেক তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯. পাউরুটি তৈরির উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১০. ময়দা থেকে স্যান্ডউইচ, টোস্ট, পিৎজা ও রোল তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১. ভুট্টার শুকনা মিলিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১২. ভুট্টার ভিজা মিলিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১৩. ভুট্টার আটা ও দানাভিত্তিক খাবারগুলো রান্নার নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা কর।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# আখের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও উৎপাদিত খাদ্য

## Introduction to sugarcane, nutrition and food products

আখ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। আখ মানবজাতির জন্য শক্তির একটি পুরাতন উৎস। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো আখ চাষের জন্য উপযোগী। এটিকে দুর্যোগ সহনশীল ফসল বলা হয়, যা খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। আখ এমন একটি ফসল যার কোনো অংশ ফেলে দেয়া হয় না। আখ থেকে আমরা চিনি, গুড়, মোলাসেস (চিটাগুড়/নালি) ও ব্যাগাসী (ছোবড়া) পেয়ে থাকি। আখ একমাত্র ফসল যা ভারী শিল্প ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে আখ । তবে বাংলাদেশে চিনির তুলনায় গুড় তৈরিতে অধিক আখ ব্যবহৃত হয়। গুড় বা চিনি ছাড়াও জৈব জ্বালানি, আঁশ, সার ও বিভিন্ন ধরনের উপজাত দ্রব্য আখ থেকে উৎপাদিত হয়।

### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আখ ও সুগার বিটের পুষ্টিমান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখ থেকে রস নিষ্কাশন করতে পারব।
- আখের রস থেকে গুঁড় তৈরি করতে পারব।

## ২.১ আখ ও সুগারবিটের পরিচিতি:

চিত্র ২.১ আখ গাছ

**আখের পরিচিতি:** আখ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। গাছটি দণ্ডাকৃত , একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। আখ গাছ উচ্চতায় ১.৮-৩.৭ মিটার লম্বা, সম্পূর্ণ দণ্ডটি গিঁটযুক্ত। দণ্ডের রং হাল্কা বেগুনি, সবুজ বা হলদে সবুজ। শিকড় ধান, গম ও ভুট্টার ন্যায় গুচ্ছমূল। চাষের জন্য আখ দন্ডকে টুকরা টুকরা করে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি বীজের টুকরাতে ২-৩টি গিঁট বা চোখ থাকে যা থেকে আখের চারা গজায়।

চিত্র ২.২ সুগারবিট

**সুগারবিট পরিচিতি:** সুগারবিট একটি স্বল্পমেয়াদি শীতপ্রধান দেশের মিষ্টি জাতীয় ফসল। বিশ্বের মোট চিনি উৎপাদনের প্রায় ২৫-৩০ ভাগ সুগারবিট থেকে উৎপাদিত হয়। সর্বাধিক ৫ থেকে ৫.৫ মাসের মধ্যে এটি ফলন দেয়। সুগারবিট থেকে চিনি, গুড়, ইথানল ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও সুগারবিট পাল্প থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদিত হয়। এটি একটি উত্তম পশু খাদ্য এবং জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আখের চেয়ে সুগারবিটের ফলন বেশি এবং চাষাবাদে সময়ও কম লাগে।

## ২.২ আখ ও সুগারবিটের পুষ্টিমান

**আখের পুষ্টিমান:** আখের রসে পানি, চিনি, কিছু পরিমাণ গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, খনিজ পদার্থ ও নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব পদার্থ থাকে। প্রতি ১০০ কেজি আখ থেকে ১০ কেজি গুড় বা ৬ কেজি চিনি পাওয়া যায়। আখের রস, গুড় ও চিনিতে প্রধানত শর্করাই পাওয়া যায়। গুড়ের পুষ্টিমূল্য চিনি অপেক্ষা বেশি, দাম উভয়েরই প্রায় সমান। আখের রস, গুড় ও চিনির খাদ্য উপাদান নিম্নে দেওয়া হলো-

**সারণি ২.১: প্রতি ১০০ গ্রাম আখের রস, গুড় ও চিনির খাদ্য উপাদান:**

| খাদ্য উপাদান | আখের রস | আখের গুঁড় | চিনি |
|---|---|---|---|
| শক্তি (কিলোক্যালরি) | ৩৯ | ৩৮৩ | ৩৯৪ |
| জলীয়অংশ (গ্রাম) | ৯১.৭ | ৩.৯ | - |
| শর্করা (গ্রাম) | ৭.৫ | ৯৫.০ | ৯৯.৭ |
| আমিষ (গ্রাম) | ০.৭ | ০.৪ | - |
| চর্বি (গ্রাম) | ০.০৪ | ০.১ | - |
| খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.০০২ | ০.৬ | - |

### সুগার বিটের পুষ্টিমান

**সারণি ২.২: সুগারবিটের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে):**

| ক্রমিক নং | উপাদানের নাম | পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে) |
|---|---|---|
| ১ | খাদ্য শক্তি | ৪৩ কিলোক্যালরি |
| ২ | শর্করা | ৯.৫৬ গ্রাম |
| ৩ | চর্বি | ০.১৭ গ্রাম |
| ৪ | আমিষ | ১.৬১ গ্রাম |
| ৫ | পানি | ৮৭.৫৮ গ্রাম |
| ৬ | খনিজ পদার্থ | ০.০৪৫ গ্রাম |
| ৭ | ভিটামিন | ০.০০৬ গ্রাম |

## ২.৩ আখের রস নিষ্কাশনের বিভিন্ন ধাপ

**আখের কর্তন:** আখের রসে মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ (TSS) এর পরিমাণ ২০-২২ %। ডিসেম্বর মাসে আখে চিনির পরিমাণ ১২-১৪ % হয়। রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা আখের রসের চিনি পরীক্ষা করে আখ পরিপক্ক হয়েছে কি না দেখে আখ কাটা হয়। পরিপক্ক আখ তাড়াতাড়ি না কাটলে চিনি ও গুড়ের পরিমাণ কমে যায়। আখ কাটার পর পরই মাড়াই করা উচিত। মাড়াইয়ের জন্য মাঠে দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই পোকা ও রোগাক্রান্ত আখ বাদ দিয়ে কাটতে হয়। আখ কাটার সময় দা বা হাঁসুয়া দিয়ে কাটলে আখের প্রায় ৮-১০ ভাগ মাটির নিচে থেকে যায়। তাই দা বা হাঁসুয়া দিয়ে আখ কাটা উচিত নয়। ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে বা সম্ভব হলে একটু মাটির গভীরেই আখের গোড়া কাটা উচিত। আখ কাটার পর পাতা না ছাড়িয়েই মাড়াই স্থানে আনা উচিত। তাতে আখ শুকায় না। তবে আখ মাড়াইয়ের পূর্বে পাতা ছাড়িয়ে যথা সম্ভব পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন যাতে করে আখের রসে ময়লা বা গাদের পরিমাণ কম হয়।

**রস নিষ্কাশন পদ্ধতি বা মাড়াই:** আমাদের দেশে আখ থেকে রস নিষ্কাশন পদ্ধতি দুই ধরনের। যথা-

**ক) পাঁচ রোলার বিশিষ্ট মাড়াই কল:** এটি ৫ রোলার বিশিষ্ট ও দুই স্তরে আখ মাড়াই উপযোগী কল। এই কলে প্রচলিত অন্যান্য মাড়াই কল থেকে শতকরা ১০-১৫ ভাগ বেশি রস আহরণ করা যায়। মাড়াই কলটি একটি ৪ চাকা বিশিষ্ট ১২ ফুট লম্বা ও ৩.৫ ফুট চওড়া মজবুত লোহার ফ্রেমের উপর স্থাপিত। রোলারের মধ্যে আখ প্রবেশ করানো হয় এবং রস নিগড়িয়ে এক প্রান্ত দিয়ে বের হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে ছোবড়া বের হয়। এই মাড়াই কলে ঘন্টায় ৫০০-৫৬০ কেজি আখ মাড়াই করা যায়। অনেক সময় ৩ রোলার বিশিষ্ট মাড়াইকলও ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ২.৩ আখ মাড়াই কল

**খ) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রস আহরণ:** এ পদ্ধতিতে মাড়াই করার জন্য আখ চলমান কনভেয়ার এর উপর রাখা হয়। আখগুলো যেতে যেতে ঘূর্ণায়মান ছুরির সাহায্যে কেটে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। পরে ঐ টুকরাগুলো থেকে পেষণযন্ত্রের সাহায্যে রস বের করা হয়। চিনি তৈরির জন্য এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রস আহরণ করা হয় এবং আহরণের পরিমাণ শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ।

## ২.৪ আখের রস থেকে গুঁড় উৎপাদন

আখ, খেজুর বা তাল গাছের শোধিত বা অশোধিত রস থেকে উৎপাদিত ঘনীভূত তরল বা কঠিন পদার্থকে গুড় বলে। মিঠাই, সন্দেশ, মন্ডা ও পিঠা তৈরিতে গুড়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। গ্রামে আখ চাষিরা নিপুণ কারিগর দিয়ে স্বল্প পরিমাণ গুড় তৈরি করে থাকেন। গুড় উৎপাদন তিনটি ধাপে করা হয়ে থাকে। যথা-

- **রস নিষ্কাশন (Extraction of juice):** এ পদ্ধতি পুর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।
- **রস পরিষ্কারকরণ (Washing of juice):** রস পরিষ্কারকরণের উদ্দেশ্য হলো গুড় থেকে অনাকাঙ্খিত দ্রব্যাদি অপসারণ, গুড়ের রং সুন্দর করা, গুড়কে কঠিন করা ও গুড়ে চিনি ছাড়া অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি রোধ করা। এজন্য কিছু জৈব ও অজৈব পরিষ্কারক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

**ক) জৈব বা উদ্ভিদজাত পরিষ্কারক**

৫০০ গ্রাম বন ঢেঁড়স বা উলট কম্বল গাছের কাণ্ডের নিচের অংশ ও শিকড় পিষে ২ থেকে ২.৫ লিটার পানির মধ্যে দুহাতে ১০-১৫ মিনিট ঘষলে ২-৩ লিটার নির্যাস তৈরি হয় যা দ্বারা রস পরিষ্কার করা যায়। ১৮৫-২২৫ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এক কড়াই বা প্যান আখের রস পরিশোধন করার জন্য ২-৩ লিটার বন ঢেঁড়সের নির্যাস লাগে। অর্থাৎ প্রতি কেজি রসে ১৫-২৫ গ্রাম নির্যাস দিতে হয়।

মান্দার ও শিমুল গাছের ছালের রস একাজে ব্যবহার করা যায়।

ঘৃতকুমারীর উপরের সবুজ খোসা ছুরি দিয়ে তুলে ভেতরের পিচ্ছিল নির্যাস বের করে একাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতি কেজি আখের রসে ১০-১৫ গ্রাম এই নির্যাস দিতে হয়।

### খ) অজৈব বা রাসায়নিক পরিষ্কারকারক

- সাধারণত ১ কেজি রসের সাথে ১ গ্রাম চুনের পানি মিশিয়ে গুড় শক্ত ও পরিষ্কার করা যায়।
- গুড় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করার জন্য সোডিয়াম বাই কার্বনেট ব্যবহার করা যায়।
- সোডিয়াম বাই কার্বনেটের পরিবর্তে পরিষ্কার সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের (৬০:৬.৪:৪.৫) সমন্বয়ে গঠিত যৌগটিও ব্যবহার করা যায়।
- গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য হাইড্রোজ ব্যবহার করা হয়। তবে এর বেশি ব্যবহার ক্ষতিকারক।
- গুড় শক্ত না করে তরল গুড় তৈরির জন্য ফিটকিরি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ২.৪ কড়াইতে আখের রস জ্বালকরণের দৃশ্য

- **রস জ্বাল প্রক্রিয়া (Heating of juice):** বড় কড়াইতে রস জ্বাল দিতে হয়। কড়াইয়ের মাপ ১৮০ সে.মি. লম্বা, ৯০ সে.মি.প্রস্থ. ১৫ সেমি. উচ্চতা হয়। জ্বাল দিলে প্রচুর পরিমানে গাদ ভেসে ওঠে যা দ্রুত হাতা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হয়। এর পর ভেষজ নির্যাস ব্যবহার করতে হয়। এই গাদকে গরু ও মহিষের জন্য ভালো খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

চিত্র ২.৫ আখের গুঁড়

- **রস ঘনীভূতকরণ (Condensation of juice):** ভেষজ নির্যাসে প্রচুর পরিমাণে ভেজিটেবল প্রোটিন আছে, যা উত্তপ্ত রসে ঢেলে দিলে জমাটবদ্ধ হয়ে আশেপাশের ময়লা-আবর্জনাকে আটকিয়ে ধরে গাদে পরিণত হয়ে ভেসে ওঠে। হাতা দিয়ে এই ময়লা গাদ ফেলে দিতে হয়। এতে রস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অধিকতর স্বচ্ছ রসে পরিণত হয় এবং গুড়ের মান ভালো হয়। গাদ সরিয়ে ফেলতে বেশি দেরি হলে রসের সহিত মিশে বেশ অপরিশোধনযোগ্য হয়ে পড়ে এবং গুড়ের মান খারাপ হয়। রস ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- **গুড় তৈরি (Preparation of jaggery):** তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হাতার সাহায্যে কড়াইয়ের ফুটন্ত ঘনীভূত রস লাগাতারভাবে নাড়তে হয় এবং চুলার তাপ কমিয়ে ফেলতে হয়। ফুটন্ত ঘনীভূত রস সিরাপের ন্যায় হলে সামান্য ঘনীভূত রস পরিষ্কার ঠান্ডা পানির মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়। যদি পানির ভিতরে উক্ত রস দ্রুত জমাট বাঁধে এবং ছড়িয়ে না পড়ে তা হলে বুঝতে হবে গুড় চুলা থেকে নামানোর জন্য উপযোগী হয়েছে। এ সময়ে রসের তাপমাত্রা সাধারণত ১০৫-১১০°সে. এ উন্নীত হয়। এ সময়ে ১০০ লিটার রসে ২০মি.লি. নারিকেল তেল মিশালে গুড় ফেটে বা লেগে যায় না বরং গুড়ের দানার আকার ও আকৃতি ভালো হয়। কড়াই চুলা থেকে দ্রুত নামিয়ে রস কিছুটা ঠান্ডা হলে চাহিদামত কাঠের বা পোড়ামাটির ছাঁচে ঘনীভূত ঐ রস ঢালা হয়। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলেই রস ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যায় এবং তা গুড় হিসাবে বিক্রি বা সংরক্ষণ করা যায়।

### উন্নতমানের গুড়ের বৈশিষ্ট্য

- গুড়ের রং হালকা ও এর কাঠিন্যতা বেশি হতে হবে।
- গুড় বেশি দানাদার হবে।
- এর স্বাদ মিষ্টি ও উত্তম গন্ধযুক্ত হবে।
- গুড়ের দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে।

তবে গুড়ের গুণগত মান নির্ভর করে আখের রসের মিশ্রণ, রস জ্বাল দেয়ার পদ্ধতি, রস পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত উপাদানের সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর।

## ২.৫ আখ থেকে চিনি উৎপাদন

নিম্নে আখ হতে চিনির শিল্পোৎপাদনের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

**আখ সংগ্রহকরণ (Collection of sugarcane):** প্রথমে প্রয়োজন অনুসারে আখ সংগ্রহ করে তাকে পরিষ্কার করা হয়।

**আখ হতে রস নিষ্কাশন (Extraction of juice):** পরিষ্কারকৃত আখ ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করার জন্য রোটারি ছুরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। অতঃপর এভাবে প্রাপ্ত আখের ছোট ছোট টুকরোগুলোকে রোল মিলিং এ প্রবেশ করিয়ে চাপের সাহায্যে রস পৃথক করা হয়।

**রস হতে অদ্রবণীয় পদার্থগুলো পৃথকীকরণ (Separation of insolubles from juice):** প্রাপ্ত আখের রসে ধুলোবালি, আঁশ, বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড যেমন-অ্যাসিটিক এসিড ও অন্যান্য অনেক

ধরনের আঠালো (Colloidal) অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। যেহেতু আখের রসে জৈব অ্যাসিড থাকে সেহেতু এ রস অম্লীয় প্রকৃতির। এ কারণেই প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত রসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুনগোলা যোগ করা হয়। এ ছাড়া এ প্রক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য এতে ফসফরিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা হয় এবং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উক্ত মিশ্রণকে ১০০-১০৫°সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। উত্তপ্ত মিশ্রণকে বৃহদাকার ট্যাংকে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে উচ্চ চাপযুক্ত স্টিমের সাহায্যে থিতানো হয়। এরূপে প্রাপ্ত থিতানো রস দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

(ক) পরিষ্কার আখের রস।

(খ) কাদাযুক্ত রস।

অবিরামভাবে ঘূর্ণায়মান ড্রাম ভ্যাকুয়াম ফিল্টার ব্যবহার করে এ কাদাযুক্ত রস হতে পরিষ্কার আখের রস পৃথক করা হয়। অতঃপর এ রস এবং পূর্বের পরিষ্কার রসকে একত্রিত করে বাষ্পকারকে প্রেরণ করা হয়।

**বাষ্পীকরণ (Evaporation):** উপরোক্ত ধাপে প্রাপ্ত রসে কিছু পরিমাণ চুন এবং প্রায় ৮৫% পানি থাকে। আখের রসের পানির পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে একে বাষ্পকারকের সাহায্যে বাষ্পীভূত করলে হালকা হলুদ বর্ণের রস পাওয়া যায় যাতে প্রায় ৪০% পানি থাকে।

**চিনির দানা প্রস্তুতকরণ (Crystallization of sugar):** বাষ্পকারক হতে প্রাপ্ত ৪০% পানিবিশিষ্ট হলুদ বর্ণের রসকে তিনটি সিঙ্গেল ইফেক্ট ভ্যাকুয়াম প্যানেলের প্রথমটিতে প্রেরণ করা হয়। ৩০°C তাপমাত্রায় প্রায় ৮৭% ও ৪০°সে. তাপমাত্রায় প্রায় ৮০% দানা ও সিরাপের মিশ্রণ পাওয়া যায়। চিনির দানাবিশিষ্ট এ মিশ্রণ ম্যাসেকুইট **(massecuite)** নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এ ম্যাসেকুইটকে ক্রিস্টালাইজারে প্রেরণ করা হয়।

**দ্রবণ হতে চিনির দানা পৃথকীকরণ (Separation of sugar crystal from solution):** চিনি উৎপাদনের এ ধাপে ম্যাসেকুইট থেকে সিরাপকে অপসারণের জন্য সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। ফলে চিনির দানা ও তরল সিরাপ পৃথক হয়ে যায়। সেন্ট্রিফিউজ করার পর প্রাপ্ত চিনিকে কাঁচা চিনি বলে।

**শুষ্ককরণ (Drying):** কাঁচা চিনির দানাগুলোকে শুষ্ক করার উদ্দেশ্যে গ্র্যানুলেটরে প্রেরণ করা হয়। এরূপে প্রাপ্ত ছোট বড় শুষ্ক চিনির দানাগুলোকে বিভিন্ন আকারের এক সারি চালুনি (Seive/screen) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে চিনি গ্রেডিং করা হয়। ফলে ছোট দানাসমূহ বড় দানাগুলো থেকে পৃথক হয়। পরিশেষে শুষ্ক চিনি বাজারজাত করা হয়।

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

১। জবের নাম: **আখ থেকে রস নিষ্কাশন।**

২। পারদর্শিতার মানদন্ড:

১.১ কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করবে।

১.২ কাজের জায়গা প্রস্তুত করবে।

১.৩ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।

১.৫ বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ এবং আখ মাড়াই ও রস নিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহার উপযোগী কি-না চেক করবে।

১.৬ পরিপুষ্ট, সতেজ, রোগ ও ত্রুটিমুক্ত আখ বাছাই করে মাড়াই করার ব্যবস্থা করবে ।

১.৭ আখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে ছিলে নিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহার করে আখের রস পাত্রে/মগে সংগ্রহ করবে ।

১.৮ পরিষ্কার ছাঁকনি দিয়ে রস ছেঁকে নিবে।

১.৯ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।

১.১০ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

১.১১ কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পাত্র/ মগ
- প্লাস্টিকের বোল

- পরিষ্কার ছাকনি।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাড়াই যন্ত্র
- রস সংগ্রহের পরিষ্কার পাত্র।
- পরিষ্কার গ্লাস।
- ট্রে।

**উপকরণ:**

- বাছাইকৃত পরিপুষ্ট রোগমুক্ত আখ ।

## ৪। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- পরিপুষ্ট, সতেজ, রোগ ও ত্রুটিমুক্ত আখ বাছাই করে নিতে হবে।
- আখ সংগ্রহ করার পর পরই মাড়াই করার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা আখ রোদে ফেলে রাখলে বা দেরিতে মাড়াই করলে রসের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

চিত্র ২.৬ ছিলা/খোসা ছাড়ানো আখ

চিত্র ২.৭ আখ মাড়াই কল ও আখের রস

- আখ ভালো করে পরিষ্কার করে ছিলে নিতে হবে।
- ছিলা আখ নিষ্কাশন যন্ত্রের চলন্ত দুই রোলারের মাঝ দিয়ে প্রবেশ করালে আখ থেকে রস বের হয়ে নিচে পড়বে। নিচে একটি টিনের প্লেট এমনভাবে বসানো থাকে যাতে সব রস মগের মধ্যে সংগৃহীত হয়।
- মাড়াই করার পর রস সংগ্রহ করে পরিষ্কার ছাঁকনি দ্বারা ছেঁকে তাড়াতাড়ি পরিবেশন করতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

## ৫। বিশেষ নির্দেশনা

- রস হিসেবে খাওয়া আখ পরিপুষ্ট ও নির্দোষ হতে হবে।
- আখ কাটার পর রোদে ফেলে রাখা যাবে না।
- আখের রস বেশি দেরি করে পরিবেশন করলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় ।
- আখের রস গরম স্থানে রাখলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।
- জবটি ছয়বার করতে হবে।

## জব নং-০২

### ১। জবের নাম: **আখের রস থেকে গুড় তৈরিকরণ।**

### ২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

২.১ আখের রস থেকে গুড় তৈরির পুর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
২.২ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
২.৩ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।
২.৪ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে আখের রস থেকে গুড় তৈরি করবে।
২.৯ গুড় তৈরির উপযোগী হলে ঠান্ডা করে নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালবে।
২.১০ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।
২.১১ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

### ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- রস নিষ্কাশন যন্ত্র
- কড়াই
- ছাঁকনি

**উপকরণ:**

- সতেজ ও পুরিপুষ্ট আখ।
- রস পরিষ্কারক (উদ্ভিদজাত বা রাসায়নিক)

- গুড় তৈরির উপযোগী চুলা।
- ঘনীভূত সিরাপ ঘষার হাতা ।
- মাটির পাত্র বা তাওয়া।
- গুড় ঢালার কাঠের পাত্র বা ফর্মা বা ছাঁচ।
- পানি/ নারিকেল তেল
- চামচ
- কাপড় বা ন্যাকড়া

চিত্র ২.৮ আখের গুড় তৈরির ছবি

চিত্র ২.৯ আখের গুড়

**৪। কাজের ধারা :**

- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করতে হবে।
- প্রথমে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সতেজ ও পরিপুষ্ট আখ মাড়াই করে রস বের করে নিতে হবে।
- কাপড়ের সাহায্যে রস ছেঁকে নিলে বাহ্যিক ময়লা পরিষ্কার হবে।
- ছাঁকার পর এ রস কড়াইতে নিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- রসের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য রসের সাথে রস পরিষ্কারক মিশাতে হবে।
- রস জ্বাল দেয়ার সময় যাতে উতলে না পড়ে সেজন্য কয়েক ফোঁটা নারিকেল তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। রস কড়া জ্বালে জ্বাল দিয়ে ঘন সিরাপের ন্যায় করতে হবে। তবে জ্বাল দেওয়ার সময় মাঝে মাঝেই রসের ময়লা বা গাদ ছেঁকে উঠাতে হবে। এর ফলে গুড়ের রং পরিষ্কার হবে।
- রস জাল দিয়ে ঘন হতে থাকলে প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট বুদ বুদ হবে।
- রস যখন ঘন সিরাপের ন্যায় হতে থাকবে তখন বড় বড় বুদ বুদ হবে। সিরাপ ঘন হওয়ার সময় বার বার কড়াইতে নাড়াচাড়া করতে হবে। তা না হলে পাত্রের তলদেশে বা গায়ে সিরাপ পুড়ে লেগে যেতে পারে।

- রস বা সিরাপ ঘন হয়ে গুড় তৈরির উপযোগী হয়েছে কিনা তা পানিতে ফোটা আকারে ঢেলে পরীক্ষা করে নিতে হবে। এক ফোটা সিরাপ ঠান্ডা পানির মধ্যে ফেললে যদি তা পাত্রের তলায় বসে যায় বা জমে যায় তাহলে বুঝতে হবে সিরাপ গুড় তৈরির উপযোগী হয়েছে।
- সিরাপ গুড় তৈরির উপযোগী হলে নাড়াচাড়া করে প্রায় ঠান্ডা করে নির্দিষ্ট টিনে বা মটকায় বা ছাঁচে ঢালতে হবে। তবে অনেক সময় কড়াই হতে অন্য কোন পাত্রে সিরাপ ঢেলে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে সংরক্ষণ পাত্রে ঢালতে হয়।
- এছাড়া গুড় জমিয়ে আকৃতি দিতে হলে ঘন সিরাপ মাটির পাত্রে বা তাওয়ায় বা ছাঁচে নিতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা:

- রস জ্বাল দেয়ার সময় বারবার গাদ উঠাতে হয়। তা না হলে গুড়ের রং খারাপ হয়।
- রস বা সিরাপ ঘন ঘন নাড়াচাড়া করতে হয়, অন্যথায় সিরাপ পুড়ে পাত্রের গায়ে লেগে যেতে পারে।
- সিরাপ খুব গরম থাকা অবস্থায় পাত্রে ঢালা উচিত নয়।
- জবটি ছয়বার করতে হবে।

# অনুশীলনী-২

## অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. আখ কী ধরনের ফসল?

২. কোন যন্ত্র দ্বারা আখের চিনি পরিমাপ করা হয়?

৩. প্রতি ১০০ কেজি আখ থেকে কতটুকু চিনি ও গুড় পাওয়া যায়?

৪. গুড় কাকে বলে?

৫. চিনি ও গুড়ের মধ্যে কার পুষ্টিমূল্য বেশি?

৬. গুড় পরিষ্কার করার জন্য জৈব পরিষ্কারকগুলো কী কী?

৮. গুড়ে ব্যবহৃত অজৈব পরিষ্কারক কী কী?
৯. গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য কী দেয়া হয়?
১০. গুড় থেকে বের করা গাদ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
১১. গুড়ের গাদ ফেলতে দেরি হলে কী ঘটে?
১২. আখের রসের সকল অবাঞ্ছিত দ্রব্য কীভাবে দূর করা হয়?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:**

১. আখের রস, গুড় ও চিনির পুষ্টিমান তুলনা কর।
২. সুগার বিটের পুষ্টিমান উল্লেখ কর।
৩. গুড় উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলো কী কী?
৪. পরিষ্কারের জন্য অজৈব পরিষ্কারকগুলো কী হারে ব্যবহার করা হয়?
৫. উন্নতমানের গুড়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৬. আখ হতে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কী কী?

**রচনামূলক প্রশ্ন:**

১. আখের পরিচিতি ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
২. সুগারবিটের পরিচিতি ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
৩. 'গুড়ের পুষ্টিমান আখ থেকে বেশি'- ব্যাখ্যা কর।
৪. আখের রস থেকে গুঁড় তৈরিকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৫. আখের রস থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

## তৃতীয় অধ্যায়

# মসলার পরিচিতি, পুষ্টিমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

# Introduction to spices, nutrition, processing and preservation

খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের সুখ্যাতি রয়েছে। মসলা (Spices) হলো খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াতে ব্যবহার্য কোনো উদ্ভিদ, উদ্ভিদের অংশ বা ফুল, ফল ও বীজ। সুগন্ধ ও উদ্বায়ী তৈল থাকার জন্যই মসলার কদর। খাদ্যের স্বাদ বাড়াতে সহায়তা করলেও মসলা কোনো খাদ্য নয়, এগুলির তেমন পুষ্টিমান নেই। গ্রীষ্মমন্ডলীয় কিছু উদ্ভিদ থেকেই প্রধানত মসলা সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে সাধারণত আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ধনিয়া, মেথি, গুয়ামুরি, কালিজিরা ইত্যাদি মসলার চাষ হয়। প্রতি বছর দেশের আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল পরিমানে বিভিন্ন মসলা তাদের ঔষধের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- **মসলা**র পুষ্টিমান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন **মসলা**র গুঁড়া প্যাকেটজাত করতে পারব।

## ৩.১ বিভিন্ন মসলার নাম, চাষ মৌসুম ও জাত

ভারতীয় উপমহাদেশকে একসময় মসলার দেশ বা সুগন্ধি গাছের দেশ বলা হতো। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশই নয়, এশিয়া মহাদেশজুড়ে ছিল মসলা ও সুগন্ধি গাছপালার প্রাচুর্য। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ প্রজাতির সুগন্ধি গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ মসলাই রবি মৌসুম বা শীতকালে জন্মে থাকে। নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা কম থাকে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সেচের দরকার হয়। শীতকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে, বৃষ্টিবাদল কম হয় এবং রোগবালাই কম হয় বলেই মসলা চাষের উপযোগী হয়। তবে কিছু কিছু মসলা আছে যেগুলো সারা বছরই জন্মে থাকে।

### ৩.১.১ বিভিন্ন প্রকার মসলার নাম ও চাষ মৌসুম:

| ক্র: নং | মসলার নাম | চাষ মৌসুম |
|---|---|---|
| ১ | পেঁয়াজ | তিন মৌসুমে, খরিফ-১-আগাম জাত<br>খরিফ-২- নাবি জাত<br>রবি মৌসুম- শীতকালীন জাত |
| ২ | রসুন | রবি মৌসুম- (অক্টোবর হতে মার্চ পর্যন্ত) |
| ৩ | মরিচ | সারা বছর |
| ৪ | মিষ্টি মরিচ | রবি মৌসুম- (অক্টোবর হতে মার্চ পর্যন্ত) |
| ৫ | হলুদ | সারা বছর (মার্চ-জানুয়ারি) |
| ৬ | আদা | সারা বছর (মার্চ-জানুয়ারি) |
| ৭ | ধনিয়া | রবি মৌসুম- (অক্টোবর/নভেম্বর-মার্চ) |
| ৮ | মৌরি | রবি মৌসুম- (অক্টোবর/নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) |
| ৯ | মেথি | রবি মৌসুম- (নভেম্বর-এপ্রিল) |
| ১০ | কালিজিরা | রবি মৌসুম- (অক্টোবর-মার্চ) |
| ১১ | রাঁধুনি | রবি মৌসুম- (সেপ্টেম্বর/নভেম্বর-মার্চ) |
| ১২ | তেজপাতা | সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল) |
| ১৩ | দারুচিনি | সারা বছর (জুন/জুলাই-এপ্রিল) |
| ১৪ | গোলমরিচ | সারা বছর (মে/জুন-জানুয়ারি) |
| ১৫ | পাতা পেঁয়াজ | সারা বছর |
| ১৬ | আলু বোখারা | ফেব্রুয়ারি-জুন |

### ৩.১.২ বিভিন্ন মসলার জাত

বাংলাদেশে সাধারণত ২৭ প্রকার মসলা ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে ১৭ প্রকার মসলা ফসল হিসাবে চাষাবাদ করা হয়। দেশে আবাদকৃত মসলাগুলো হলো: মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া, মৌরি, কালিজিরা, তেজপাতা, মেথি, গোলমরিচ ইত্যাদি।

**মরিচ:** ঝাল ও মিষ্টি দুই ধরনের মরিচ পাওয়া যায়। ঝাল মরিচের মধ্যে বগুড়া, চাঁদপুরী, ফরিদপুরী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কামরাংগা, আকালী ও কালো মরিচ খুব ঝাল।

**পেঁয়াজ:** স্থানীয় জাত যেমন তাহেরপুরী, স্বর্ণলাটিম ও ফরিদপুরী-OP চাষ করা হয়।

**রসুন:** স্থানীয় জাত চাষ করা হয়।

**হলুদ:** ডিমলা ও সিন্দুরী নামে বাংলাদেশে দু'টি উন্নত জাতের হলুদ রয়েছে। ডিমলা জাতটি স্থানীয় জাতের তুলনায় ৩ গুণ বেশি ফলন দেয়।

**আদা:** স্থানীয় জাত যেমন-রংপুরী, খুলনা, টেংগুরা ইত্যাদি জাত চাষ করা হয়।

**গোল মরিচ:** স্থানীয় জাতের গোলমরিচ চাষ করা হয়।

**সারণি ৩.১: মসলা গবেষণা কেন্দ্র (বারি, গাজীপুর) কর্তৃক উদ্ভাবিত মসলার জাতসমূহ**

| ক্রঃ নং | জাতের নাম | উৎপাদনের মৌসুম | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| ১ | বারি মরিচ-১ | সারা বছর | কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনীয়। |
| ২ | বারি মরিচ-২ | গ্রীষ্মকালীন | প্রতিটি মরিচের দৈর্ঘ্য গড়ে ৭ সেন্টিমিটার ও ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম। |
| ৩ | বারি মরিচ-৩ | শীতকালীন | মরিচের ফল (গড়) লম্বা আকৃতির, দৈর্ঘ্য গড়ে ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন গড়ে ৩.০ গ্রাম। |
| ৪ | বারি পেঁয়াজ-১ | শীতকালীন | কন্দের আকার চ্যাপ্টা, গোলাকার, বোঁটা চিকন, মধ্যমাকৃতির, লালচে পাটল বর্ণের এবং অধিক ঝাঁঝযুক্ত। |
| ৫ | বারি পেঁয়াজ-২ | গ্রীষ্মকালীন | কন্দ গোলাকার এবং লালচে বর্ণের। কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়। |
| ৬ | বারি পেঁয়াজ-৩ | গ্রীষ্মকালীন | কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়। |
| ৭ | বারি রসুন-১ | শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ) | এই জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। |
| ৮ | বারি রসুন-২ | শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ) | এই জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। |
| ৯ | বারি হলুদ-১ | এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি | রং গাঢ় হলুদ। |
| ১০ | বারি হলুদ-২ | এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি | রং গাঢ় হলুদ। |
| ১১ | বারি হলুদ-৩ | এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি | রং গাঢ় হলুদ। |
| ১২ | বারি আদা-১ | এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি | জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। |
| ১৩ | বারি ধনিয়া-১ | শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ) | বীজগুলো হরিদ্রা বর্ণের মাঝারি আকারের। পাতা ও বীজ উভয়ই ব্যবহার্য। |
| ১৪ | বারি কালিজিরা-১ | শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ) | প্রতি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.০০-২.২৫ গ্রাম। |

২০২৩

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫ | বারি মেথি-১ | শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ) | বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামি বর্ণের। |

## ৩.২ মসলার শ্রেণিবিভাগ

খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদজাত দ্রব্য খাদ্য তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করা হয় সাধারণত তাদেরকেই মসলা বলে। প্রকারভেদে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, রূপান্তরিত কাণ্ড, কাণ্ডের বাকল, পাতা, ফুল, ফুলের পাপড়ি এবং ফল বা বিচি মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সকল প্রকার মসলাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) স্পাইসেস (Spices)

(খ) কন্ডিমেন্টস (Condiments) ও

(গ) কালিনারি হার্ব (Culinary herb)

**(ক) স্পাইসেস:** খাদ্য রান্না করার সময় খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করতে এবং খাদ্যকে আকর্ষণীয়, সুগন্ধিযুক্ত ও রঙিন করতে যেসকল উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ প্রধান খাদ্যের সাথে যোগ করা হয় সেগুলোকে স্পাইসেস বলে। যেমন- কাঁচামরিচ, শুকনা মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন ইত্যাদি।

চিত্র ৩.১ স্পাইসেস শ্রেণির মসলা

**(খ) কন্ডিমেন্টস:** খাদ্যকে সুগন্ধিযুক্ত, আকর্ষণীয়, ও বিশেষ ঘ্রাণ সমৃদ্ধি করার জন্য রান্নার শেষ পর্যায়ে বা রান্নার পর যেসকল উদ্ভিদজাত দ্রব্য মিশানো হয় তাদের কন্ডিমেন্টস বলে। যেমন-এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ, জিরা ইত্যাদি।

এলাচ

দারুচিনি

তেজপাতা

গোলমরিচ

জিরা

চিত্র ৩.২ কন্ডিমেন্টস শ্রেণির মসলা

**(গ) কালিনারি হার্ব:** যেসব উদ্ভিদজাত দ্রব্য রান্নার পর পরিবেশনের পূর্বেই খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য এবং খাবার বা খাবারের টেবিল দৃষ্টিনন্দন করার জন্য যেসব খাদ্যে যোগ করা হয় তাদেরকে কালিনারি হার্ব বলে। যেমন- ধনিয়া পাতা, বিলাতি ধনিয়া, পাতা পেঁয়াজ, কারিপাতা, পুদিনা পাতা, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি।

চিত্র : পুদিনা পাতা

চিত্র : ধনিয়া পাতা

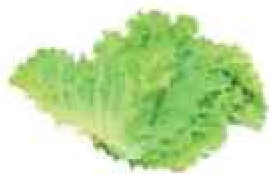

চিত্র : লেটুস পাতা

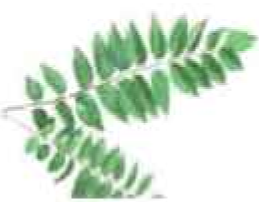

চিত্র : কারি পাতা

চিত্র : ক্যাপসিকাম

চিত্র : পাতা পেঁয়াজ

চিত্র ৩.৩ কালিনারি হার্ব শ্রেণির মসলা

২০২৩

## ৩.৩ মসলার পুষ্টিমান

আমরা যেসব মসলা খাদ্যে ব্যবহার করে থাকি তন্মধ্যে কয়েকটি বেশ পুষ্টিগুণসম্পন্ন। যেসকল মসলা খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বৃদ্ধি করে কিন্তু রং সৃষ্টি করে না সেগুলোকে ফ্লেভোনয়েডস (Flavonoids) বলে। পুষ্টিমানের দিক দিয়ে প্রধান কিছু কিছু মসলার পুষ্টিমূল্য জানা থাকলেও বেশিরভাগ গৌণ মসলার পুষ্টিমানের বিষয়ে এখন তেমন কিছু কথা জানা যায় নি। তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গুণাগুণ রক্ষার্থে এদেরকে বেশি ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার আচার, চাটনি, কেচাপ, মোরব্বা প্রভৃতি তৈরিতে ও এগুলো সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি করতে সাধারণত এসব মসলা ব্যবহার করা হয়। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন মসলার পুষ্টিমান দেখানো হলো:

**সারণি ৩.২: বিভিন্ন মসলা ফসলের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)**

| ক্রঃ নং | মসলার নাম | জলীয় অংশ (গ্রাম) | প্রোটিন (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | খনিজ পদার্থ (গ্রাম) | ভিটামিন এ (আই. ইউ) | ভিটামিন সি (মি. গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | পেঁয়াজ | ৮৮ | ১.৪ | ০.৮ | ৮.০ | ০.৪ | - | ১১ |
| ২ | রসুন | ৬২ | ৬.৩ | ০.১ | ২১.৮ | ১.০ | - | ১৩ |
| ৩ | মরিচ (কাঁচা) | ৮২.৬ | ২.৯ | ০.৬ | ৬.১ | ১.০ | ৪৫৪ | ১১১ |
| ৪ | মরিচ (শুকনা) | ১০.০ | ১৫.৯ | ৬.২ | ৩১.৬ | ৬.১ | ৫৭৬ | ৫০ |
| ৫ | আদা | ৮০.০ | ২.৩ | ০.৫ | ১২.৩ | ১.২ | ১৭৫ | ১২ |
| ৬ | হলুদ | - | ৬.৩ | ৫.১ | ৬৯.৪ | ৩.৫ | ১৭৫ | ৪৯.৮ |
| ৭ | ধনিয়া | ১১.২ | ১৪.১ | ১৬.১ | ২১.৬ | ৪.৪ | ১৭৫ | ১২.০ |
| ৮ | জিরা | ১১.৯ | ১৮.৭ | ১৫.০ | ৩৬.৬ | ৫.৮ | ১৭৫ | ১৭.২ |
| ৯ | মেথি | ৬.৩ | ৯.৪ | ১০ | ৪২.৩ | ১৩.৪ | - | - |
| ১০ | আলু বোখারা | - | - | - | - | ১২ | ৫ | ১৩ |
| ১১ | ধনিয়া পাতা | ৮৮ | ৩.২ | - | ৬.০ | ২ | ৭০০০ | ১২০ |
| ১২ | পুদিনা পাতা | ৮৬ | ৩.৫ | - | ৩.৪ | ১.৬ | ১৬০০ | ২৬ |
| ১৩ | লেটুস পাতা | ৯৪ | ২.০ | - | ২.৫ | ০.৫ | - | ১০ |
| ১৪ | মৌরি | ১৩ | ১৮ | - | ৮.২৩ | ৫ | - | - |

## ৩.৪ ও ৩.৫ মসলা শুকানো ও সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বীজ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সংগ্রহের পরবর্তী ৩ থেকে ১২ মাস সময়ের মধ্যে নষ্ট না হয়ে যায়। কারণ এ সময়ের আগে বীজ সাধারণত ফসল উৎপাদনের জন্য বপন করা হয় না। নিম্নে প্রধান প্রধান মসলা ফসলের শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

**মরিচ:** কাঁচা মরিচ স্বাভাবিক পরিবেশে ২-৩ দিন রাখা যায়। তবে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলে ৫-৭ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। কাঁচা মরিচে পানি দেয়া যাবে না। তাতে মরিচ পচে যাবে। কাঁচা মরিচ ৩৫°সে.

২০২০

ও ৯৫-৯৮% আর্দ্রতায় ৪০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ রাখা যায়। সংরক্ষণের জন্য পাকা মরিচ বোটাসহ তুলে ৩-৪ দিন ঘরে রাখতে হয়। এতে করে মরিচের কিছুটা কাঁচা ভাব থাকলেও সেগুলো ঠিকমতো পেকে যায় এবং লাল রং ধারণ করে। সংরক্ষণের জন্য কাঁচা ও আধাপাকা মরিচ তোলা হলে শুকানোর সময় তা নষ্ট হয়ে যায়। বাঁশের চাটাই বা পাটি বা পাকা ছাদের উপর ৮-১০দিন ধরে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পাকা মরিচ কড়া রোদে শুকাতে হয়। পাকা মরিচ হতে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ শুকনা মরিচ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১০০ কেজি পাকা মরিচ হতে ২৫-৩০ কেজি শুকনা মরিচ পাওয়া যায়। মরিচ ঠিকমত শুকানো হলে হাত দিয়ে চাপ দিলে মচমচ করবে এবং ভেঙে যাবে। পাকা মরিচ ৪-৫ দিন শুকানোর পর মরিচের উপর কাঠের তক্তা বা ভারী কিছু জিনিস দিয়ে চাপ দিলে মরিচগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এতে মরিচ সংরক্ষণের সুবিধা হয় এবং অল্প স্থানে বেশি মরিচ রাখা যায়। মরিচ শুকানোর পর ঠান্ডা করে পলিব্যাগ বা চটের বস্তায় রাখা যায়। মরিচ শুকানোর সময় বৃষ্টি হলে চুলার তাপেও মরিচ শুকানো যায়। মরিচকে রোদ বা চুলার তাপে যেখানেই শুকানো হোক না কেন বারবার ওলটপালট করে দিতে হয়। তাতে সমানভাবে মরিচের সবদিক শুকাতে পারে। শুকনা মরিচের বোঁটা ছিঁড়ে মেশিনে ভাঙিয়ে মরিচের গুঁড়া তৈরি করা হয়।

**হলুদ:** মাটি হতে হলুদ তোলার পর হলুদের গায়ের মাটি ও শিকড়গুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। একটি পাত্রে হলুদ ও পানি ভর্তি করে ৩০-৪০মিনিট জ্বাল দিতে হবে। জ্বাল দেওয়ার সময় পাত্রের পানি দুইবার ফুটে উঠলে হলুদ সিদ্ধ হবে। ২/১টি হলুদ ভেঙে ইটের মতো রঙ দেখা গেলে হলুদ সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে হবে। তবে হলুদের গায়ের রঙ কালচে হওয়া পর্যন্ত হলুদ সিদ্ধ করতে হবে। হলুদ সিদ্ধ হলে হলুদগুলো ছেঁকে তুলে নিতে হবে এবং এই জ্বালের গরম পানি পুনরায় হলুদ সিদ্ধের কাজে লাগাতে হবে। সিদ্ধ করা মোটা হলুদ কেটে ফালি করে পাতলা করতে হবে। সিদ্ধ হলুদ ৩-৪ সপ্তাহ রোদে শুকাতে হবে। প্রথম সপ্তাহে শুকানোর সময় প্রত্যহ ৩-৪ বার উলটপালট করে দিতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে দিনে ২ বার হলুদে ঘষা দিতে হয়। এর ফলে হলুদ গোলাকার পেন্সিলের মতো হবে। হলুদ ঠিকমত না শুকালে গুঁড়া করা যাবে না। হলুদ ভালোভাবে শুকানোর পর ভেঙে দেখলে পাথরের মতো দেখাবে ও শক্ত জিনিসের সাথে আঘাত করলে টনটন শব্দ হবে। এছাড়া হলুদের রং সুন্দর করার জন্য চটের বস্তায় ভরে বার বার আছাড় দেওয়া হয় বা লাঠি দিয়ে পিটানো হয়। এতে হলুদের রং উজ্জ্বল হয়। অতঃপর হলুদ বস্তায় ভরে উঁচু মাচায় বা গোলাঘরে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

**আদা:** আদাকে দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়, যেমন-বাকলসহ ও বাকলবিহীনভাবে সংরক্ষণ। বাকলসহ আদা আবার দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায় যেমন-বালুতে সংরক্ষণ ও শুকিয়ে সংরক্ষণ। বাকলসহ বালুতে সংরক্ষণের জন্য মাটিতে গর্ত করে তাতে আদা ও বালু ১:১ অনুপাতে গর্ত ভর্তি করে বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গর্তে যেন পানি প্রবেশ না করে এজন্য ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বাকলবিহীন আদা দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায় যথা- শুকানো বা Cured আদা এবং প্রক্রিয়াজাত বা কাঁচা আদা (Raw ginger)। শুকানো আদা তৈরিতে আদার বাকল ফেলে রোদে শুকানো হয়। খোসা

২০২৩

ছাড়াবার পূর্বে আংশিক সিদ্ধ করে নিতে হয়। ইহাকে কালো আদা বলে। তবে আদাকে ব্লিচিং করে নিলে তা সাদা আদায় পরিণত হয়।

**গোলমরিচ:** আমরা বাজারে যে কালো গোলমরিচ মসলা হিসেবে দেখি তা গাছের শুকনো অপরিপক্ক ফল। ফল সংগ্রহ করার পর ৮-১০ দিন রোদে শুকালে ফল কিঞ্চিত কুঁচকে গিয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে এটাই গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পিপার নামে পরিচিত ১০০ কেজি কাঁচা ফল হতে ৩০-৩৫ কেজি কালো গোলমরিচ ও ২৬-২৭ কেজি সাদা গোলমরিচ পাওয়া যায়। শুকানো গোলমরিচ হাতে চাপ দিলে শক্ত লাগে। এ মরিচ দাঁতে চাপ দেওয়ার পর পুটপুট শব্দ করে ফেটে গেলে বুঝতে হবে ঠিকমত শুকানো হয়েছে।

**দারুচিনি:** সাধারণত ৩-৪ বছর বয়সের দারুচিনি গাছ থেকে দারুচিনি সংগ্রহ করা যায়। প্রথমে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আঙ্গুলের চেয়ে মোটা ডাল কেটে দুই ফালি করে ছাল ছড়ায়ে আলাদা করা হয়। ছাল বা বাকলই দারুচিনি মসলা। বাকলগুলো জমা করে মোটা কাপড় বা বস্তা দিয়ে স্তূপ করে ঢেকে পচানো হয়। পরে ছুরি দিয়ে বাহিরের ত্বক চেঁছে ফেলা হয়। তারপর বাকলগুলো ৩-৪ দিন রোদে ভালো করে শুকানো হয়। শুকানোর পর বাকলগুলো চোঙ্গার আকার ধারণ করে যাকে কুইল বলে। এই অবস্থায় দারুচিনি মসলা হিসাবে ব্যবহার বা বস্তাবন্দি করে বাজারজাত করা হয়।

**ধনিয়া:** ধনিয়া পাকলে হাতে নিয়ে ঘষা দিলে সহজেই ভেঙে দুই টুকরা হবে। এ অবস্থায় ধনিয়ার গাছ তুলে রোদে ভালোভাবে শুকায়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করতে হয়। মাড়াই করা বীজ আলাদা করে পরিষ্কার করে রোদে ভালোভাবে শুকাতে হয়। ধনিয়ার আর্দ্রতা ৫-৬.৫ % এ নেমে আসলে বীজগুলো হাতে নিয়ে চাপ দিলে মচমচ শব্দ করবে। এছাড়া দাঁতের নিচে চিবুলে মচমচ শব্দ করবে এবং সময় মুড়ির ন্যায় গুঁড়া হয়ে যাবে। শুকনা ধনিয়া ঠান্ডা করে চটের ব্যাগ বা পলি ব্যাগে ভর্তি করে উঁচুতে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে রাখতে হয়।

**রসুন:** পেঁয়াজের চাইতে রসুন সংরক্ষণ করা সহজ। রসুন মাঠ হতে তোলার পর আস্ত গাছসহ ২/১ দিন জমা করে রাখা হয়। পরবর্তীতে রসুনের শিকড় কেটে ৪-৫ দিন ছায়ায় শুকাতে হয়। অনেক সময় গাছ ও শিকড় কেটে ১ দিন রোদে শুকায়ে ধুলোবালি ঝেড়ে আলোবাতাসযুক্ত স্থানে রাখা হয়। শুধু শিকড় কাটা শুকানো রসুনের গাছগুলো মুঠি আকারে বেঁধে রশিতে বা বাঁশের সাথে ঝুলায়ে রাখা যায়। প্রক্রিয়াজাতকরন রসুন সংরক্ষন করা যায়। যেমন- লবণ রসুন, রসুনের পাউডার, রসুনের সস ও রসুনের আচার ইত্যাদি।

## ৩.৬ বিভিন্ন প্রকারের মসলা মিলিং

- **হলুদ:** হলুদ সিদ্ধ করা ও শুকানোর পর পলিশিং করা হয়। এতে হলুদের ত্বক মসৃণ ও আকর্ষণীয় হয়। তারপর হলুদের সাথে 'সরিষা ফুল' মিশায়ে আরও আকর্ষনীয় করার পর মিলিং করা হয়। অনেক সময় সরিষার পেস্ট তৈরি করে তাতে পলিশ করা হলুদ সংরক্ষণ করা হয়।

**পেস্ট (Paste) তৈরি:** সর্বপ্রথম কাঁচা হলুদের সংগ্রহ, পরিষ্কার ও বাছাই করতে হবে। পরে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ধারালো চাকু বা ছুরি দিয়ে হলুদের ছাল বা বাকল তুলে ফেলতে হবে। হলুদের এনজাইমেটিক কার্যকারিতা দূর করার জন্য সসপ্যান বা পাতিলে ১ ঘন্টা ব্লাঞ্চিং (Blanching) বা সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ হলুদ চপার মেশিন (Chopper Machine) বা শিল-পাটায় অর্ধপেষা করে নিতে হবে। অর্ধপেষা হলুদকে ব্লেন্ডার মেশিনে পানি ও পেষা হলুদ ১:৪ অনুপাতে মিশিয়ে হলুদের পেস্ট তৈরি করতে হবে। হলুদ পেস্টের সাথে ০.৫% সাইট্রিক এসিড যোগ করে pH ৬ হতে ৪ এ নামিয়ে আনতে হবে। সংরক্ষক (Preservative) হিসেবে সোডিয়াম বেনজয়েট (১ গ্রাম/কেজি হলুদ পেস্ট) সামান্য হালকা গরম পানির সাথে গুলিয়ে পেস্টের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে তৈরি হলুদ পেস্ট পলিথিন ব্যাগ বা কাঁচের বোতল বা প্লাস্টিক পাত্রে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় ৪-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

**পাউডার তৈরি:** উপযুক্ত, পরিপক্ব ও রোগমুক্ত হলুদ সংগ্রহ করে পানিতে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর বাছাই করে সিদ্ধ বা ব্লাঞ্চিং করতে হবে। রোদে শুকানোর পর পলিশ করে আস্ত হলুদ বাজারজাত করা হয়। এছাড়া বাজারে মসলা ভাঙানোর মেশিনে হলুদ গুঁড়া করে পাউডার তৈরি করা যায়। অতঃপর চেলে ময়লা বা অপদ্রব্য দূর করে পরিমানমত প্যাকেট করতে হবে। হলুদ গুঁড়া করার সাথে সাথেই কাঁচ বা প্লাস্টিকের কৌটাতে রাখতে হবে। তা না হলে বাতাসের আর্দ্রতা গ্রহণ করে হলুদ পাউডার নষ্ট হয়ে যাবে।

**মরিচ:** মরিচ শুকানোর পর ঠান্ডা করে পলিব্যাগে বা চটের বস্তায় রাখা হয়। দুইস্তর বিশিষ্ট পলিব্যাগ বা বস্তায় শুকনো মরিচ সংরক্ষণ করলে মরিচের রঙ উজ্জ্বল থাকে, বীজ অঙ্কুরোদগম বেশি হয় এবং বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যায়। শুকনো মরিচের বোটা ছিড়ে ঢেঁকিতে বা মসলা ভাঙানোর মেশিনে মরিচ গুঁড়া করে তা কাঁচ বা প্লাস্টিকের কৌটাতে সংরক্ষণ করে পারিবারিক কাজে ব্যবহার করা হয়। কৌটা বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় রাখতে হয় অন্যথায় ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারে। এছাড়া সংরক্ষক (৭৫০ পিপিএম পটাসিয়াম মেটা বাই সালফাইট ও ০.৫% সাইট্রিক এসিড) যোগ করেও মরিচের পেস্ট দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

**আদা প্রক্রিয়াজাত করার পদ্ধতি:** প্রক্রিয়াজাত করার জন্য আদাকে ধারালো ছুরির সাহায্যে খোসা ছাড়াতে হয়। তারপর ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম লবণ, ১ গ্রাম অ্যাসিটিক এসিড (গাঢ় ভিনেগার), ১ গ্রাম পটাসিয়াম মেটা বাই সালফাইট (KMS) মিশিয়ে তাতে উক্ত আদা ভিজায়ে রাখতে হয়। ১ কেজি আদার জন্য ১-১.৫ লিটার দ্রবণ প্রয়োজন হয়। খোসা ছড়ানো আদা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে কাঁচের বয়ামে উক্ত দ্রবণসহ বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে রাখা আদা এক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।

**গোল মরিচ:** কালো গোল মরিচকে প্রক্রিয়াজাত বা মিলিং করে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের গোল মরিচ পাওয়া যায়।

(ক) সাদা গোলমরিচ
(খ) হালকা গোলমরিচ
(গ) সবুজ গোলমরিচ
(ঘ) লাল গোলমরিচ

(ঙ) গোল মরিচের গুড়ো

**সাদা গোলমরিচ:** গোলমরিচের ফল সম্পূর্ণ পেকে গেলে ছড়াসহ তা গাছ থেকে কেটে নেয়া হয়। পাকা ফলগুলোকে চৌবাচ্চায় বা বড় পাত্রে ৪-৬ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এ সময়ে যে বীজগুলো পানির উপর ভেসে উঠে সেগুলোকে সংগ্রহ করা হয়। এই গোলমরিচকে হালকা গোলমরিচ বা Light Pepper বলে। এগুলোও বাজারে বিক্রি হয়। পানিতে ডুবে থাকা ফলগুলোকে দৈনিক ২-৩ বার নেড়ে দেয়া হয়। ১০-১২ দিন পর ফলগুলো তুলে একটি ত্রিপলের উপর গাদা করে রাখা হয়। ফলের খোসা নরম হওয়ায় ত্রিপলের উপর ফলগুলো হাত দিয়ে ঘষা দিলে খোসা উঠে যায়। এরপর রোদে শুকিয়ে যে গোলমরিচ পাওয়া যায় তাকে সাদা গোলমরিচ বা White pepper বলে।

গোলমরিচের ফল শুকিয়ে তা চুর্ণ করে তেল বা স্পিরিট আহরণ করা যায়। গোল মরিচের স্পিরিট কোমল পানীয় (Soft Drink) কোকাকোলা তৈরিতে কাজে লাগে এবং তেল ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ ও চীনে গোলমরিচের গুঁড়া রান্না ও সালাদে ব্যবহার করা হয়।

**সবুজ ও লাল গোলমরিচ:** অনেক সময় কাঁচা ফলের সবুজ রঙ ঠিক রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকানো হয়। একে বলে সবুজ গোলমরিচ (Green pepper)। ফলের সবুজ রঙ ধরে রাখার জন্য সালফার-ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) গ্যাস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এরপর তা শুকিয়ে কৌটায় ভরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। আবার অপরিপক্ব ফলকে অনেক সময় ভিনেগারে চুবিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে গোলমরিচের লাল রঙের পাকা ফল সংরক্ষণ করা হলে তাকে লাল গোলমরিচ (Red pepper) বলে।

**ধনিয়া:** ধনিয়া মিলিং করার পূর্বে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ধনিয়ার আর্দ্রতা বেড়ে গেছে কি না? পোকামাকড় ও রোগবালাই মুক্ত হলে তখন মিলিং এর উপযোগী হয়। গুড়ো করার সময় ধনিয়া একবার রোদে ঘন্টাখানেক শুকিয়ে মসলা ভাঙানো মেশিনে গুড়ো করে নিতে হবে। গুড়ো করার পর সাথে সাথে ছোট ছোট পলিব্যাগে ভরে প্যাকেট করে বাজারজাত করতে হবে। অথবা বড় পাত্রে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

**দারুচিনি:** দারুচিনি মিলিং এর জন্য টিনের চালাবিশিষ্ট ঘরে চালার প্রায় ১ ফুট নিচে ঝুলন্ত মাচা করে সেখানে বাকল বিছিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। রোদে শুকানো উচিত নয়। দারুচিনি গাছের শুকনো বাকল মসলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই বাকল মোড়ানো অবস্থায় কাঠির মতো করে (Quill) বাজারজাত করা হয়। বাকল থেকে গুঁড়া (Powder) তৈরি করেও বাজারজাত করা যায়। 'উঁচুমানের দারুচিনি' হবে পাতলা, মসৃণ ও হালকা বাদামি রঙের আর 'নিম্নমানের দারুচিনি' হবে গাঢ় বাদামি রঙের পুরু ও খসখসে। সংরক্ষণের সময় এই দুই ধরনের দারুচিনি একসাথে রাখা যাবে না। ঠান্ডা জায়গায় ঘরের শীতল ও শুষ্ক স্থানে বড় কাচের বয়াম বা পাত্রে মুখ ভালো করে এঁটে সংরক্ষণ করতে হবে। মুখ ভালো করে না আটকালে দারুচিনির ঘ্রাণ চলে যায়। এভাবে সংরক্ষণ করা হলে কয়েক মাস পর্যন্ত ভালো রাখা যায়। ফ্রিজেও রাখা যায়। রপ্তানির জন্য বাকলগুলো শুকিয়ে চোঙার আকার বা কুইল করা হয়। এই অবস্থায় দারুচিনি বস্তাবন্দী করে বাজারজাত করা হয়।

## ৩.৭ বিভিন্ন প্রকার মসলার ব্যবহার

মসলা ফসলের মধ্যে কোনো কোনো মসলার উল্লেখযোগ্য পুষ্টিমান থাকলেও এগুলোকে সাধারণত খাদ্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না বরং কেবলমাত্র খাদ্যের স্বাদ ও রং বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এমতাবস্থায় আমাদের দেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান মসলার পুষ্টিমান ও ভেষজ পরিচিতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

**মরিচ:** মরিচ বা লঙ্কা অধিকাংশ ব্যঞ্জনের একটি উপাদান। বাংলাদেশে এটি অন্যতম প্রধান মসলা জাতীয় ফসল। কেপসেইসিন (Capsaicin) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে মরিচ ঝাল হয়। মরিচকে ইংরেজিতে চিলি (Chilli) বা পিপার (Pepper) বলা হয়। ব্যবহারের দিক দিয়ে মরিচ দুই প্রকার। যথা–ঝাল মরিচ ও মিষ্টি মরিচ বা ক্যাপসিকাম (Capsicum)। বাংলাদেশি ঝাল মরিচের মধ্যে ছোট মরিচ, বড় মরিচ, পাটনাই, ধানী মরিচ, ঝাল মরিচ, সাহেব মরিচ, সূর্যমুখী ও গোল মরিচ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টি মরিচ সচরাচর আকারে বড়, মোটা ও পুরু মাংসল হয়। আমেরিকায় মিষ্টি মরিচ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ঝাল মরিচের ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। মরিচে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ ও সি এবং পটাশিয়াম আছে।

**পেঁয়াজ:** পেঁয়াজ মসলা হলেও একে সবজি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে পেঁয়াজ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসলা ফসল। পেঁয়াজে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি আছে। পেঁয়াজের ভেষজ গুণ রয়েছে। মাথার খুশকি ও চর্মরোগ নিরাময়ে পেঁয়াজের রস ব্যবহার করা হয়। ঠান্ডাজনিত রোগের ঔষধ হিসেবে পেঁয়াজ কাজ করে থাকে। পেঁয়াজ খাবারের স্বাদ ও ঝাঁঝ বাড়ায়। মিষ্টি জাতীয় খাবার ছাড়া প্রায় সব খাবারেই পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয়।

**রসুন:** পেঁয়াজের সাথে সাথে যে মসলাটির নাম করতে হয় সেটি হলো রসুন। পেঁয়াজের চেয়ে কম ব্যবহৃত হলেও মসলা হিসেবে রসুনের ব্যবহার অপরিহার্য। স্যুপ, আচার, সস, চাটনি ইত্যাদিতে রসুন ব্যবহার করা হয়। ভেষজ মতে রসুন বলকারক, বাতরোগ, ফুসফুসের রোগ ও হৃদরোগের উপকারী বলে জানা যায়। উচ্চ রক্তচাপে রসুনের ব্যবহার উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। রসুনে রয়েছে ডাই-এলাইল সালফাইড (Diallyl sulfide) যা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এই ফল পেতে হলে রসুন কাঁচা খেতে হয়। রসুন ইনফেকশন প্রতিরোধ করে, কোলেস্টেরল কমায়, প্রোস্টেট ক্যান্সার ও হার্টের অসুখ রোধ করে। রসুনে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি ও সামান্য লৌহ থাকে।

**আদা:** আদা একটি উৎকৃষ্টমানের অর্থকরী মসলা। উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে আদার গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। মাংস রান্নায় এটি একটি অপরিহার্য মসলা। ঘ্রাণ ও ঝাঁঝ আনার জন্য খাবারে আদা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নানা রকম আচার, চাটনি, কেচাপ, কেক ইত্যাদি তৈরিতে আদা ব্যবহার করা হয়। আদা চা একটি জনপ্রিয় পানীয়। ভেষজ মতে আদা কফ-নিবারক, হজম শক্তিবর্ধক ও সর্দি কাশিতে ভালো কাজ করে। আদায় ক্যালসিয়াম ও ক্যারোটিন ছাড়াও সামান্য পরিমাণে লৌহ ও ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

**হলুদ:** আদার পরই মসলা হিসেবে হলুদের নাম পাশাপাশি বলা হয়। বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যঞ্জন নেই, যাতে হলুদ ব্যবহার হয় না। খাবারের রঙ বাড়ানোর জন্য হলুদের ব্যবহার এই উপমহাদেশে বেশি দেখা যায়। হলুদ খাবারের রঙকে যেমন বাড়িয়ে তোলে তেমনি বাড়িয়ে তোলে খাবারের স্বাদকে। হলুদের ক্রিম বা হলুদ বাটা সৌন্দর্য চর্চায় ব্যবহৃত হয়। নববধূ ও বরের 'গায়ে হলুদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ভারতে হলুদ পশম ও রেশম রাঙানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। আদার মতো হলুদেরও ঔষধি গুণ রয়েছে। হলুদে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, কিছু লৌহ ও ক্যারোটিন রয়েছে।

**ধনিয়া:** ধনিয়া বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত মসলা। এর পাতা ও দানা উভয়েই রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার খাবারে সুঘ্রাণ যুক্ত করে। খাবারে বৈচিত্র আনার জন্য ধনিয়া ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে নিরামিষ জাতীয় খাবারেই মূলত ধনিয়া বেশি ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য মসলা 'পাঁচফোড়ন' এর অন্যতম উপাদান হচ্ছে ধনিয়া। শীতকালে প্রায় সবধরনের রন্ধনে ধনিয়া পাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

## অন্যান্য মসলা

**জিরা:** জিরা খাবারের রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ বৃদ্ধি করে। জিরা নানা ধরনের খাবারে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে কিছু খাবার আছে যেগুলো জিরা ছাড়া একেবারেই স্বাদহীন। দুই ধরনের জিরা খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। যথা- কিউমিন বা জিরা যা দেখতে অনেকটা সাদা এবং দ্বিতীয়টা হল শাহীজিরা বা ক্যারাওয়ে যা আকৃতিতে জিরা হতে বড়। ভারত ও ইরানে সর্বাধিক পরিমাণে জিরা উৎপন্ন হয়।

**গোলমরিচ:** গোল মরিচ গাছ পান গাছের মতো লতানো উদ্ভিদ। খাদ্য রান্নায়, মাংস ও অন্যান্য খাদ্যে সংরক্ষক হিসাবে এটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গোলমরিচ,আচার, বেকারি ও পানীয় শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গোলমরিচের ঝাঁঝ ও ঘ্রাণ খাদ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অতি প্রাচীন কাল হতে এটি হাড় ভাঙা, মচকানো, ম্যালেরিয়া কম্পন ইত্যাদি রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে সীমিত আকারে গোলমরিচের চাষ হচ্ছে।

**দারুচিনি:** এটি গরম মসলার অন্যতম একটি উপাদান। খাবারের ঘ্রাণ বৃদ্ধি করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। অনেকে মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য এটি খেয়ে থাকেন। দারুচিনির ব্যবহার সর্বপ্রথম শ্রীলংকায় তারপর তা মিশর ও চীন হয়ে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দারুচিনির তেল (Cinnamon oil) খাদ্য, ওষুধ ও প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহার করা হয়। দারুচিনি পোলাও, বিরিয়ানি, মাংস ভুনা, জর্দাসহ বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহার করা হয়।

**এলাচ:** গরম মসলার মধ্যে এলাচ দানা অন্যতম। এলাচ খাবারে সুঘ্রাণ এবং স্বাদ আনার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এলাচ মিষ্টি বা ঝাল ও মুখরোচক অধিকাংশ খাবার তৈরিতেই ব্যবহৃত হয়। এলাচ এর উৎপাদন বেশি হয় ভারতে এবং পরে মালয়েশিয়া হয়ে সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়ছে। এলাচ দুই ধরনের হয় যেমন- বড় এলাচ ও ছোট এলাচ।

**তেজপাতা:** মসলার মধ্যে পাতাজাতীয় মসলা হচ্ছে তেজপাতা। এই পাতা শুকনা অবস্থায় খাবারের ঘ্রাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। টক, ঝাল, মিষ্টি সব খাবারেই তেজপাতা ব্যবহৃত হয়। তেজপাতা হতে উৎপন্ন সুগন্ধি তেল,প্রসাধনী ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। খাবার মসলা হিসেবে তেজপাতার ব্যবহার গ্রীসে শুরু হয়। পরে এটি রোম হয়ে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

### জব নং-০১

১। জবের নাম: **মসলার গুঁড়া প্যাকেটজাতকরণ**

২। পারদর্শিতার মানদণ্ড

১.১ কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করবে।

১.২ কাজের জায়গা প্রস্তুত করবে।

১.৩ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ ও মসলা মিলিং মেশিন বা কল ব্যবহার উপযোগী কি-না চেক করবে।

১.৫ পরিপক্ব রোগ ও পোকামুক্ত, উন্নত জাতের ও মানের মসলা সংগ্রহ করবে।

১.৬ মসলাগুলো সংগ্রহের পর ময়লা আবর্জনা ও অবাঞ্ছিত অংশ পরিষ্কার করবে।

১.৭ মসলা ভাঙানোর পূর্বে উজ্জ্বল রোদে প্রয়োজন অনুযায়ী শুকাবে।

১.৮ মসলা মিলিং মেশিনে বা কলে ভেঙে গুঁড়া করে মসলা কক্ষ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করবে ।

১.৯ মসলা মেপে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পলিব্যাগে ভরে সিল করে নিবে।

১.১০ প্যাকেটে লেবেল দিয়ে বাজারজাত করবে।

১.১১ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।

১.১২ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

১.১৩ কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক

**উপকরণ :** বিভিন্ন ধরনের মসলা ভাঙানোর মেশিন, দাঁড়িপাল্লা, ডিজিটাল ব্যালেন্স চটের ব্যাগ, পলিব্যাগ ও চামচ,প্রাস্টিকের বোল ইত্যাদি।

চিত্র ৩.৪ মসলা ভাঙানোর মেশিন

## ৪। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- পরিপক্ব, রোগ ও পোকামুক্ত, উন্নত জাতের ও মানের মসলা যেমন- হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।
- হলুদের মধ্যে 'হীরণচোখা' হলুদের গুণগত মান ভালো। মরিচের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল লাল বর্ণের মরিচ ভালো, ধনিয়ার ক্ষেত্রে ধূসর রঙের বড় বড় দানা হতে হবে।
- মসলাগুলোর উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট এবং আস্ত অর্থাৎ ভাঙা হবে না এবং সুন্দর গন্ধ দেখে নির্বাচন করতে হবে।
- মসলাগুলো সংগ্রহের পরে এগুলো থেকে ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে।
- মরিচের বোঁটা ফেলে দিতে হবে। হলুদ ভেঙে দেখতে হবে শুকনো হয়েছে কিনা বা এর গুণগত মান কেমন।
- মসলা ভাঙানোর পুর্বে ভালো করে উজ্জ্বল রোদে ২-৩ ঘণ্টা করে দুই দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
- মসলা বস্তা বা ব্যাগে ভরে মিলিং মেশিনে বা কলে নিয়ে যেতে হবে। গম ভাঙানোর কলে মসলা উত্তমরূপে ভাঙানো যাবে।
- গুঁড়া করা মসলা ঘরে এনে ঠান্ডা করতে হবে।
- মসলা মেপে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পলিব্যাগে ভরে সিল করে দিতে হবে। (যেমন- ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ইত্যাদি)
- তারপর প্যাকেটে লেবেল দিয়ে বাজারজাত করা যাবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

## ৫। বিশেষ নির্দেশনা

- মসলা ভাঙানোর পূর্বে রোদে না দিলে মসলার সংরক্ষণ গুণ খারাপ হবে।
- ভাঙানোর পূর্বে ময়লা ও আবর্জনা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্যাকেটে বাজারজাত করতে হবে।
- লেবেল সতর্কতার সাথে লাগাতে হবে।
- প্যাকেটের মুখ ভালোভাবে সিল করতে হবে।
- কোনো প্রকার ভেজাল মসলার সংযোজন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করে এই জবটি নয়বার করতে হবে।

# অনুশীলনী-০৩

## অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মসলাগুলো কী কী?

২. বাংলাদেশের কোন মসলার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি?

৩. আমাদের দেশে কোন মসলাগুলো সারাবছর চাষ হয়?

৪. মসলা কত প্রকার ও কী কী?

৫. কন্ডিমেন্ট এর কয়েকটি উদাহরণ দাও?

৬. কী করলে হলুদের রং উজ্জ্বল হয়?

৭. আদাকে কয়ভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

৮. 'কুইল' কাকে বলে?

৯. ধনিয়ার আর্দ্রতা কত হলে সংরক্ষণের উপযোগী হবে?

১০. হলুদের এনজাইমেটিক কার্যকারিতা দুর করার জন্য কী করতে হবে?

১১. হলুদের পেস্টে প্রিজারভেটিভ হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?

১২. প্রক্রিয়াজাতকৃত আদা কত দিন ভালো থাকে?

১৩. কোকাকোলা তৈরিতে গোলমরিচ কী কাজে লাগে?

২২. গোলমরিচে $SO_2$ গ্যাস কেন ব্যবহার করা হয়?

২৩. লাল গোলমরিচ কাকে বলে?

২৪. দারুচিনি কোন অবস্থায় বাজারজাত করা হয়?

২৫. রসুন কী কী রোগ নিরাময় করে?

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. আমাদের দেশে মসলার গুরুত্ব কেমন?
২. কোন কোন মসলা বেশি উৎপাদিত হয়?
৩. কেন রবি মৌসুমে মসলা ভাল হয়?
৪. পেস্ট তৈরি করে কীভাবে হলুদ সংরক্ষণ করা হয়?
৫. গোলমরিচ মিলিং করে কী কী নতুন উপাদান পাওয়া যায়?
৬. পেঁয়াজ ও মরিচের ব্যবহার লেখ।
৭. রসুন ও আদার ব্যবহার লেখ।
৮. হলুদ ও ধনিয়ার ঔষধিগুণ লেখ।
৯. গোলমরিচ ও দারুচিনির ব্যবহার লেখ।

## রচনামূলক প্রশ্ন :

১. মসলার শ্রেণিবিভাগ ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
২. মরিচ, হলুদ, আদা, গোলমরিচ ও দারুচিনি শুষ্ককরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. হলুদ, মরিচ ও আদার মিলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৪. গোলমরিচ, দারুচিনি ও ধনিয়ার মিলিং প্রক্রিয়া লেখ।
৫. জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলার মিলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৬. মসলা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

# মাশরুমের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও উৎপাদিত খাদ্য

# Introduction to mushroom, nutrition and food products

মাশরুম একটি পুষ্টিকর সবজি। প্রাচীনকাল থেকে মাশরুমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ খাদ্য তালিকায় এটিকে স্থান দিয়ে এসেছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আপ্যায়নেও ব্যবহৃত হতো লোভনীয় স্বাদের এই মাশরুম। বিশ্বব্যাপী ভোজন রসিকেরা মাশরুমকে স্বর্গীয় খাবারের সাথে তুলনা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এটি এখনও একটি অপরিচিত সবজি। সঙ্গত কারণেই এর রান্নার প্রক্রিয়াটি অনেকের কাছেই অজানা। ভালোভাবে রান্না হলে এটি আমাদের অপরিচিত মুখেও স্বাদ লাগবে। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভাস মূলত শর্করা জাতীয় খাদ্য নির্ভর। ফলে অধিকাংশ মানুষের আমিষের ঘাটতি রয়ে যায়। মাশরুম যেহেতু উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ সবজি কাজেই আমাদের খাদ্য তালিকায় মাশরুম সহযোগে তৈরি খাদ্য রাখলে আমিষের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ হবে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- প্রধান প্রধান মাশরুম শনাক্তকরণ করতে পারব।
- মাশরুমের পুষ্টিমান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাশরুমের ভেষজমূল্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাশরুম সংরক্ষণ করতে পারব।
- মাশরুম ফ্রাই তৈরি করতে পারব।
- মাশরুমের বিভিন্ন খাদ্য (স্যুপ, চিকেন স্যুপ, স্যান্ডউইচ, বার্গার ও চিকেন বিরিয়ানি) প্রস্তুত করতে পারব।

## ৪.১ বিভিন্ন প্রকার মাশরুমের নাম, চাষ মৌসুম ও জাত

**পরিচিতি:** সাধারণ সবজির মতো মাশরুম মাটিতে জন্মায় না। সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে রকম সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় মাশরুমের জন্য তার কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ মাশরুম নিম্নশ্রেণির ছত্রাক জাতীয় পরজীবী উদ্ভিদ। জীবন ধারণের জন্য এরা জৈবিক বস্তু (Organic body) থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে বিভিন্ন কৃষিজ বর্জ্য অর্থাৎ খড়, কম্পোস্ট, কাঠের গুঁড়া, কাঠ ইত্যাদি নানা জিনিসের উপর মাশরুম চাষ করা হয়। মাশরুম চাষের জন্য কৃষি জমিরও প্রয়োজন হয় না এবং সূর্যালোকেরও প্রয়োজন হয় না বিধায় ঘরের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত মাধ্যমে আর্দ্রতাপূর্ণ ও সহনশীল তাপমাত্রায় কৃত্রিমভাবে বেশ কিছু জাতের মাশরুম চাষ করা সম্ভব। প্রকৃতিতে অসংখ্য মাশরুম রয়েছে তন্মধ্যে প্রায় ২০০০ মাশরুম ভক্ষণযোগ্য এবং এ পর্যন্ত ২০ টির চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

**চাষ মৌসুম:** বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে তিন শ্রেণির মাশরুম উৎপাদিত হয়। যথা-

- **গ্রীষ্মকালীন মাশরুম:** এ ধরনের মাশরুম শুধু গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। যেমন- স্ট্র, মিল্কী ও ঋষি মাশরুম।
- **শীতকালীন মাশরুম:** এ ধরনের মাশরুম শুধু শীতকালে চাষ করা যায়। যেমন- বাটন, শিতাকে ও শিমাজী মাশরুম।
- **উভয় মৌসুমী বা বছরব্যাপী মাশরুম:** এ ধরনের মাশরুম সারা বছর ধরে চাষ করা যায়। যেমন- ওয়েস্টার, পপলার, ঝিনুক ও কান মাশরুম।

**মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা:** মাশরুম হলো এক ধরনের ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ। ছত্রাকবিদগণ পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ প্রজাতির ছত্রাক চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এই অসংখ্য ছত্রাকের মধ্যে থেকে তারা দীর্ঘদিন ধরে যাচাই বাছাই করে যেসব ছত্রাক সম্পূর্নরূপে খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর, সুস্বাদু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেগুলোকেই মাশরুম বলে অভিহিত করেছেন।মাশরুমের মতো দেখতে বনে জঙ্গলে অনেক ধরনের ছাতা আকৃতির ছত্রাক জন্ম নেয় যাকে ব্যাঙের ছাতা বলা হয়, সেগুলো খাওয়ার অনুপযোগী এবং বিষাক্ত। কিন্তু চাষ করা মাশরুম কখনই বিষাক্ত নয়।

চিত্র: ৪.১ মাশরুমের দৈহিক গঠন

**মাশরুমের গঠন:** ছাতার মতো মাশরুমের যে অংশটি আমরা দেখতে পাই একে ছত্রাকের ফ্রুটিং বডি বলে। মাশরুমের ফ্রুটিং বডি বা ফুল কিংবা ভক্ষণযোগ্য অংশকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

- টুপি বা পিলিয়াস (Pilius)
- জিল (Gill) বা ল্যামেলি (Lamellae)

- আবরণ বা ভেইল অ্যানুল্যাস (Veil Annulus) ও
- দণ্ড বা স্টাইপ (Stipe)

**টুপি বা পিলিয়াস :** এটি অনেকটা ছাতার আকৃতি বিশিষ্ট। এটি সাধারণত মাংসল এবং পুরু হয়। জাত ভেদে টুপি বিভিন্ন আকৃতি, পরিমাপ ও বর্ণের হয়। এটি মাশরুমের প্রধান খাওয়ার অংশ।

**জিল:** মাশরুমের টুপির নিচের অংশকে জিল বলে। জিল এক ধরনের অসংখ্য সমান্তরাল সুতা দিয়ে তৈরি এবং এর মধ্যে বংশবিস্তারের অতি প্রয়োজনীয় স্পোর বা বীজ থাকে।

**আবরণ:** মাশরুমের নতুন ফ্রুটিং বডির জিল এক ধরনের কোষ কলা (Tissue) দ্বারা আবৃত থাকে। এই কোষ কলাকে আবরণ বা ভেইল বলে। ধীরে ধীরে ফ্রুডিং বডি বড় হতে থাকলে এটা ছিঁড়ে যায় এবং দণ্ডের চারদিকে আংটির মতো আকার তৈরি করে।

দণ্ড দণ্ডটির

**দণ্ড বা স্টাইপ:** টুপিকে ধরে রাখার জন্য দণ্ড কাজ করে। দণ্ডটি টুপির মাঝে থাকে। দণ্ডটির ভেতরের অংশ ভরাট কিংবা ফাঁপা থাকতে পারে। বিভিন্ন মাশরুমের দণ্ড বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো মাশরুম চিনতে সাহায্য করে। মাশরুমের দণ্ড থেকে টুপি পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশই খাওয়া যায়।

**মাশরুমের বিভিন্ন জাত:** প্রকৃতিতে মাশরুমের বহু জাত রয়েছে তন্মধ্যে বাংলাদেশে ৮-১০ জাতের মাশরুম বানিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাশরুম চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে বাতাসের শতকরা আর্দ্রতা ৬০ ভাগের নিচে নামে না এবং তাপমাত্রার পরিসীমা সাধারণত ১০-৪০$^{\circ}$সে. থাকে। আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও কাঁচামালের প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাশরুমের জাতগুলো আমাদের দেশে চাষ করার উপযোগী।

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|---|---|---|
| ১ | ঝিনুক মাশরুম | ওয়েস্টার মাশরুম (Oyster mushroom) |
| ২ | দুধ মাশরুম | মিল্কি মাশরুম (Milky mushroom) |
| ৩ | কান মাশরুম | উড এয়ার মাশরুম (Wood ear mushroom) |
| ৪ | বাটন/বোতাম মাশরুম | বাটন মাশরুম (Button mushroom) |
| ৫ | শিতাকে মাশরুম | শিতাকে মাশরুম (Shitake mushroom) |
| ৬ | খড় মাশরুম | স্ট্র মাশরুম (Paddy straw mushroom) |
| ৭ | ঋষি মাশরুম | রেইশি মাশরুম (Rishi Mushroom) |
| ৮ | মাঙ্কিহেড মাশরুম | Monkey head Mushroom |

২০২৩

## ৪.২ প্রধান প্রধান মাশরুমের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

চিত্র: ৪.২ ঝিনুক মাশরুম

**ঝিনুক বা ওয়েস্টার মাশরুম:** এই মাশরুমটি সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন। এই মাশরুমকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ফ্রুটিং বডির বর্ণ সাদা, তুলনামূলকভাবে একটু হালকা ও দেখতে ঝিনুকের মতো। আমাদের দেশে সব পরিবেশে, সব জায়গাতে সারা বছর এটি চাষ করা যায়। এই মাশরুমটি কাঠের গুঁড়া, ধানের খড়, গমের খড়, আখের ছোবড়া, কাগজ, চায়ের পাতি, সুপারির ছালসহ এ ধরনের আরও অন্যান্য বস্তুর (Substrate) উপর চাষ করা যায়। ঔষধিগুণ, পুষ্টিগুণ ও স্বাদের জন্য বিশ্ব বাজারে এ মাশরুমের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: ৪.৩ দুধ মাশরুম

**মিল্কি বা দুধ মাশরুম:** মিল্কি মাশরুম বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় একটি মাশরুম। এর পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ অত্যন্ত বেশি। এর সংরক্ষণ মেয়াদ (Shelf life) বেশি বিধায় বিদেশে রপ্তানির জন্য এটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স এসব দেশে এ মাশরুমের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

### বৈশিষ্ট্য

- এটি উচ্চ তাপমাত্রায় চাষ করা যায়।
- এটি গ্রীষ্মকালীন মাশরুম।
- ধানের খড়, গমের ভুসি, কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করে চাষ করা যায়।
- সুস্বাদু এবং অল্প খরচে চাষ করা যায়।
- ফ্রুটিং বডি দুধের মতো সাদা এবং আকৃতিতে অনেক বড় হয়।
- স্টাইপ অনেক মোটা।
- শেলফ লাইফ বেশি বিধায় অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- আমাদের দেশে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস চাষ করা যায়।
- এটার জন্য অনুকূল পরিবেশ হলো ২৫-৩০$^{\circ}$সে. তাপমাত্রা এবং ৭০-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

**বাটন মাশরুম:** বিশ্বের মোট মাশরুম উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ মাশরুমই হচ্ছে বাটন মাশরুম। মূলত শীতপ্রধান দেশে এর উৎপাদন ভালো হয় বিধায় যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, পোলান্ড, স্পেন, ফ্রান্স,

ইতালি, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাজ্য, চীন ও ভারত (উত্তরাংশ) ইত্যাদি দেশে মাশরুম বেশি চাষ হয়। এ মাশরুম উৎপাদনের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা ও উচ্চ আদ্রর্তার প্রয়োজন হয় বিধায় আমাদের দেশে শীতকালে প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে এটি চাষ করা যায়। তবে উচ্চ ফলনশীল ও গুণাগুণ বজায় রেখে সারা বছর চাষ করতে চাইলে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (Controlled atmosphere) এ চাষ করতে হবে।

চিত্র: ৪.৪ বাটন মাশরুম

## বৈশিষ্ট্য

- এটার ফ্রুটিং বডি বোতাম আকৃতির, মাংসল প্রকৃতির ও সুস্বাদু।
- বর্ণ ক্রিম থেকে ধূসর।
- চাষ পদ্ধতি ব্যয়বহুল।
- বাজার মূল্য বেশি।
- শীতকালীন মাশরুম।

**শীতাকে মাশরুম:** শীতাকে মাশরুম বিশ্বের অন্যতম দামি ও চাহিদা সম্পন্ন একটি সবজি। পুষ্টি ও ঔষধিগুণে ভরা সুস্বাদু এই মাশরুমের উৎপাদন বিশ্বে দিন দিন বেড়েই চলেছে। অন্যান্য মাশরুমের চেয়ে স্বাদ ও গন্ধে ভিন্নতা থাকায় বাংলাদেশেও এর জনপ্রিতা বাড়ছে। এ মাশরুম চীন, জাপানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে কাঠের গুঁড়িতে (Wood log) চাষ করা হয়। এতে সময় ও খরচ অনেক বেশি লাগে। কিন্তু আমাদের দেশে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত সহজ প্রযুক্তিতে চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাবস্ট্রেট হিসেবে কাঠের গুঁড়া (Saw dust) ব্যবহার করা হয় বিধায় সময় ও খরচ অনেক কম লাগে।

চিত্র: ৪.৫ শীতাকে মাশরুম

**খড় বা স্ট্র মাশরুম:** চীনে সর্বপ্রথম স্ট্র মাশরুমের চাষ শুরু হয়। এ কারণে স্ট্র মাশরুম সাধারণত চাইনিজ মাশরুম নামে পরিচিত। স্বাদ ও পুষ্টিগুণের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় এই মাশরুম বেশ জনপ্রিয় এবং বিশ্বে চাষকৃত মাশরুমের মধ্যে এর অবস্থান তৃতীয়। এটি প্রধানত গ্রীষ্মকালীন মাশরুম। আমাদের দেশের আবহাওয়া স্ট্র মাশরুম চাষের জন্য উপযোগী। ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশে স্ট্র মাশরুম চাষ শুরু হয়। বাংলাদেশে মাশরুম চাষের সূচনা হয় মূলত স্ট্র মাশরুমের চাষ দিয়েই।

চিত্র: ৪.৬ স্ট্র মাশরুম

## স্ট্র মাশরুমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এ মাশরুম দেখতে ধূসর বর্ণের।
- জীবনচক্র খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।
- অন্যান্য মাশরুমের তুলনায় সুস্বাদু, পুষ্টি উপাদান বেশি ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন।

- উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ, স্বল্প খরচে চাষ করা যায়।
- দামি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।
- স্ট্র মাশরুম চাষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ পুনরায় ওয়েস্টার ও মিল্কি মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায়।
- অতিরিক্ত গরমে অন্যান্য মাশরুমের যখন উৎপাদন কমে যায় স্ট্র মাশরুম তখন ভালো ফলন দেয়। এ কারণে ওয়েস্টার মাশরুমের তুলনায় স্ট্র মাশরুমের জনপ্রিয়তা ও বাজার মূল্য বেশি।
- বাংলাদেশে সফলভাবে চাষকৃত মাশরুম হচ্ছে স্ট্র মাশরুম।

চিত্র: ৪.৭ ঋষি মাশরুম

**ঋষি মাশরুম (Rishi Mushroom):** ঋষি মাশরুম বিশ্বে ঔষধি মাশরুম নামে পরিচিত। বিশেষ করে চীন, জাপান ও মালয়েশিয়াতে হার্বাল মেডিসিন হিসেবে এই মাশরুমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ঋষি মাশরুম দিয়ে ক্যান্সার টিউমার, হৃদরোগের মতো জটিল ও কঠিন রোগের ঔষধ তৈরি করা হয়। এছাড়া প্রসাধনী শিল্প যেমন- পেস্ট, সাবান, লোশন, শ্যাম্পু, মাসেজ অয়েল ইত্যাদি এবং চা, কফি ও চকলেট তৈরিতে সারা বিশ্বে এর ব্যবহার অনেক বেশি। আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া এই মাশরুম চাষের উপযোগী। এর সংরক্ষণ মেয়াদ (Shelf life) ও বাজার মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে এদেশে এই মাশরুম চাষ করা বেশ লাভজনক হবে। পরিপক্ক এই মাশরুমের ফ্রুটিং বডি দেখতে কিডনির মত। এর উপরের স্তর গাঢ় লাল, চকচকে উজ্জ্বল এবং নিচের অংশ হাল্কা বাদামি ও অসংখ্য লালচে স্পোর ধারণ করে থাকে।

চিত্র: ৪.৮ কান মাশরুম

**কান মাশরুম :** এ মাশরুম দেখতে অনেকটা মানুষের কানের মতো তাই এর নাম কান মাশরুম। এটি জেলি মাশরুম হিসেবেও পরিচিত। কাঠের গুঁড়ি (Wood log), কাঠের গুঁড়া (Saw dust) ও খড়ের মিশ্রণ এবং তুলা বর্জ্যের (Cotton wastes) উপর কান মাশরুম বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। গ্রামের ক্ষুদ্র চাষিরা ওয়েস্টার মাশরুমের মতই খড়ের উপর ব্যাগ পদ্ধতিতে এই মাশরুম চাষ করতে পারে। ভালো ফলনের জন্য তাপমাত্রা ২২-২৭°সে. এবং আদ্রর্তা ৯০-৯৫% থাকতে হয়। এই মাশরুমের সংরক্ষণ মেয়াদ বেশি এবং পরিপক্ক হওয়ার পরও অন্তত ২ সপ্তাহে এটি নষ্ট হয় না।

## ৪.৩ মাশরুমের পুষ্টিমান

পুষ্টিমান বিচারে মাশরুম বেশ সমৃদ্ধ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন- প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদি মাশরুমে উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান। অন্য দিকে যেসব খাদ্য

উপাদানের (ট্রান্স ফ্যাট, কোলেস্টেরল, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি) আধিক্য আমাদেরকে কঠিন রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তা মাশরুমে নেই বললেই চলে।

**সারণি ৪.১: বিভিন্ন মাশরুমের পুষ্টিমূল্য (প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুম)**

| মাশরুম | আমিষ (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | আঁশ (গ্রাম) | লৌহ (মি.গ্রাম) | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম) | জিংক (মি.গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়েস্টার | ২৫.০০ | ২.৫৬ | ১২.৭০ | ২৭.০০ | ২৯.৮০ | ২৫.৩০ | ১৯.৮০ |
| কান | ৭.২০ | ১.৭০ | ৮৮.৬০ | - | ১৬.৩০ | ৬.০৭ | ১.০০ |
| মিল্কি | ২১.৪০ | ১৩.০০ | ৪৮.৫০ | ১২.৯০ | ৫৬.২৫ | ২০.৬৫ | ১২.৮৬ |
| স্ট্র | ২০.০০ | ১০.৮২ | ১১.৬০ | ১৫.২০ | ৪৮.২০ | ২৩.০০ | ২৬.২০ |
| ঋষি | ২৬.৪ | ২.৭০ | ১২.৮০ | ৫১.৫০ | ৫৩.৫০ | ২৭.৫০ | ১৪.৭০ |
| বাটন | ৩৭.৬০ | ১০.০০ | ২৩.৬০ | ২১.২০ | ১৮.৫০ | ৪৪.০০ | ২৪.৬০ |
| শীতাকে | ২৭.০০ | ৭.২০ | ২১.০০ | ৩৮.৩০ | ১৮.০০ | ২২.০০ | ২৩.৪০ |

উৎসঃ জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

**মাশরুমের প্রোটিন:** মাশরুমের প্রোটিন অতি উন্নত, সম্পূর্ণ ও নির্দোষ। একটি সম্পূর্ণ প্রোটিনের পূর্বশর্ত হলো মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি অ্যামাইনো এসিড (হিস্টিডিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথাইওনিন, ফিনাইলএলানিন, থ্রিয়োনিন, ট্রিপ্টোফ্যান ও ভ্যালিন) এর উপস্থিতি যেগুলো মাশরুমে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। অন্যান্য প্রাণিজ আমিষ যেমন- মাছ, মাংস, ডিমের আমিষ উন্নতমানের হলেও এগুলোতে কোলেস্টেরল বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, মাশরুমের আমিষ নির্দোষ এবং কোলেস্টেরল ভাঙার উপাদান (High density lipoprotein বা HDL) সমৃদ্ধ হওয়ায় মাশরুম খেলে দেহে কোলেস্টেরল জমার ভয় থাকে না। এ কারণেই মাশরুমের প্রোটিন অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

**মাশরুমের ফ্যাট:** মাশরুমে রয়েছে অসম্পৃক্ত (Unsaturated) ফ্যাটি এসিড যা শরীরের জন্য উপকারী। আর মাশরুমে বিদ্যমান আরগোস্টেরল (Ergosterol) মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ (Brain development), ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতা বাড়ায়। এছাড়া মাশরুমের ফ্যাটে ৭০-৮০% লিনোলেনিক এসিড আছে যা আমাদের শরীরের জন্য একটি অপরিহার্য ফ্যাটি এসিড।

**মাশরুমের কার্বোহাইড্রেট :** মাশরুমে শর্করার পরিমাণ খুবই কম এবং তা পানিতে দ্রবণীয় ফলে এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। অনেক পলিস্যাকারাইড থাকায় মাশরুম দেহের বিভিন্ন জ্বালা পোড়া নিরাময় করে। মাশরুমে আঁশের পরিমাণও বেশি (১০-২৮%) ফলে এটি ডায়াবেটিক রোগীদের ইনসুলিনের চাহিদা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া মাশরুমে উপকারী বিটা গ্লুকোনস রয়েছে যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তরান্বিত করে।

**ভিটামিন ও মিনারেল :** ভিটামিন ও মিনারেলসের উৎস হিসেবে মাশরুমের অবস্থান খুবই উপরে। মাশরুমে থায়ামিন (বি১) রিবোফ্লাভিন (বি২) এবং ভিটামিন বি১২ পাওয়া যায়। মাশরুমের পটাশিয়াম দেহের জলীয় অংশের স্থিতাবস্থা ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। মাশরুমের সেলিনিয়াম দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে।

## ৪.৪ মাশরুমের ভেষজ মূল্য

মাশরুম বা মাশরুম আহরিত নির্যাস (extract) দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেলিনিয়ামসহ মাশরুমের নানাবিধ উপাদন স্তন ক্যান্সার ও টিউমারের বিরুদ্ধে কাজ করে। মাশরুমে বিদ্যমান বিভিন্ন ঔষধি উপাদান যেমন- টারপিনয়েডস, স্টিরয়েডস, ফেনলস, নিউক্লিওটাইডস, গ্লাইকোপ্রোটিনস, বিভিন্ন ধরনের পলিস্যাকারাইড ইত্যাদি মূলত রোগ প্রতিরোধের কাজ করে ।

- **মাশরুম টিউমার প্রতিরোধী:** পলিস্যাকারাইড, নানা ধরনের প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান সমৃদ্ধ থাকায় মাশরুম টিউমারের বিরুদ্ধে এবং লিউকেমিয়া বা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
- **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মাশরুম:** মাশরুমে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদান দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। মাশরুমের গ্লুক্যান, প্রোটিন ও গ্লাইকেন মূলত এ কাজে সহায়তা করে।
- **এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে মাশরুম:** মাশরুম নানা ধরনের এন্টিঅক্সিডেন্ট উপাদানে সমৃদ্ধ যা বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই যেমন- ডায়াবেটিস, সিরোসিস ও ক্যান্সারসহ বার্ধক্যজনিত নানা ধরনের জটিলতা থেকে সুরক্ষা করে।
- **ইনফ্লামেশন বিরোধী কাজ:** ভিন্ন ভিন্ন মাশরুম ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইনফ্লামেশন বিরোধী কাজ করে। কিছু কিছু ঝিনুক মাশরুম ইডিমা রোগ নিরাময়সহ ইনফ্লামেশন দূর করে।
- **রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে:** মাশরুমের আঁশ ও আরগেস্টেরল (Ergosterol) রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। কিছু কিছু মাশরুম রক্তের ক্ষতিকারক Low density lipoprotein (LDL) কমায় এবং উপকারী High density lipoprotein (HDL) বৃদ্ধি করে।
- **লিভার সুরক্ষা করে:** ঋষি ও ওয়েস্টার মাশরুম লিভার সুরক্ষায় যথেষ্ট কার্যকর। এই শ্রেণির মাশরুমগুলো রক্ত ও লিভারে বিদ্যমান কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে লিভারকে সুরক্ষার প্রদান করে।
- **মাশরুম জীবাণু বিরোধী কাজ করে:** গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মাশরুমে জীবাণু ও ছত্রাক বিরোধী উপাদান রয়েছে। দেখা গেছে ওয়েস্টার মাশরুমের নির্যাস গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বেশ কার্যকর।
- **রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে:** মাশরুম রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে কাজ করে। এ কাজে ওয়েস্টার মাশরুমের ভূমিকা অগ্রগণ্য।
- **ভাইরাসবিরোধী ভূমিকা:** কিছু কিছু মাশরুম নানা জাতের ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর। শিতাকে মাশরুম ও ওয়েস্টার মাশরুম HIV-এর বিরুদ্ধে কার্যকর।

২০২১

## ৪.৫ মাশরুম সংরক্ষণ

**মাশরুম সংরক্ষণ:** প্যাকেটজাতকৃত তাজা মাশরুম গরমকালে সাধারণত ১ থেকে ২ দিন এবং শীতকালে ২ থেকে ৩ দিন কক্ষ তাপমাত্রায় রেখে খাওয়া যায়। রেফ্রিজারেটরে (৪-১৫$^{\circ}$সে.) বায়ুরোধী প্যাকেটে (Sealing condition) মাশরুম ৭/৮ দিন রেখে খাওয়া যায়। মাশরুম রোদে অথবা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে শুকিয়ে বায়ুরোধী প্যাকেটে ৫-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

**মাশরুম সংগ্রহের সময়:** যথাসময়ে মাশরুম সংগ্রহ করতে পারলে মাশরুমের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায় এবং চাষি লাভবান হয়।

**ক) ওয়েস্টার:** মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের শিরাগুলো ঢিলা হয়নি অথবা কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

**খ) মিল্কি হোয়াইট:** এ মাশরুমের সংরক্ষণকাল সবচেয়ে বেশি। সাধারণ রুম তাপমাত্রায় একে ৪-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়। এই মাশরুম সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হলো মাশরুমের আকার প্রায় ৪-৫ ইঞ্চি হবে এবং মাশরুম যথেষ্ট রসালো থাকবে।

**গ) স্ট্র মাশরুম:** এই মাশরুম সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এর সংরক্ষণকাল ২৪ ঘন্টারও কম। মাশরুমের ক্যাপ ফেটে যায়নি অর্থাৎ বাটন/এগ অবস্থা এই মাশরুম সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

### মাশরুম সংগ্রহ করার কৌশল

- মাশরুম পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে আলতো মোচড় দিয়ে তুলে নিতে হবে।
- সংগৃহীত মাশরুম গোড়া কেটে পরিচ্ছন্ন করে গ্রেডিং করতে হবে।
- গ্রেড অনুযায়ী মাশরুমগুলোকে ০.২-০.২৫ মি.মি. পুরুত্বের পালিপ্রোপাইলিন(পিপি) ব্যাগে ভরে বায়ুরোধী বা সিলিং করে বাজারজাত করতে হবে।

### মাশরুম কেন সংরক্ষণ করা উচিত

তাজা মাশরুমে পানির পরিমাণ বেশি থাকায় এর সংরক্ষণ কাল (Shelf Life) খুবই কম। মাশরুম তুলে আনার পরপরই এর বর্ণ ও গঠনে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। তাই সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করলে বর্ণ ও গঠন ঠিক রেখে বেশিদিন ব্যবহার করা যায়। মাশরুম ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হলে কিছু বিষয় সব সময় মেনে চলতে হয়। যেমন-

ক) মাশরুম সঠিক সময়ে অর্থাৎ পরিপক্ক অবস্থায় তুলতে হবে।

খ) যথা নিয়মে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) সংরক্ষণ অবশ্যই ঠাণ্ডা বায়ুরোধী অবস্থায় করতে হবে।

### তাজা মাশরুম

- তাজা মাশরুম তোলার ১২ ঘণ্টা পূর্বে সরাসরি গায়ে পানি স্প্রে না করলে সেই মাশরুম তুলে, কেটে গ্রেডিং করে পলিপ্রোপাইলিন(পিপি) ব্যাগের মধ্যে বায়ুরোধী বা সিলিং করে ঠান্ডা জায়গায় ২ থেকে ৩ দিন রেখে খাওয়া যায়।

- রেফ্রিজারেটরে (৪-১০°সে.) বায়ুরোধী প্যাকেটে ৭/৮ দিন রেখে খাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্যাকেটটি রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে পুরো প্যাকেটের মাশরুম একবারে খেয়ে ফেলতে হবে।
- বাসাবাড়িতে দীর্ঘ দিন রেখে খাওয়ার জন্য ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২ থেকে ৩ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে টিফিন বক্সে অথবা ঢাকনাযুক্ত কৌটায় নিম্ন তাপমাত্রায় (Deep freezing) ৫ থেকে ৬ মাস রাখা যাবে।
- এছাড়া মাশরুম লবণ দ্রবণে ব্লানচিং করে ৫-৬ মাস রেখে খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্লানচিং করা পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২ থেকে ৫ মিনিট মাশরুম সিদ্ধ করতে হয়। এরপর বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ২% লবণ (সোডিয়াম/পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট) ও ১% সাইট্রিক এসিড মিশ্রিত লবণ দ্রবণে বায়ুরোধী করে জীবাণুমুক্ত করার পর ঠাণ্ডা করে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

## শুকনা মাশরুম

মাশরুম রোদে, যান্ত্রিক বা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে শুকিয়ে বায়ুরোধী প্যাকেটে ৫-৬ মাস রেখে সংরক্ষণ করা যায়। শুকনা মাশরুম ব্লেন্ডার মেশিনে পাউডার করে বায়ুরোধী প্যাকেটে রেখে একই ভাবে ৫-৬ মাস সরক্ষণ করা যায়।

চিত্র: ৪.৯ শুকনা মাশরুম

**মাশরুম শুকানোর পদ্ধতি:** গ্রামীণ পর্যায়ে মাশরুম শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে প্যাকেট করে ৫-৬ মাস অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়। সোলার ড্রায়ারে মাশরুম শুকানো যেতে পারে। মাশরুম শুকানো পদ্ধতি নিম্নরূপ-

- মাশরুমের ডাঁটার নিচের অংশ কেটে পরিষ্কার করতে হয় ।
- পানি ফুটিয়ে তাতে ২ ভাগ লবণ দিতে হয়।
- লবণ পানিতে ২-৩ মিনিট মাশরুম ডুবিয়ে রাখতে হয়।
- মাশরুমগুলো তুলে একটি ট্রেতে রেখে ঠান্ডা করা হয়।
- ট্রেতে মাশরুম ছড়িয়ে সাজিয়ে রাখা হয় যাতে একটি মাশরুম অন্যটির উপর না পড়ে।
- ২-৩ দিন পরপর রোদে শুকাতে হয়। শুকানোর পর মাশরুম শুকনো পাতার মতো মচমচে হয়।
- শুকনা মাশরুম পলিব্যাগে ভরে মুখ বায়ুরোধী বা সিল করতে হয়।
- শুকনা মাশরুম ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হয়।

চিত্র: ৪.১০ শুকনা মাশরুম প্যাকিং

সাধারণত ১০০ গ্রাম তাজা মাশরুম থেকে ১০ গ্রাম শুকনো মাশরুম পাওয়া যায়। শুকানো ছাড়া মাশরুম সংরক্ষণের একটি সহজ পদ্ধতি হলো ১৮-২০% লবণের দ্রবণে ১% সাইট্রিক এসিড দিয়ে রাখা। এভাবে

মাশরুম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। শুকানো মাশরুম খাবার আগে প্যাকেট থেকে বের করে হালকা গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে পূর্বের ন্যায় তাজা হয়ে যাবে।

## ৪.৬ মাশরুম থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য

মাশরুম এমন একটি সবজি যা বিচিত্রভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত রুচিকর ও রকমারি খাবার তৈরি করা সম্ভব। মাশরুম দিয়ে চাইনিজ ও পাঁচতারা হোটেলে বিভিন্ন প্রকার মুখরোচক খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে মাশরুম দিয়ে অনেক রকম খাবার তৈরি করা যায়। আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে মাশরুম হতে তৈরি খাবার নিয়মিত খেতে পারলে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব। নিম্নে মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন খাবার তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

১. মাশরুম ফ্রাই
২. মাশরুম সবজি
৩. মাশরুম নুডলস
৪. মাশরুম চিকেন বিরিয়ানি
৫. মাশরুম চিকেন স্যুপ
৬. মাশরুম ওমলেট
৭. মাশরুম স্যান্ডউইচ
৮. মাশরুম আচার
৯. মাশরুম দিয়ে মাংস (গরু, খাসি ও মুরগি)
১০.মাশরুম চিংড়ি
১১.মাশরুম চটপটি
১২.মাশরুম সস
১৩.মাশরুম পিৎজা
১৪.মাশরুম রোল ইত্যাদি

মাশরুম শুধু কাঁচা অবস্থায় রান্না করে খাওয়া যায় না, শুকনা মাশরুমও বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। নিম্নে শুকনা মাশরুমের রন্ধনপ্রণালি দেয়া হলো।

### রন্ধনপ্রণালি

**শুকনা মাশরুমকে রান্নার উপযোগী করা:** কাঁচা মাশরুম ধুয়ে নিয়ে সরাসরি রান্নায় ব্যবহার করা যায় কিন্তু শুকনা মাশরুমকে রান্না করার আগে কাঁচা মাশরুমের মতো নরম করে নিতে হয় । এক্ষেত্রে নিচের খাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

- মাশরুমের পরিমাণ অনুসারে পানি এমনভাবে নিতে হবে যেন মাশরুমগুলো খুব সহজেই ভিজতে পারে।
- পানিতে সামান্য লবণ দিয়ে ফোটাতে হবে (এজন্য ১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ লবণ দিলেই যথেষ্ট হবে)।
- ফুটন্ত পানি চুলা থেকে নামিয়ে শুকনা মাশরুমগুলো ছেড়ে দিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এতে শুকনা মাশরুম কাঁচা মাশরুমের মতো নরম হয়ে যাবে। তারপর পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

## ৪.৭ মাশরুম ফ্রাই

মাশরুম ফ্রাই এর অপর নাম মামাচিং। নাস্তা হিসেবে এই ফ্রাই চা এর সাথে পরিবেশন করা হয়। এই ফ্রাই তৈরি করতে মাশরুম ১০-১২টি, ডিম ১টি, ছোলার বেসন ১০০ গ্রাম, লবণ, গোল মরিচের গুঁড়া, সয়াবিন তেল পরিমাণমত লাগবে। প্রথমে মাশরুম ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। তারপর, ডিম, বেসন, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে ঘন করে মিশ্রণ তৈরি করতে হয়। মাশরুমগুলো মিশ্রণে ভালোভাবে ডুবিয়ে নিতে হয়। পাত্রে তেল গরম করে একত্রে কয়েকটি মাশরুম ভেজে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

চিত্র: ৪.১১ মাশরুম ফ্রাই

## ৪.৮ মাশরুম স্যুপ ও মাশরুম চিকেন স্যুপ

**মাশরুম স্যুপ:** স্যুপ রান্নার জন্য উপকরণ নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| তাজা মাশরুম | ২০০ গ্রাম |
| ডিম | ২ টি |
| কর্ন ফ্লাওয়ার | ১/৪ কাপ |
| লবণ | ১ চা চামচ |
| সিরকা | ১ চা চামচ |
| সয়াসস | ১ টেবিল চামচ |
| পেঁয়াজ কুচি | ২ টেবিল চামচ |
| কাঁচা মরিচ কুচি | ৪ টি |
| টেস্টিং সল্ট | ১/৪ চা চামচ |
| গোল মরিচ গুঁড়া | ১/৪ চা চামচ |

### প্রস্তুত প্রণালি

- প্রথমে মাশরুম কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে।
- সসপ্যান বা পাত্রে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ কুচি, মাশরুম কুচি ও লবণ একসঙ্গে দিয়ে নাড়তে হবে।
- সব উপকরণ নরম হয়ে গেলে তাতে সয়া সস দিতে হবে।
- পাত্রে ৮ কাপ পানি দিয়ে ভালভাবে ফুটাতে হবে।

চিত্র: ৪.১২ মাশরুম স্যুপ

- ১ কাপ ঠান্ডা পানিতে কর্ন ফ্লাওয়ার মিশিয়ে স্যুপের মধ্যে ঢেলে চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে।
- ডিমের সাদা অংশ কাঁটা চামচ দিয়ে ফেটে স্যুপের মধ্যে এমনভাবে মেশাতে হবে যেন স্যুপে চিকন চিকন রেখা ফুটে উঠে।
- সর্বশেষ টেস্টিং সল্ট মিশিয়ে চুলা হতে নামাতে হবে।
- পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এ মাশরুম স্যুপ খেতে খুবই সুস্বাদু।

**মাশরুম চিকেন স্যুপ:** মাশরুম চিকেন স্যুপ তৈরির জন্য মাশরুম ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি, মুরগির স্টক ৪ কাপ, বাটার অয়েল ২০ গ্রাম, আদা ২৫ গ্রাম, পানি ৩ কাপ, লবণ ও পরিমাণমত টেস্টিং সল্ট লাগবে। মুরগির স্টক তৈরির জন্য ৩০০-৪০০ গ্রাম ওজনের একটি মুরগি আড়াই লিটার পানিতে পরিমাণমত লবণ ও আদা দিয়ে ৩০-৪৫ মিনিট সিদ্ধ করা হয়। মাংস নরম হয়ে আলাদা হয়ে গেলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে মাংস হতে হাঁড় আলাদা করা হয় এবং হাড়বিহীন এই মাংস পানির সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। মাশরুম ও পেঁয়াজ চাকা করে কেটে বাটার অয়েল দিয়ে হালকা করে ভেজে নেওয়া হয়। এবার উক্ত ভাজা মাশরুম, মুরগির হাঁড় ও মাংস সিদ্ধ স্টক পানিতে ৫-১০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হয়। প্রয়োজনমত লবণ ও একটি কাপে অল্প পানিতে কর্ন ফ্লাওয়ার গুলিয়ে স্টক পানিতে যোগ করা হয়। ২-৩ মিনিট সিদ্ধ করার পর টেস্টিং সল্ট মিশিয়ে চুলা হতে নামিয়ে সসসহ পরিবেশন করা হয়।

## ৪.৯ মাশরুম স্যান্ডউইচ ও বার্গার

**মাশরুম স্যান্ডউইচ:** স্যান্ডউইচে সাধারণত মাংস, মাছ কিংবা ডিম দেয়া হয়। মাছ, মাংস, ডিমের পরিবর্তে মাশরুম দেয়া হলে স্যান্ডউইচ সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সম্পন্ন হয়। যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগে তারা এই স্যান্ডউইচ খেতে পারবে। সেক্ষেত্রে বাটারের পরিবর্তে কোলেস্টেরল মুক্ত কর্ন অয়েল ব্যবহার করতে হবে। এটি তৈরিতে মাশরুম ৫০ গ্রাম, বাটার ৫০ গ্রাম, পাউরুটি ১টি, পরিমাণমতো পেঁয়াজ, লবণ ও সালাদ ব্যবহার করা হয়। প্রথমে মাশরুমগুলো স্লাইস করে কেটে নিতে হয়। তারপর ফ্রাই-প্যানে বাটার বা কর্ণ অয়েল বা ভেজিটেবল অয়েলের মধ্যে পেঁয়াজ, লবণ যোগ করে মাশরুম হালকা করে ভেজে নিতে হয়। তারপর দুই পিস পাউরুটির ভিতরে ভাজা মাশরুম সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপর মেয়নেজ, টমেটো, পেঁয়াজ ইত্যাদির সাথে পরিবেশন করা হয়।

চিত্র: ৪.১৩ মাশরুম স্যান্ডউইচ

**মাশরুম বার্গার:** মাশরুম বার্গার তৈরি করতে নিম্নলিখিত উপকরণগুলো প্রয়োজন হবে।

| উপকরণ (দুটি বার্গারের জন্য) | পরিমাণ |
|---|---|
| ১। মাশরুম (তাজা/ফ্রেস) | ২০০ গ্রাম |
| ২। ডিম | ১টি |
| ৩। পাউরুটি | ২ স্লাইস |
| ৪। পেঁয়াজ কুচি | ১/২ কাপ |

২০২৪

| | |
|---|---|
| ৫। কাঁচা মরিচ কুচি | ২টি |
| ৬। ধনেপাতা কুচি | ১ টেবিল চামচ |
| ৭। লবণ, গোল মরিচ গুঁড়া, জিরার গুঁড়া | পরিমাণমতো |
| ৮। বনরুটি | ২টি |
| ৯। তেল | ভাঁজার জন্য |
| ১০। লেটুসপাতা | সাজানোর জন্য |

**প্রস্তুত প্রণালি**

- তাজা মাশরুমগুলো ধুয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। চুলায় পাত্র বসিয়ে দুই কাপ পানি গরম করতে হবে। গরম পানিতে মাশরুম ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। মাশরুম সিদ্ধ হলে ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- একটি পাত্রে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, লবণ, গোল মরিচ গুঁড়া ও জিরার গুঁড়া এক সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার সিদ্ধ মাশরুম কুচি, পাউরুটি কুচি ও ডিম দিয়ে ভালো করে পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। পেস্ট এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এটি দিয়ে চপ/কাবাব তৈরি করা যায়। মিশ্রণ নরম হয়ে গেলে প্রয়োজনে টোস্ট বিস্কিটের গুঁড়া মেশানো যেতে পারে। এবার বনরুটির ব্যাসের সমান আকৃতির কাবাব তৈরি করে তেলে ভাজতে হবে।

চিত্র: ৪.১৪ মাশরুম বার্গার

- বনরুটি মাঝখানে কেটে দুইভাগ করে নিতে হবে। বনরুটির দুইভাগের মাঝখানে কাবাব ও লেটুস পাতা বা টমেটো স্লাইচ বসিয়ে দিলেই মজাদার মাশরুম বার্গার তৈরি হয়ে যাবে।

## ৪.১০ মাশরুমের চিকেন বিরিয়ানি ও মাশরুম নুডলস

**মাশরুম চিকেন বিরিয়ানি:** এই বিরিয়ানি রান্নার জন্য মাশরুম ২৫০ গ্রাম, মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, পোলাও চাল ৫০০ গ্রাম, সয়াবিন তেল ১৫০ গ্রাম, আদা, জিরা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ করে, হলুদ বাটা আধা টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২০০ গ্রাম, গরম মসলা ১০ গ্রাম ও লবণ পরিমাণমত নিতে হয়। প্রথমে মুরগির মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিতে হয়। চুলায় কড়াই বা পাতিল বসিয়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিতে হয়। পেঁয়াজ লাল হয়ে উঠলে আদা, রসুন ও জিরা বাটা মিশিয়ে নাড়তে হয়। অন্য একটি পাত্রে মাশরুম হালকা তেলে ভেজে মুরগির মাংসের মধ্যে মিশিয়ে নিতে হয়। মাশরুম দেওয়ার পর অতিরিক্ত পানি কমিয়ে নিয়ে চুলা হতে উঠিয়ে রাখতে হয়। চাল ধুয়ে ভালোভাবে অন্য পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ দিয়ে যতক্ষণ চাল লাল বর্ণের না হয় ততক্ষণ নাড়তে হয়। এভাবে চাল লাল বর্ণের হয়ে গেলে তাতে পরিমাণমত পানি যোগ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। পানি ফুটার পর চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে তাতে উঠিয়ে রাখা মাশরুম ও মাংসের মিশ্রন মিশিয়ে দিয়ে আবার ঢেকে রাখতে হয়। তারপর পানি পুরোপুরি কমে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা হয়।

**মাশরুম নুডলস:** মাশরুম নুডলস তৈরি করতে মাশরুম ২৫০ গ্রাম, নুডলস ১০০ গ্রাম, ডিম ২টা, তেল ৫০ গ্রাম, কাঁচা মরিচ ৪-৫টা, লবণ পরিমাণমত নিতে হয়। প্রথমে মাশরুম হাতে ছিঁড়ে হালকা গরম পানিতে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর নুডলস সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। চুলায় কড়াইতে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি যোগ করে নাড়তে হয়। পেঁয়াজ কিছুটা নরম হয়ে আসলে তাতে ডিম মিশিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে তারপর লবণ ও মরিচ সহযোগে নুডলস ও মাশরুম দিতে হয়। এরপর পুরো মিশ্রণটি ভালোভাবে নেড়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

এছাড়াও মাশরুম দিয়ে অন্যান্য খাবার যেমন মাংস (গরু, খাসি ও মুরগি) দিয়ে মাশরুম, মাশরুম চিংড়ি, মাশরুম চটপটি, মাশরুম সস, মাশরুম পিৎজা, রোল প্রভৃতি খাদ্য তৈরি করা যায়। উন্নত বিশ্বে দৈনন্দিন খাবারে ও অতিথি আপ্যায়নে মাশরুম অপরিহার্য। যেমন উৎসবে বা বিশেষ আয়োজনে খাবার অলংকরণে মাশরুমের জুড়ি নেই। শুকনো ও পাউডার মাশরুম বিভিন্ন তরকারিতে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়াও পাউডার মাশরুম চা, কফি, দুধ এবং পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায়।

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপেরিমেন্ট শিট)

## জব নং-০১

১। জবের নাম: **মাশরুমের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ ।**

২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১.১ কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করবে।
১.২ কাজের জায়গা প্রস্তুত করবে।
১.৩ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
১.৪ কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ও বয়সের মাশরুম সংগ্রহ করবে।
১.৫ মাশরুমের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করবে।
১.৬ বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করবে।
১.৭ অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।
১.৮ কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল সংরক্ষণ করবে।
১.৯ কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস

- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পাত্র
- প্লাস্টিকের বোল
- আতশি কাঁচ (বড় ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস)
- কিছু তাজা মাশরুম
- নিডল
- চিমটা
- পেন্সিল
- কাগজ
- রাবার

## ৪। মাশরুমের বিভিন্ন অংশ

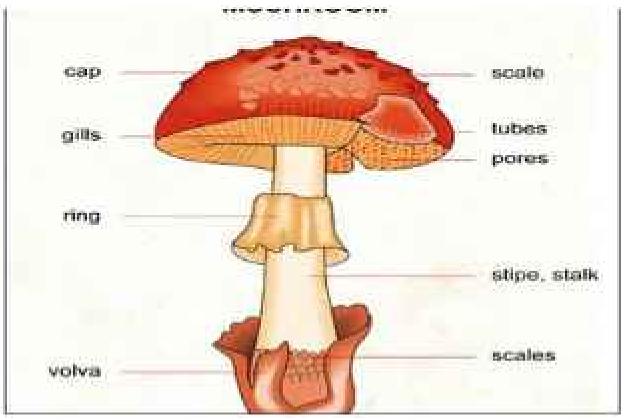


## ৫। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ও বয়সের মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।
- মাশরুমের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে।
- টুপির মতো ছড়ানো অংশ 'পিলিয়াস' চিহ্নিত করতে হবে।

২০২৪

- টুপি বা ছাতার নিচের অংশ 'ভিল' চিহ্নিত করতে হবে।
- মাশরুমের দণ্ড বা ডাটা চিহ্নিত করতে হবে।
- বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য আতশি কাঁচ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মাশরুমের বিভিন্ন অংশের ছবি বড় সাইজের ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে হবে।
- বিভিন্ন জাতের মাশরুম যেমন- ঝিনুক মাশরুম, দুধ মাশরুম, খড় মাশরুম, ঋষি মাশরুম, বাটন মাশরুম, শিতাকে মাশরুম ও কান মাশরুম ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারবে।
- কাগজে বা ড্রয়িং শীটে শনাক্তকৃত বিভিন্ন মাশরুমের চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা

- মাশরুম তাজা হতে হবে।
- পরীক্ষণের সময় ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিতে হবে।
- অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস পরিধান করতে হবে।
- মাশরুমের বিভিন্ন অংশ সতর্কতার সাথে পৃথক করতে হবে।
- বিভিন্ন জাতের মাশরুম নিয়ে এই জবটি ছয়বার করতে হবে।

## জব নং-০২

১। জবের নাম: **মাশরুমের ফ্রাই তৈরিকরণ।**

২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

২.১ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.২ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।

২.৩ মাশরুম ব্যতিত অন্যান্য উপকরণে পানি দিয়ে ঘন করে মিশ্রণ তৈরি করবে।

২.৪ মিশ্রণে মাশরুমের টুকরাগুলো ঢেলে দিবে।

২.৫ কড়াইতে তেল গরম হলে ঘন মিশ্রণে মিশানো মাশরুমের টুকরা ডুবো তেলে অল্প আঁচে বাদামি করে ভেজে তুলবে।

২.৬ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।

২.৭ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস

২০২৪

- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক
- পাত্র
- কড়াই
- হাতল
- চামচ
- প্লাস্টিকের বোল
- তাজা মাশরুম
- ডিম
- ময়দা বা বেসন
- লবণ
- গোলমরিচ গুঁড়া
- আদা বাটা
- সয়াবিন তেল
- চালের গুঁড়া বা সুজি
- ডিজিটাল ব্যালেন্স
- সিলিং মেশিন

## ৪। অন্যান্য দ্রব্যাদি

| | | |
|---|---|---|
| ১ | তাজা মাশরুম | ১০০ গ্রাম (শুকনো ২৫ গ্রাম) |
| ২ | ডিম | ১ টি |
| ৩ | ময়দা | ২ টেবিল চামচ |
| ৪ | লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, আদা বাটা ও সয়াবিন তেল | পরিমাণমতো |
| ৫ | চালের গুঁড়া বা সুজি | ১/৪ কাপ |

## ৫। কাজের ধারা

- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।
- মাশরুম ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

- একটি পাত্রে ডিম ভেঙে নিতে হবে।
- তারপর তাতে বেসন, চালের গুঁড়া, আদা বাটা, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া পরিমাণমত দিতে হবে।
- এরপর এতে পানি দিয়ে ঘন করে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।
- মিশ্রণে মাশরুমের টুকরোগুলো ঢেলে দিতে হবে।
- কড়াইতে তেল গরম হলে ঘন মিশ্রণে মিশানো মাশরুমের টুকরোগুলো ডুবো তেলে অল্প আঁচে বাদামি করে ভেজে তুলতে হবে।
- গরম অবস্থায় সসসহ পরিবেশন করতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস্/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৬। বিশেষ নির্দেশনা:

- মাশরুম হালকা আঁচে ভাজতে হবে।
- মাশরুম ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- জবটি সাতবার করতে হবে।

# অনুশীলনী-০৪

## অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাধারণ সবজির মতো মাশরুম মাটিতে জন্মায় না কেন?

২. সাধারণত কী কী জিনিসের উপর মাশরুম জন্মায়?

৩. বাংলাদেশের মাশরুমের কয়টি জাত বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়?

৪. কোন মাশরুম কাঠের গুঁড়িতে চাষ করা হয়?

৫. কোন মাশরুম ওষধি মাশরুম হিসেবে পরিচিত?

৬. কোন মাশরুমের উপরের স্তর গাঢ় লাল হয়?

৭. মাশরুমে কয়টি অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়?

৮. মাশরুমের আরগোস্টেরল কী কাজে লাগে?

৯. মাশরুমের আঁশের পরিমাণ কম হওয়ায় কোন রোগীর জন্য বেশি উপকারী?

১০. মাশরুমের সেলিনিয়াম কী কাজ করে?

১১. লিভার সুরক্ষায় কোন মাশরুম বেশি কার্যকর?

১২. তাজা মাশরুম ফ্রিজের নরমাল চেম্বারে কতদিন রাখা যায়?

১৩. শুকনা মাশরুম কতদিন রেখে খাওয়া যায়?

১৬. মাশরুম ব্লাঞ্চিং করে ডিপ ফ্রিজে কতদিন রাখা যায়?

১৭. মাশরুম কোন খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ সবজি?

১৮. মাশরুম ফ্রাই এর অপর নাম কী?

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে চাষকৃত ৮টি মাশরুমের নাম লেখ।

২. ঝিনুক বা ওয়েস্টার মাশরুমের বর্ণনা দাও।

৩. মিল্কি মাশরুমের বৈশিষ্ট্য লেখ।

৪. বাটন মাশরুমের বর্ণনা দাও।

৫. স্ট্র মাশরুমের পরিচিতি দাও।

৬. মাশরুমে বিদ্যমান ৯টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের নাম লেখ।

৭. মাশরুমে কী কী ঔষধি উপাদান পাওয়া যায়?

৮. মাশরুম কেন সংরক্ষণ করা উচিত।

৯. তাজা মাশরুম সংরক্ষণের ২টি পদ্ধতি লেখ।

১০. মাশরুম শুকানোর পদ্ধতি লেখ।

১১. মাশরুম দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যের নাম লেখ।

## রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মাশরুমের পরিচিতি ও গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২. মাশরুমের পুষ্টি উল্লেখ করে এর প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা ও মিনারেলস সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩. মাশরুমের ভেষজ মূল্যের বিবরণ দাও।

৪. মাশরুম ফ্রাই, মাশরুম স্যুপ ও মাশরুম চিকেন স্যুপ তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. মাশরুম স্যান্ডউইচ, মাশরুম বার্গার ও মাশরুম চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

# তাল ও নারিকেলের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও উৎপাদিত খাদ্য

# Introduction to palm and coconut, nutrition and food products

বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলেই তাল ও নারিকেল গাছ দেখা যায়। তাল, নারিকেল, খেজুর, সুপারি- এগুলো সব একই পরিবারের উদ্ভিদ। তাল বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। পাতার আগা সুচালো হওয়ায় বজ্রপাতরোধক হিসেবে এই ফল গাছের আবাদ বেশ জনপ্রিয়। বর্তমানে আমাদের দেশে এই গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। গাছ গজানোর ১২-১৩ বছর পর ফল ধরে বলে তাল গাছ অনেকে লাগাতে চায় না। নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। এটা এমন এক বৃক্ষ যার প্রতিটি অঙ্গ জনজীবনে কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগে। এ গাছের পাতা, ফুল, ফল, কান্ড, শিকড় সব কিছুই বিভিন্ন ছোট-বড় শিল্পের কাঁচামাল, মুখরোচক নানা পদের সুস্বাদু খাবার তৈরির উপকরণ, পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, সুস্বাদু পানীয়, রোগীর পথ্য ইত্যাদি বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হওয়ায় এটি পৃথিবীতে একটি অপূর্ব গাছ তথা 'স্বর্গীয় গাছ' হিসেবে সবার কাছে সমাদৃত ও সুপরিচিত।

### এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- তাল ও নারিকেলের পুষ্টিমান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জিলাপি, তালের পিঠা, কেক ইত্যাদি) তৈরি করতে পারব।
- নারিকেল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য (নারিকেল দুধ, চিড়া, শন, নাড়ু, বরফি, সন্দেশ, পুডিং, ক্যান্ডি বা চকলেট ইত্যাদি) তৈরি করতে পারব।

## ৫.১ তালের পরিচিতি

চিত্র ৫.১ সারিবদ্ধ তাল গাছ

তালের কোন অনুমোদিত জাত নেই। তবে এদেশে বিভিন্ন আকার ও রংয়ের তাল দেখা যায়। আবার কোন কোন তাল গাছে বারমাসই কমবেশী তাল ধরে থাকে। তাল একটি অতি প্রাচীন ও অপ্রচলিত ফল। তাল গাছ সাধারণত ৬০-৭০ ফুট লম্বা হয়। কাণ্ড গোলাকার, সরল ও দীর্ঘ এবং পাতা হাত পাখার ন্যায় তবে আকারে অনেক বড় হয়। পাতার অনেক উচু শিরা থাকে। শিরাগুলো পত্রদণ্ডের গোড়া হতে অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাঁটার মত। পত্রদণ্ডের উভয় কিনারায় করাতের মত কালো বর্ণের দাঁত আছে। ইহা একটি ভিন্নবাসী উদ্ভিদ, পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। সাধারণত জানুয়ারি-মার্চ মাসে তালের ফুল ধরে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে তাল পাকে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ তাল গাছের ফুলের ছড়াতে ট্যাপিং (Tapping) করে রস সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট হাঁড়ি বেশ কয়েকটি এক সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রস সংগ্রহ করা যায়। তবে স্ত্রী গাছে ফল ধরে বলে তাতে ট্যাপিং করা হয় না। বাংলাদেশের সব এলাকায় কমবেশি তাল উৎপাদন হলেও ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয়।

### ৫.১.১ তালের ব্যবহার

পাকা তালের রস গুড় বা চিনি, নারিকেল কোরা এবং দুধ সহযোগে রান্না করে উত্তম মিষ্টান্ন তৈরি করা যায়।

চিত্র ৫.২ কঁচি তালের শাঁস

চিত্র ৫.৩ তাল মিছরি

তালের পিঠা সুঘ্রাণযুক্ত ও উপাদেয়। কাঁচা তাল অর্থাৎ তালের শাঁস বেশ উপাদেয় একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। কচি তালের শাঁস শর্করা সমৃদ্ধ একটি আকর্ষণীয় খাবার। অঙ্কুরিত তালের ভিতরের শাঁস খেতে বেশ সুস্বাদু এবং এটি থেকে উৎকৃষ্ট মোরব্বা তৈরি করা যায়। তালের রস একটি সরস পানীয়। এর রস থেকে গুড় তৈরি করা যায়। তালের গুড় খেজুরের গুড়ের মতো উন্নতমানের না হলেও তালের তৈরি 'তাল মিছরি' (দানা বাঁধা চিনি) বেশ জনপ্রিয়। বাজারে তাল মিছরির যথেষ্ট দাম রয়েছে। আয়ুর্বেদী মতে তাল মিছরি শিশুদের সর্দি কাশি নিরাময়ে অতীব উপকারী।

### ৫.১.২ তালের পুষ্টিমান

২০১৪

কাঁচা তালের শাঁস, পাকা তালের রস, গুড় এমনকি অঙ্কুরিত তালের আঁটির শাঁস সবই সুস্বাদু ও প্রিয় খাবার। তালের পুষ্টিমান নিম্নে দেওয়া হলো-

**সারণি ৫.১: তালের পুষ্টিমান (আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)**

| ক্রমিক নং | উপাদান | পাকা তাল | কচি তালের শাঁস |
|---|---|---|---|
| ১ | জলীয় অংশ (গ্রাম) | ৭৭.২ | ৮৭.৬ |
| ২ | আমিষ (গ্রাম) | ০.৭ | ০.৮ |
| ৩ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ২০.৭ | ৬.৫ |
| ৪ | চর্বি (গ্রাম) | ০.২ | ০.১ |
| ৫ | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.৭ | ০.২ |
| ৬ | আঁশ (গ্রাম) | ০.৫ | ১ |
| ৭ | খাদ্য শক্তি (কি.ক্যালরি) | ৮৭ | ২৯ |

## ৫.১.৩ তালের হতে তৈরী খাদ্যদ্রব্য

ভাদ্র মাসে তাল পাকে। আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জে এ সময়ে গৃহিণীরা পাকা তাল দিয়ে বিভিন্ন মজাদার খাবার তৈরি করে থাকেন। তাল থেকে যে সকল খাবার তৈরি করা যায় তা হলো-

১. তালের গোলা
২. তালের বড়া পিঠা
৩. তালের খেজুর পিঠা
৪. তালের মাল পোয়া
৫. তালের জিলাপি
৬. তালের ভাপা পিঠা
৭. তালের কেক
৮. তালের পুলি ও নকশি পিঠা
৯. তালের ক্ষীর
১০. তালের চুষী পিঠা
১১. তালের রোল
১২. তালের রসমালাই
১৩. তালের জ্যাম ও জেলি
১৪. কচি তালের প্রিজার্ভ ও ক্যান্ডি
১৫. তাল দুধ

চিত্র ৫.৪ তালের গোলা

**তালের গোলা তৈরি:** প্রথমে পাকা তাল সংগ্রহ করতে হবে। পাকা তালের ফল থেকে ঘ্রাণ বের হবে, চামড়া চকচকে ও নরম হবে। পাকা তাল গাছ থেকে আপনা-আপনি নিচে পড়ে। তাল যদি একটু শক্ত থাকে তাহলে দুইদিন ঘরে রাখলেই নরম হয়ে যায়। পাকা তালের চামড়া হাত দিয়ে টেনে ছিলে ফেলা যায়। ভিতরের নরম আঁটি যদি একটু শক্ত হয় তাহলে হাত দিয়ে কোয়া তিনটি ঢিলা করে নিয়ে কিছুক্ষণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তলায় ডেকচি রেখে বেতের চালুনির উপর তালের আঁটি ঘষে রস বা গোলা বের করে নেওয়া হয়। গোলার তিতা দূর করার জন্য পাতলা কাপড়ে সম্পূর্ণ গোলা নিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে সমস্ত কষ নিচে ঝরে গিয়ে গোলা মিষ্টি হয়ে যায়। ঝুলিয়ে না রেখে, চালুনির উপর পুঁটলিটা আনুমানিক ৪-৫ ঘন্টা বসিয়ে রাখলেও কষ ঝরে যায়। এরপর মিষ্টি গোলা দিয়ে বড়া, ক্ষীর, মালপোয়া ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

চিত্র ৫.৫ তালের বড়া

**তালের বড়া:** প্রথমে পাকা তাল থেকে গোলা সংগ্রহ করে ছেঁকে নিতে হয়। ছাঁকার সুবিধার জন্য গোলাতে সামান্য পানি মিশানো যেতে পারে। তারপর এই গোলা চুলায় জ্বাল দিতে হয়। একটু ঘন হয়ে এলে জ্বাল দেওয়া বন্ধ করে চুলা থেকে নামাতে হয়। অতঃপর ঘন রসের সাথে পরিমাণমত চালের গুঁড়া, গুড় বা চিনি ও প্রয়োজনমত মসলা যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হয়। বড়া তৈরির জন্য তালের গোলা রুটির খামিরের মতো শক্ত না রেখে একটু পাতলা করতে হয়। চুলায় তেল গরম করে উক্ত মিশ্রণটি চামচ দিয়ে তুলে ডুবা তেলে ছেড়ে দিতে হয়। লালচে বাদামী রঙের হয়ে উঠলে ডুবা তেল হতে উঠিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এভাবে তালের বড়া বা পিঠা ভেজে গরম গরম পরিবেশন করা হয়।

## ৫.১.৪ তালের জ্যাম ও জেলি

চিত্র ৫.৬ তালের জ্যাম

**তালের জ্যাম:** তাল থেকে উন্নত মানের জ্যাম তৈরি করা যায়। পাকা তালের আঁটির ওজনের তিন ভাগের একভাগ পানি যোগ করে চটকিয়ে তালের গোলা বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। তালের জ্যাম তৈরির জন্য এক কেজি গোলার সাথে ১ কেজি চিনি, ১১.৫ গ্রাম পেকটিন, ১২.৫ গ্রাম সাইট্রিক এসিড এবং ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট প্রয়োজন হয়। গোলার সাথে চিনি যোগ করে জ্বাল দেওয়া হয়। রান্নার মাঝামাঝি পর্যায়ে পেকটিন যোগ করা হয়। দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ (Total Soluble Solids বা TSS) এর পরিমাণ কমপক্ষে ৬৫% না হওয়া পর্যন্ত চুলায় জ্বাল দিতে হয়। দ্রবনের টিএসএস রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে শীটিং পরীক্ষা করতে হয়। এক চামচ মিশ্রণ নিয়ে ঠান্ডা করে মিশ্রণ পড়তে দেওয়া হয়। যদি এটা একাধারে শীটের আকরে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে। শীটিং পরীক্ষায় জ্যাম প্রস্তুত হওয়ার কাছাকাছি বুঝা গেলে সাইট্রিক এসিড পাউডার অল্প অল্প করে যোগ করে সামান্য একটু জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর অল্প পরিমাণ পানিতে সোডিয়াম বেনজোয়েট যোগ করে মিশ্রণে দেওয়া হয়। জ্যাম জীবাণুমুক্ত বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র ৫.৭ তালের জেলি

**তালের জেলি:** জেলি জ্যামের মতোই এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত অর্ধকঠিন খাদ্য। তবে এখানে তালের পরিবর্তে তালের রস ব্যবহার করা হয়। জেলি তৈরির জন্য কমপক্ষে ৪৫% ফলের রস ও ৫৫% চিনি প্রয়োজন হয়। এটি জ্যামের মতো দেখতে তবে অনেকটা স্বচ্ছ। জেলি তৈরির ক্ষেত্রে পাকা ও নিখুঁত তাল হতে হবে, চিনি ময়লাবিহীন হতে হবে, পেকটিনের ক্ষমতা সন্তোষজনক হতে হবে, প্রিজারভেটিভ হিসেবে কেএমএস বা সোডিয়াম বেনজোয়েট দিতে হবে। মিশ্রণটি জ্বাল দিয়ে জেলি হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে নামাতে হবে।

## ৫.১.৫ তালের জিলাপি

**উপকরণ :**

| | |
|---|---|
| ঘন তালের গোলা | ২ কাপ |
| দুধ | ২ লিটার |
| ছানা | ১ কাপ |
| ময়দা | ৩ টেবিল চামচ |
| চিনি | ২ টেবিল চামচ |
| ঘি | ২ টেবিল চামচ |
| এলাচ গুঁড়া | সামান্য |
| বেকিং পাউডার | সামান্য |
| সিরার জন্য চিনি | ৫ কাপ |
| পানি | ৬ কাপ |
| গুঁড়া দুধ | ২ টেবিল চামচ |

চিত্র ৫.৮ তালের জিলাপি

**প্রস্তুত প্রণালি**

- চিনি ও পানি একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে গাদ কাটিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে রাখতে হবে।
- তরল দুধ জ্বাল দিয়ে নেড়েচেড়ে ঘন করে নিতে হবে।
- ময়দা, ঘি ও বেকিং পাউডার ২ টেবিল চামচ চিনির সাথে মিশিয়ে রাখতে হবে।
- ছানা হাতের তালু দিয়ে মসৃণ করে ডলে এবং পূর্বে রাখা তালের গোলা, এলাচ গুঁড়া ও বাদাম দেওয়া ময়দা সব একসঙ্গে মাখিয়ে জিলাপির মত আকার বিশিষ্ট করে নিতে হবে।
- দুই কাপ তেল ও ২ টেবিল চামচ ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় গরম করতে হবে।
- তেল গরম হলে কাঁচা জিলাপিগুলো কম আঁচে লালচে রং না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। ভাজা জিলাপি তেল ঝরিয়ে গরম অবস্থায় সিরায় ছাড়তে হবে।
- সব জিলাপি সিরায় দেয়ার পর চুলায় ২০-২৫ মিনিট ফুটিয়ে তারপর চুলা হতে নামিয়ে ৫-৬ ঘণ্টা একই সিরায় ডুবিয়ে রাখতে হবে।
- সিরা থেকে উঠিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

## ৫.১.৬ তালের পিঠা ও কেক

চিত্র ৫.৯ তালের ভাপা পিঠা

**তালের ভাপা পিঠা:** এই পিঠা তৈরি করতে তালের গোলা ৬ কাপ, গুড় ২ কাপ, চালের গুঁড়া ৮ কাপ, এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ, নারিকেল কোরা ২ কাপ নিতে হয়। প্রথমে পাকা তাল থেকে তালের গোলা তৈরি

করে গুড় ও চালের গুঁড়া একসঙ্গে মাখিয়ে ৬-৭ ঘন্টা ফারমেন্টশন বা গাজানোর জন্য রাখতে হয়। এরপর এই গোলার সাথে বাকি উপকরণগুলো মেশাতে হয়। গরম পানির হাঁড়ির মুখে ঠিক মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা বসিয়ে হাঁড়ির মুখ ও ঢাকনার কিনারা আটা দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর একটি কাপড় ঢাকনার মুখের উপর বিছিয়ে তাতে বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত তালের গোলা ঢালতে হয়। অপর একটি ঢাকনা দিয়ে পিঠা ঢেকে দিতে হয়। ১৫-২০ মিনিট বাষ্পের তাপে সিদ্ধ করলে হলুদ রঙের ভাপা পিঠা তৈরি হয়।

চিত্র ৫.১০ তালের পুলি পিঠা

**তালের পুলি পিঠা:** পুলি পিঠার পুরের জন্য ঘন তালের গোলা ১ কাপ, পাটালি গুড় ২ কাপ , নারিকেল কোরা ৩ কাপ, সাদা তিল আধাকাপ, গুঁড়া দুধ আধাকাপ, দারুচিনি ৪ টুকরা প্রয়োজন হয়। প্রথমে গুঁড়া দুধ বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে নাড়তে হয় এবং চটচটে হয়ে আসলে চুলা থেকে নামাতে হয়। পুলি তৈরির জন্য তালের গোলা দুই কাপ, চিনি আধা কাপ ও সামান্য লবণ নিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হয়। ভালোভাবে ফুটতে থাকলে চালের গুঁড়া তিন কাপ ও ময়দা আধা কাপ দিয়ে নাড়তে হয়। চালের গুঁড়া সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ঠান্ডা হলে ২ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে ভাল করে ডলে খামির তৈরি করে ২০-২৫টি গোল বাটির মতো করে বানায়ে তার ভিতর পুর ভরে অর্ধচন্দ্রাকার করে বাটির মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর পুলিগুলো ডুবো তেলে লালচে রং হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হয়। এভাবে তালের পুলি পিঠা তৈরি করে গরম গরম পরিবেশন করা হয়।

চিত্র ৫.১১ তালের কেক

**তালের কেক:** এই কেক তৈরির জন্য তালের গোলা ৪ কাপ, চালের গুঁড়া ৪ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, খেজুরের গুঁড় ২ কাপ, চিনি ২ টেবিল চামচ বা স্বাদমত, লবণ সামান্য, ময়দা ১ কাপ, নারিকেল কোরা এক কাপ, ঘি বা তেল আধা কাপ, এলাচ গুঁড়া $\frac{১}{৪}$ চা চামচ কিশমিশ ২০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ২০ গ্রাম, বাদাম ও পেস্তা কুচি কেকের ড্রেসিং এর জন্য ২০ গ্রাম, ডিম ২টি প্রয়োজন হবে। প্রথমে তালের গোলা তৈরি করে ৬-৭ ঘন্টা গরম স্থানে ঢেকে রাখতে হয়। চালের গুঁড়া একটু ভেজে ঠান্ডা করে বেকিং পাউডার ও গুঁড়া দুধ মিশিয়ে নিতে হয়। ডিম, চিনি ও ঘি একসঙ্গে ফেটিয়ে পরে তালের গোলা, গুড়, লবণ ইত্যাদি অল্প অল্প করে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। কলাপাতা বিছানো একটি পাত্রে এবার মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হয়। ১৮০°সে. তাপে ৫০-৫৫ মিনিট তাপ দিতে হয়। ভিতরের মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে পাত্রটি বের করে মাঝখানে কাঠি দিয়ে কলা পাতা বিছিয়ে কিছু জ্বলন্ত কাঠ কয়লার আগুন দিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে হালকা আঁচে চুলার উপর রাখতে হয়। মিষ্টি সুন্দর ঘ্রাণ বের হলে বুঝতে হবে সুস্বাদু তালের কেক হয়ে গেছে। ঠান্ডা হলে স্লাইস করে পরিবেশন করা হয়। এই কেক মাইক্রোওয়েভ ওভেনেও তৈরি করা যায়। ওভেনের ক্ষেত্রে কলা পাতার পরিবর্তে অয়েল পেপার ব্যবহার করতে হয়।

চিত্র ৫.১২ তালের মালপোয়া

**তালের মালপোয়া:** মালপোয়ার জন্য তালের ঘন গোলা ৩ কাপ, ময়দা ২ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, বেকিং পাউডার আধা চা চামচ, চিনি আধা কাপ লাগবে। প্রথমে গুঁড়া দুধ ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে পরে ময়দার সঙ্গে মিশাতে হয়। এরপর ময়দার মিশ্রণ ও চিনি তালের গোলায় ভালোভাবে মিশিয়ে খামির তৈরি করে ১ ঘন্টা ঢেকে রাখতে হয়। ১ ঘণ্টা পর খামির হতে ছোট ছোট মালপোয়া তৈরি করতে হয়। কাঁচা মালপোয়াগুলো ডুবো তেলে ভেজে নিতে হয়। চিনির সিরার জন্য ৪ কাপ চিনি, ৩ কাপ পানি, ২ টুকরা দারুচিনি, ২টি ছোট এলাচ একসঙ্গে চুলায় জ্বাল দিয়ে নিতে হয়। তারপর ভাজা মালপোয়াগুলো চিনির সিরায় ১৫-২০ মিনিট রেখে অল্প সিরাসহ উঠিয়ে রাখতে হয়।

## ৫.২ নারিকেলের পরিচিতি

চিত্র ৫.১৪ নারিকেল গাছ

নারিকেল (Coconut) একটি সুস্বাদু ফল। কাঁচা অবস্থায় একে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। পাকার পর এটাকে ঝুনা নারিকেল বলা হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নারিকেল খাওয়ার প্রচলন আছে। বাংলাদেশের সর্বত্রই নারিকেল গাছ জন্মায়। তবে উপকূলীয় জেলাসমূহে বিশেষ করে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও যশোর জেলায় নারিকেলের উৎপাদন বেশি হয়। নারিকেল সাধারণত দুই প্রকার (১) লম্বা জাত ও (২) খাটো জাত। লম্বা জাতের গাছ দীর্ঘাকার ও ৮/৯ বছরে ফলবান হয় এবং ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত ফল ধরে থাকে। খাটো জাতের গাছ খাটো হয়। গাছ ৩/৪ বছরে ফলবান হয় এবং ৩০-৪০ বৎসর পর্যন্ত ফল ধরে।

**নারিকেলের ব্যবহার:** নারিকেলের পুষ্পমঞ্জুরী কচি অবস্থায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাটলে তা থেকে মিষ্টি রস বের হয়। রস থেকে গুড় ও তাড়ি তৈরি করা যায়। কচি ফল অর্থাৎ ডাবের পানি অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়। নারিকেল কোরা ও নারিকেলের দুধ দিয়ে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন তৈরি করা যায়। এছাড়া রঞ্জক ও ঔষধ তৈরির কাজে নারিকেল ব্যবহার করা হয়। এর তেল ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রদীপ জ্বালাতে এবং গ্লিসারিন ও কেশতেল তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, মাদুর প্রভৃতি তৈরি করা যায়। নারিকেলের মালা দিয়ে সক্রিয় কাঠ কয়লা (Activated carbon), বাটি, বাক্স, গহনা, বোতাম ও ঘর সাজাবার দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়। নারকেলের পাতা মাদুর তৈরি ও ঘর আচ্ছাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। পাখা, ঝুড়ি, ঝাঁটা প্রভৃতিও নারিকেল পাতা থেকে তৈরি হয়। নারিকেল গাছের বহুবিদ ব্যবহারের কারণে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে একে স্বর্গীয় গাছ বলা হয়।

## ৫.২.১ নারিকেল বীজের গঠন

নারিকেল ফল বা বীজের প্রধানত চারটি অংশ থাকে যথা- (ক) ফলত্বক (Epicarp), (খ) বীজত্বক (Endocarp), (গ) সস্য (Endosperm/Coconut meat) ও (ঘ) ভ্রূণ (Embryo)।

**ক) ফলত্বক:** নারিকেলের ফলত্বক আবার তিনটি অংশে বিভক্ত যেমন-ত্বক (Skin), এটি নারিকেলের একেবারে বাহিরের গায়ের পাতলা বাদামি স্তর। ত্বকের নিচের স্তর হচ্ছে ছোবড়া (Mesocarp)। ছোবড়ার পরের স্তর হচ্ছে নারিকেলের মালা বা খোল (Shell)। ত্বক, ছোবড়া ও খোল এই তিন স্তর মিলে ফলত্বক গঠিত।

**খ) বীজত্বক:** এটি একটি পাতলা বাদামি আবরণ। শাঁস ও খোলের মাঝে থাকে এবং শাঁসকে খোলের সাথে আটকে রাখে।

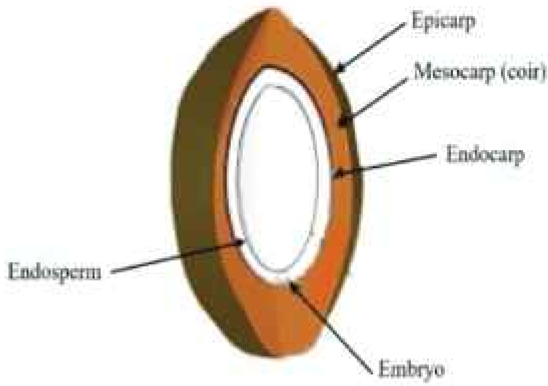


চিত্র ৫.১৫ নারিকেল বীজের গঠন

**গ) এন্ডোস্পার্ম (Endosperm):** নারিকেলের ভিতরের পুরু শাঁস ও পানিকে একত্রে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম বলে। ডাবের সস্য বা এন্ডোস্পার্ম অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। কিন্তু এই কোষগুলোতে কোন কোষপ্রাচীর থাকে না। তাই অসংখ্য নিউক্লিয়াস (কোষীয় কেন্দ্রবস্তু বা কোষকেন্দ্রক) ও সাইট্রোপ্লাজম (কোষকেন্দ্রক ব্যতীত কোষের অভ্যন্তরীণ অংশ) এর তরল একত্রে মিলে ডাবের পানি বা সস্য তৈরি হয়।

**ঘ) ভ্রূণ (Embryo):** এটি অতি ক্ষুদ্র। খোলের বোঁটার দিকে তিনটি চোখের মতো দাগ দেখা যায়। এর যে কোনো একটি চোখের নিচে ভ্রূণ অবস্থান করে। অঙ্কুরোদগমের সময় ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে শাঁসের ভিতরের গহ্বর পূর্ণ করে ফোঁপরা (Coconut apple) তৈরি করে।

## ৫.২.২ নারিকেলের (ডাব, ঝুনা, শাঁস, পানি) পুষ্টিমানঃ

ঝুকা বা ঝুনা নারিকেলের মোট ওজনের ৩৫% খোসা, ১২% মালা বা খোল, ২৮% শাঁস ও ২৫% পানি। পরাগায়নের ৪ মাস বয়স পর্যন্ত ডাবে কোনো শাঁস হয় না। এ সময়েই ডাব খাওয়ার উপযুক্ত সময়। ডাবের পানি একটি উৎকৃষ্ট পানীয়। কচি ডাবের পানিতে চিনির পরিমাণ কম থাকে। ধীরে ধীরে শাঁস গঠন শুরু হলে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ৭-৮ মাস বয়সের সময় পানিতে চিনি থাকায় তখন তা মিষ্টি লাগে। ডাবের পানিতে খাদ্য উপাদান তেমন না থাকলেও খনিজ লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ডায়রিয়া, কলেরা বা আমাশয়ের কারণে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিলে কচি ডাবের পানি পানে তা পূরণ হয় এবং শরীরে খনিজ লবণের সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। সাময়িক ক্লান্তি দূরীকরণে কচি ডাবের পানি ও শাঁস দুটোই সমান উপকারী। কচি ডাবের নরম মালায় পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিন থাকে।

**সারণি ৫.২: পাকা নারিকেলের শাঁস ও ডাবের পানির পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)**

| ক্রমিক নং | উপাদান | শাঁস | ডাবের পানি |
|---|---|---|---|
| ১ | পানি (গ্রাম) | ৪৭.০ | ৯৫.০ |
| ২ | আমিষ (গ্রাম) | ৩.৩ | ২.৩ |
| ৩ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ১৫.০ | ২.৪ |
| ৪ | স্নেহ (গ্রাম) | ৩৩.০ | ০.১ |
| ৫ | খনিজ পদার্থ (গ্রাম) | ১.৬ | ০.৩ |
| ৬ | ভিটামিন (গ্রাম) | ০.১ | সামান্য |

শাঁসে ও পানিতে ভিটামিনের পরিমাণ খুব কম, তবে প্রতি ১০০ মি.লি. পানিতে ৩০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.১ মিলি গ্রাম লৌহ, ০.০১ মিলি গ্রাম ফসফরাস ও অন্যান্য খনিজ লবন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট নারিকেলের শতকরা ৩৫-৪০ ভাগই ডাব হিসেবে খাওয়া হয়।

## ৫.২.৩ নারিকেল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য

নারিকেল গাছের ব্যবহার বহুবিধ। এর প্রতিটি অংশ মানুষের কাজে লাগে। খাদ্য, পানীয় ও নির্মাণ সামগ্রী এবং বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে নারিকেল সুপরিচিত। কাজেই নারিকেল যেমন খাদ্য তেমনই আঁশের ফসল এবং তেলবীজও বটে। নারিকেল গাছ ও ফল থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

### ক) খাদ্যদ্রব্য

- নারিকেল মাংস বা শাঁস
- নারিকেলের আমিষ ও ভোজ্য তেল
- নারিকেলের শুকনো শাঁস
- নারিকেলের ময়দা বা খৈল
- বল ও কাপ কোপরা
- শুকানো কোরা নারিকেল
- নারিকেলের পানি
- তাড়ি ও তাড়িজাত দ্রব্য

### খ) বাণিজ্যিক ও শিল্পজাত দ্রব্য

- কোপরা
- তৈল
- নারিকেল খৈল
- ছোবড়া বা Coir
- ছোবড়ার গুঁড়া

### গ) নির্মাণসামগ্রী

- পাতা
- নারিকেলের মালা
- কাঠ কয়লা (Shell Charcoal)
- মালার গুঁড়া

- নারিকেল গাছের কাঠ

**খাদ্যদ্রব্য:** নারিকেল উৎপাদনকারী দেশসমূহে নারিকেল একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে সুপরিচিত। নারিকেলের তৈরি খাদ্যপন্যগুলো নিম্নরূপ-

**নারিকেল মাংস বা শাঁস:** সুপরিপক্ব হওয়ার আগে নারিকেলের নরম শাঁস অনেকের কাছে বেশ প্রিয়। তবে শাঁস হিসেবে সাধারণত পরিপক্ব নারিকেলের শাঁসকেই ব্যবহার করা হয়। কাঁচা শাঁস থেকে বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পায়েস, নাড়ু-লাড্ডু তৈরি করা বহুল প্রচলিত। কাঁচা শাঁস থেকে দুধ পাওয়া যায় যা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সরাসরি পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৫.১৬ নারিকেলের শাঁস

**নারিকেলের দুধ:** টাটকা শাঁস নারিকেল কোরানি দিয়ে কুরে তার সাথে হালকা গরম পানি মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডিং করলে যে সাদা রস বের হয় তা ছেঁকে নিলে যে পানীয় পাওয়া যায় সেটাই নারিকেলের দুধ। ফিলিপাইনে নারিকেলের দুধ থেকে সিরাপ প্রস্তুত করা হয় যা কনফেকশনারিতে খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। দুধের মধ্যে গড়ে ৫০% পানি, ৪০% স্নেহ, ২.৫% আমিষ, ৩% শ্বেতসার, ১-২% খনিজ লবণ থাকে।

চিত্র ৫.১৭ নারিকেলের দুধ

**ডাবের পানি:** কচি ডাবের পানি দেহকে সতেজ রাখার জন্য অনেকেই খেয়ে থাকেন। বিভিন্ন রকম পেটের পীড়ায় গ্লুকোজ, স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি খুবই উপকারী। পাতলা পায়খানা বা বমির ফলে দেহে যে পরিমাণ পানি ও লবণের অভাব ঘটে তা পূরণের জন্য ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী। ঘরে তৈরি স্যালাইনের চেয়ে ডাবের পানি স্যালাইন হিসেবে অধিক কার্যকরী ।

## বাণিজ্যিক পণ্য

**কোপ্রা (Copra):** নারিকেলের আস্ত বা খণ্ডিত শুকনো শাঁসকে কোপ্রা বলে। আন্তর্জাতিক বাজারে কোপ্রা আকারেই সর্বাধিক নারিকেল বেচাকেনা করা হয়। কোপ্রা দুই ধরনের, যথা-বল কোপ্রা ও কাপ কোপ্রা। আস্ত নারিকেল বিশেষ ধরনের গুদামে রেখে ৮-১২ মাস শুকালে শাঁস শুকিয়ে সংকুচিত হয়ে খোল থেকে আলাদা হয়ে যায়। একেই বল কোপ্রা বলে। কিন্তু খোলসহ শাঁস দ্বিখন্ডিত করে রোদে বা চুল্লিতে শুকিয়ে কাপ কোপ্রা তৈরি করা যায়। কোপ্রাতে ৫-৭% পানি, ২০-২৫% আমিষ থাকে। প্রধানত: তেল উৎপাদনের জন্য কোপ্রা ব্যবহার করা হয়। তবে কুরিয়ে খাদ্য উপাদান হিসেবেও কোপ্রা ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ৫.১৮ নারিকেলের কোপ্রা

**নারিকেল তেল:** কোপ্রাকে গুড়া করে ঘানি, হাইড্রোলিক প্রেস অথবা এক্সপেলার মেশিনের সাহায্যে তেল নিষ্কাশন করা যায়। অনেক সময় দ্রাবক নিষ্কাশন (Solvent extraction) এর সাহায্যেও তেল নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দ্রাবক হিসাবে হেক্সেন, বেনজিন বা পেট্রলিয়াম ইথার ব্যবহার করা হয়। নারিকেল তেল একটি উৎকৃষ্টমানের ভোজ্যতেল হিসেবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে আমাদের দেশে রান্নার চেয়ে চুলে মাখার জন্য এ তেল বেশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সাবান, প্রসাধনী, লুব্রিকেন্ট প্রভৃতি তৈরিতেও এ তেল ব্যবহৃত হয়।

**শুকনা কোরা নারিকেল:** শাঁস কুরে শুকিয়ে এটা তৈরি করা হয়। কোপ্রার ন্যায় এটাও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। এটার প্রধান রপ্তানিকারক দেশ শ্রীলংকা ও ফিলিপাইন । এটা সরাসরি বিস্কুট ও অন্যান্য বেকারি দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কুরানোর সময় বিভিন্ন সাইজে কুরিয়ে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে প্যাকিং করা হয়।

চিত্র ৫.১৯ কুরা নারিকেল

**নারিকেল খৈল:** কোপ্রা থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের খৈল গরু ও ছাগলের উত্তম খাদ্য। এছাড়াও এ খৈল জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**ছোবড়া বা আঁশ:** নারিকেলের ছোবড়ায় আঁশ থাকে। এই আঁশের বেশ কদর রয়েছে। সাধারণত পানিতে ৮-১০ মাস ছোবড়া পচানোর পর ছোবড়া থেকে আঁশ আলাদা হয়ে যায়। এরপর ধৌত করে এবং মুগুর পিটিয়ে আঁশ বের করা হয়। পরিপক্ব ফলের আঁশ অপেক্ষা অপরিপক্ব ফলের আঁশ গুণে উৎকৃষ্ট। আঁশ দিয়ে রশি, পাপোষ, গালিচা, ব্রাশ, গদি, জাজিম ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

**নির্মাণ সামগ্রী:** নারিকেল গাছের কাণ্ড গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসাবে ও নৌকা নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়। নারিকেলের মালা থেকে হুক্কা, গহনা, চামচ, পেয়ালা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পাতা দ্বারা মাদুর তৈরি, ঘর ছাউনি ও ঝুড়ি বানানো যায়। পাতার মধ্য শিরা বা শলা দ্বারা ঝাড়ু তৈরি করা হয়। অকেজো কান্ড, পাতা, মালা, ফুলের ছড়া ইত্যাদি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

**কাঠ কয়লা:** নারিকেলের খোল বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে কয়লা তৈরি করা হয় সেটাই কাঠ কয়লা। এই কাঠ কয়লা গবেষণাগারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় । ময়লা শোষণ করে বলে এই কয়লা তেল গবেষণাগারে সাধারণত বেশি ব্যবহার করা হয়।

## নারিকেল সহযোগে তৈরি খাদ্যদ্রব্য

নারিকেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে নারিকেল হতে তৈরি কিছু খাবারের নাম দেওয়া হলো:

**সারণি ৫.৩: নারিকেল সহযোগে তৈরি খাদ্যদ্রব্য**

| ক্রমিক নং | মিষ্টি খাবার | ঝাল খাবার |
|---|---|---|
| ১ | নারিকেলের চিড়া | নারিকেল ভাত |
| ২ | নারিকেল পুলি | নারিকেল দুধে মুরগি |
| ৩ | নারিকেল পুলি ক্ষীর | নারিকেল চিংড়ি |
| ৪ | নারিকেল পুরি | নারিকেল পোলাও |
| ৫ | নারিকেল হালুয়া, বরফি | নারিকেল সবজি |
| ৬ | নারিকেল পুডিং | নারিকেল কুমড়া |
| ৭ | নারিকেল নাড়ু | শসা নারিকেল |
| ৮ | নারিকেল শন | নারিকেল ইলিশ |
| ৯ | নারিকেল প্যান কেক | নারিকেল কচু |
| ১০ | নারিকেল মিঠাই | নারিকেল দিয়ে মুগ ডাল |

## ৫.২.৪ নারিকেলের সবজি খাবার

নারিকেলের সবজি খাবার তৈরি করতে যেসব সবজি প্রয়োজন হয় সেগুলো হল- চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, ডাঁটা, চিচিঙ্গা, বরবটি, আলু ও মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

**সারণি ৫.৪: নারিকেল সবজি তৈরির উপকরণসমূহ**

| | |
|---|---|
| • কয়েকটি সবজি মিলে | ১ কেজি |
| • ছোট নারিকেল | ১টি |
| • পেঁয়াজ | ৫/৬টি |
| • তেল | ৫০ গ্রাম |
| • তেজপাতা | ২/৩টি |
| • টক দই | অর্ধেক কাপ |
| • চিনি | অর্ধেক চা টামচ |
| • লবণ | পরিমাণমতো |
| • হলুদ, মরিচ, জিরা | পরিমাণমতো |

**রান্না করার নিয়ম:** প্রয়োজনমত সবজি কেটে টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে। চুলায় আন্দাজমত পানি বসাতে হবে। পানি ফুটে উঠলে লবণ ও হলুদ পরিমাণমত দিয়ে সবজিগুলো ঐ পানিতে সিদ্ধ করে নিতে হবে। নারিকেল ভেঙে দুইটি অংশের একটির কোরার সাথে মরিচ, পেঁয়াজ ও জিরা দিয়ে আগে থেকে বেটে রাখতে হবে। বাকি নারিকেল কুরিয়ে আলাদা রাখতে হবে। সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে গেলে তাতে বাটা মসলা, টক দই, তেল ও তেজপাতা দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে। সবজি রান্না হয়ে গেলে তাতে বাকি নারিকেল কোরা যোগ করে পাত্রের মুখ ঢেকে দিয়ে চুলা হতে পাত্র নামাতে হবে।

## ৫.২.৫ নারিকেল মুরগির গ্রিল

**গ্রিল:** ইলেক্ট্রিক মেশিন বা ওভেনে সরাসরি উত্তাপে রান্না করা খাদ্যকে গ্রিল বলে। ধোঁয়াবিহীন কাঠ কয়লার আঁচেও গ্রিল করা যায়। গ্যাসের চুলার মাধ্যমেও এই গ্রিল করা যায়। সাধারণত কচি মাংস ছোট ছোট টুকরা করে এই গ্রিল রান্না করা হয়।

চিত্র ৫.২০ গ্রিল মেশিন

গ্রিল করার উপকরণ:

- মুরগি — ১টি (২৫০ গ্রাম)
- সস — ১.৫ চা চামচ
- নারিকেল দুধ — ১.৫ চা চামচ
- অস্টার সস — ০.৫ চা চামচ
- আদা পেস্ট — ০.৫ চা চামচ
- রসুন পেস্ট — ০.৫ চা চামচ
- চিনি — ১ চা চামচ
- সাদা গোলমরিচ — ০.২৫ চা চামচ
- বাটার — ০.২৫ চা চামচ
- সরিষার তেল — পরিমাণমতো

**রান্নার প্রণালি:** মুরগিকে টুকরা টুকরা করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এবার উপরোক্ত উপকরণগুলো (সরিষার তেল বাদে) টুকরা করা মাংসের সাথে ভালোভাবে মাখায়ে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট (Marinate) করতে হবে। ম্যারিনেট অর্থ মসলার সাথে মাখিয়ে বা মসলায় ডুবিয়ে রাখা। এরপর এক এক পিস মুরগির মাংস রডের সাথে গেঁথে গ্রীল মেশিনে অল্প আঁচে ৩০ মিনিট ভেজে তুলতে হবে। এভাবেই গ্রিল তৈরি হবে।

## ৫.২.৬ নারিকেলের চিড়া ও শন

**নারিকেলের চিড়া:** ২-৩ সেন্টিমিটার লম্বা করে নারিকেলের শাঁস ছুরি দিয়ে তুলে নিতে হবে। তারপর তা ধুয়ে চিকন চিকন করে ছুরি বা স্লাইসার বা কাটার দিয়ে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে ডুবো তেলে নারিকেলের ছোট ছোট পাতলা টুকরোগুলো তারের জালিতে করে বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায়। ঠাণ্ডা হলে পলিব্যাগে ভরে প্যাক করে নারিকেলের চিড়া বাজারজাত করা হবে।

চিত্র ৫.২১ নারিকেলের চিড়া

**নারিকেলের শন:** প্রথমে নারিকেল সমান দুই ভাগে ভেঙে পানি বের করে একটি পাত্রে রাখতে হবে। তারপর ছুরি বা কাটার দিয়ে নারিকেল লম্বা, বেশ সরু ও চিকন করে কোরাতে হবে। পরিমাণমত কোরানো নারিকেল কড়াইতে নিয়ে চিনি, ফুড কালার ও নারিকেলের পানি একত্রে মিশাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে রং যেন হালকা ও উজ্জ্বল হয়। মিশ্রিত দ্রব্যাদি জ্বাল দেওয়ার সময় যখন চিনি আঠালো হয়ে আসবে তখন চুলা থেকে কড়াই নামাতে হবে। দুই হাতে কাটা চামচ দিয়ে কড়াই থেকে নারিকেল তুলে ট্রেতে থোকায় থোকায় সাজাতে হবে। তারপর নারিকেলের শন রোদে শুকিয়ে পলিব্যাগে প্যাক করে বাজারজাত করা যাবে।

## ৫.২.৭ নারিকেলের নাড়ু, বরফি ও সন্দেশ

**নারিকেলের নাড়ু:** নাড়ু তৈরির জন্য বড় নারিকেল একটি, আখের গুড় বা গুঁড়া করা পাটালি গুড় ২৫০ গ্রাম, ৪টি ছোট আকারের খোসাসহ এলাচের গুঁড়া নিতে হবে। নারিকেল কোরা গুড় দিয়ে মেখে কড়াইতে জ্বালে বসাতে হবে। জ্বাল দেওয়ার একটু পরই নারিকেল থেকে দুধ বের হলে মিশ্রণগুলো চটচট করবে। ৮-১০ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর নারিকেল থেকে সুঘ্রাণ বেরোবে। তখন চুলা হতে নামিয়ে এলাচ গুঁড়া মিশাতে হবে। গরম থাকতে থাকতে হাত দিয়ে গোল করে নাড়ু পাকাতে হবে। বেশি ঝরঝরে হয়ে গেলে নাড়ু পাকানো যাবে না। তখন আরেকটু গুড় মিশিয়ে এক মিনিট জ্বাল দিলেই মিশ্রণ আবার নরম হয়ে যাবে।

চিত্র ৫.২২ নারিকেলের নাড়ু

**নারিকেলের সন্দেশ:** নারিকেল মিহি করে বাটা ২ কাপ, মাওয়া গুঁড়া (ঘিয়ে ভাজা গুঁড়া দুধ) ১ কাপ, পাটালি গুড় ১ কাপ, গুঁড়া চিনি ১ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, এলাচ গুঁড়া (খোসাসহ) আধা চা চামচ দিয়ে এই সন্দেশ তৈরি করা হয়। প্রথমে মাওয়া গুঁড়া ও গুঁড়া দুধ এক সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে হয়। গুঁড়া করা চিনি, গুড়, নারিকেল বাটা ও এলাচ দিয়ে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হয়। তারপর মাঝারি আঁচে চুলায় দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হয়। দলা বেঁধে আঠালো হয়ে আসলে মিশ্রিত মাওয়া গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চুলা থেকে নামাতে হয়। বড় ডিশে ঘি মাখিয়ে সন্দেশ ঢেলে দিয়ে আধা ইঞ্চি পুরু ও সমান করে পেস্তা বাদাম ও কিশমিশ বিছিয়ে রাখতে হয়। অল্প গরম থাকা অবস্থায় সন্দেশ বিভিন্ন আকৃতি করে কাটতে হয়।

চিত্র ৫.২৩ নারিকেলের সন্দেশ

**নারিকেল বরফি:** নারিকেল কুরিয়ে মিহি করে বেটে ২ কাপ মেপে নিতে হবে। বাঁটা নারিকেলের সাথে ২ কাপ চিনি, ১ টেবিল চামচ ঘি, ২ টেবিল চামচ চালের গুঁড়া, ময়দা বা সুজি, পরিমাণমত এলাচ গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় মৃদু আঁচে বসাতে হবে। অনেকক্ষণ মৃদু আঁচে রেখে ঘনঘন নাড়তে হবে। মিশ্রণটি আঠালো হয়ে যখন হাঁড়ির তলা ছেড়ে উঠে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে রুটি বেলার পিঁড়িতে ঢালতে হবে। আধা ইঞ্চি পুরু করে বেলে সমান করে গরম থাকা অবস্থায় বরফি কেটে নিতে হবে। ৪/৫ ঘন্টা পর ঠাণ্ডা হলে বরফি জমে যাবে এবং তখন খেতে বেশ সুস্বাদু লাগবে।

চিত্র ৫.২৪ নারিকেল বরফি

## ৫.২.৮ নারিকেল দুধ ও কচুর তরকারি

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** নারিকেল জাতের কচু ২৫০ গ্রাম, নারিকেল দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, জিরা, কাঁচা মরিচ, ধনিয়া ও সয়াবিন তেল পরিমাণমত ।

**রান্নার প্রণালি:** প্রথমে কচু ছিলে তা ছোট ছোট টুকরা করতে হবে। তারপর কড়াইতে পানি নিয়ে কচুর টুকরাগুলো চাপিয়ে দিয়ে চুলায় বসিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ৫ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর পানি ফুটে উঠলে ঐ পানি ছেঁকে ফেলে দিতে হবে। তবে অন্য কচু হলে ৩/৪ বার জ্বাল দিয়ে পানি ফেলে দিতে হয়। কড়াইতে তেল গরম করে সকল মসলা দিয়ে নাড়তে হবে। মসলা কসানো হলে তাতে কচু ও নারিকেলের দুধ যোগ করতে হবে। হালকা আঁচে রেখে দিয়ে ১৫-২০ মিনিট পর পানি কমে গেলে সুগন্ধ বের হবে। এরপর পরিবেশন করা যাবে।

## ৫.২.৯ নারিকেলের পুডিং তৈরি

**নারিকেলের পুডিং:** অর্ধেক নারিকেল কোরা, ২০০ গ্রাম চিনি, সুজি ৫০০ গ্রাম, ডিম ২টি, ২ টেবিল চামচ মাখন বা বাদাম তেল পুডিং তৈরিতে প্রয়োজন হয়। মাখন ও সুজি একত্রে মিশিয়ে ভালো করে ফেটাতে হয়। ডিমের হলুদ অংশ আলাদা করে ফেটিয়ে নিয়ে মিশাতে হয়। ডিমের সাদা অংশ একটু পানি দিয়ে খুব ফেনা করে মেশাতে হয়। তারপর ডিমের সকল মিশ্রণ মাখন-সুজির মিশ্রণের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। একই সাথে কিছু সুগন্ধি এসেন্স নিয়ে একটি চ্যাপ্টা পাত্রে মাখন বা তেল মাখিয়ে মিশ্রণ ঢেলে দিতে হয়। উপরে কিশমিশ, বাদাম সাজিয়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে আধা ঘণ্টা তাপ দিয়ে পুডিং তৈরি হয়।

## ৫.২.১০ নারিকেল চিংড়ি ও নারিকেল ইলিশ

**নারিকেল দুধে চিংড়ি**: নারিকেল চিংড়ি রান্নার জন্য বাগদা বা কিছু বড় কুচো চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, অর্ধেক নারিকেলের কুরানো অংশ, মরিচ বাটা ৩ টেবিল চামচ, ১টি বড় রসুন, ২৫ মিলিলিটার তেঁতুল গোলা, কাঁচা মরিচ ১০ গ্রাম, তেল ৩০ মিলি লিটার, লবণ, হলুদ ও কারি পাতা পরিমাণমত । প্রথমে চিংড়ি ধুয়ে নিতে হবে। রসুন ছুঁলে ছেঁচে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম হলে রসুন ও ফোঁড়ন দিয়ে হালকা রঙ ধরলে নারিকেল কোরা দিতে হবে। তেল কষে ভাজা গন্ধ বের হলে হলুদ মাখিয়ে চিংড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পরিমাণমত লবণ দিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে কম আঁচে রেখে দিতে হবে। ৫-৬ মিনিট পর কাঁচা মরিচ দিতে হবে। রস কমে এলে পরিবেশন করা যাবে।

**নারিকেল দুধে ইলিশ**: এই রান্নার জন্য ৪০০ গ্রাম ইলিশ মাছ, ১টি কাগজি লেবু, ২টি নারিকেল, ২টি বড় ও ১০টি ছোট পেঁয়াজ, ১ টুকরা আদা, ১টি শুকনা মরিচ, ১২৫ গ্রাম ঘি, ২টি কাঁচা মরিচ, ২টি ছোট এলাচ ১ টুকরা দারুচিনি ও ২টি লবঙ্গ নিতে হবে। প্রথমে ইলিশ মাছ টুকরা টুকরা করে কেটে নিতে হবে। লেবুর রস বের করে নিতে হবে। নারিকেল কোরে ২৫০ মি.লি. গরম পানিতে নিয়ে দুধ বের করে নিতে হবে। ১০টি পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কাটতে হবে। ২টি বড় পেঁয়াজ, আদা, শুকনা মরিচ, মিহি করে বেঁটে নিতে হবে। ডেকচিতে ঘি গরম করে কাঁচা মরিচ, কুচানো পেঁয়াজ ও গরম মসলা দিয়ে লালচে করে ভেজে নিয়ে লবণ দিতে হবে। তারপর বাটা মসলা দিয়ে ৫ মিনিট নেড়ে অল্প অল্প নারিকেল দুধের ছিটা দিয়ে কষাতে হবে। মসলা লাল হয়ে এলে তাতে বাকি নারিকেল দুধ ও মাছের টুকরা ঢেলে দিতে হবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে লেবুর রস যোগ করে চুলা থেকে নামাতে হবে।

## ৫.২.১১ নারিকেলের ক্যান্ডি বা চকলেট:

ক্যান্ডি প্রধানত ২ ধরনের হয়। যথা-

- শক্ত ক্যান্ডি (Hard candy)

- নরম ক্যান্ডি (Soft candy)

নরম ক্যান্ডি হচ্ছে মূলত ফ্রুট ক্যান্ডি যা বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও কন্দাল (Tuber) সবজি থেকে তৈরি ১ ধরনের শুষ্ক মিষ্টি খাদ্য। আর শক্ত ক্যান্ডি হচ্ছে শুকনো ফল/সজবি যা ফল বা সবজিকে টুকরো টুকরো করে ঘন চিনির দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে তারপর সোলার ড্রায়ার বা যান্ত্রিক ড্রায়ারে শুকায়ে তৈরি করা হয়। যদি উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিক থাকে এবং বায়ুরোধী করে সিল করা হয় তবে এই ক্যান্ডি বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজন হলে প্রিজারভেটিভ, রং ও সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়।

### নারিকেলের ক্যান্ডি তৈরির উপকরণ:

| | |
|---|---|
| ১. ভাতের মল্ট | ৫. সাইট্রিক এসিড |
| ২. গ্লুটেন | ৬. বাদাম |
| ৩. নারিকেল কোরা | ৭. র‍্যাপিং কাগজ (Wrapping paper) |
| ৪. চিনি | ৮. পলিব্যাগ |

### নারিকেল ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণ

- ভাতের মল্ট তৈরি করে নিতে হবে।
- নারিকেলের শাঁস বা কোরা পিষে দুধ বের করে নিতে হবে।
- ক্যান্ডি তৈরির জন্য ৫০ ভাগ নারিকেলের দুধ, ২৫ ভাগ চিনি ও ২৫ ভাগ ভাতের মল্ট মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে চুলায় তাপ দিয়ে দ্রবীভূত করতে হবে।
- মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামাবার পূর্বে সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।
- মিশ্রণটির সাথে পরিমাণমত বাদাম (পাউডার বা বাটা) যোগ করে সমসত্ব মিশ্রণ তৈরির জন্য পুনরায় জ্বাল দিতে হবে।
- মিশ্রণটি নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ক্যান্ডি তৈরির মোল্ড বা খাঁজে রেখে উপরিভাগ মসৃণ করতে হবে।
- ছুরি দিয়ে ২২ সেন্টিমিটার আকারে কেটে র‍্যাপিং কাগজে মুড়িয়ে পলিইথিলিন ব্যাগে স্বাভাবিক তাপে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত ক্যান্ডি ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র ৫.২৫ নারিকেল ক্যান্ডি

## ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

### জব নং-০১

১। জবের নাম: **তালের জ্যাম প্রস্তুতকরণ**

২। পারদর্শিতার মানদন্ড

১.১ কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করবে।

১.২কাজের জায়গা প্রস্তুত করবে।

১.৩ কাজের চাহিদা অনুয়ায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।

১.৫ তালের খোসা হাত দিয়ে টেনে তুলে রস বের করবে।

১.৬ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে তালের রস হতে জ্যাম তৈরি করবে।

১.৭ জীবাণুমুক্ত বোতলে জ্যাম ঢেলে ঠান্ডা হওয়ার পর মোম গলিয়ে দিয়ে ছিপি এঁটে দিবে।

১.৮ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।

১.৯ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

১.১০ কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক

উপকরণ

| | |
|---|---|
| তালের গোলা | ১ লিটার |
| চিনি | ১ কেজি |
| পেকটিন | ১১.৫ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড | ১২.৫ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজোয়েট | ১ গ্রাম |
| কড়াই ও চালুনি | |
| চামচ ও পাতলা সুতি কাপড় | |
| রিফ্রাক্টোমিটার | |
| কাঁচের বোতল | |

## ৪। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ  ওজন করতে হবে।
- গাছপাকা, পরিপুষ্ট, তাল সংগ্রহ করতে হবে।
- তাল শক্ত হলে ২-৩ দিন রেখে নরম করে নিতে হবে।
- তালের খোসা হাত দিয়ে টেনে তুলে নিতে হবে ।
- তালের কোয়া শক্ত হলে একটু পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে।
- একটি বড় পাত্রে তাল নিয়ে হাত দিয়ে কচলে তালের আঁটি হতে রস আলাদা করতে হবে।
- সবগুলো কোয়া কচলানো শেষ হলে চালুনি দিয়ে চেলে আঁশ  আলাদা করতে হবে।
- তালের গোলা একটি পাতলা কাপড়ে ভরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ৪/৫ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখলে সমস্ত তিতা কষ ঝরে গিয়ে গোলা মিষ্টি হয়ে যাবে।
- গোলার সাথে চিনি যোগ করে জ্বাল দিতে হবে।
- রান্নার মাঝামাঝি পর্যায়ে পেকটিন যোগ করতে হবে। এরপর দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের (Total Soluble Solids বা টিএসএস) পরিমাণ কমপক্ষে ৬৫% না হওয়া পর্যন্ত চুলায় জ্বাল দিতে হবে।
- দ্রবণের টিএসএস রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে শীটিং পরীক্ষা করতে হবে।
- শীটিং পরীক্ষা হলো- মিশ্রণের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে মিশ্রণ নিয়ে ঠান্ডা করে চামচ বেয়ে পড়তে দিতে হবে। যদি মিশ্রণটি একাধারে না পড়ে শীটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি হয়েছে। জ্যাম তৈরি হলে সাইট্রিক এসিডের  দ্রবণ ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে ।
- মিশ্রণ ঘন হয়ে এলেই অল্প পরিমাণ পানিতে সোডিয়াম বেনজোয়েট গুলিয়ে মিশ্রণে যোগ করে চুলা হতে নামাতে হবে।
- জ্যাম জীবাণুমুক্ত বোতলে ঢালতে হবে।
- ঠান্ডা হওয়ার পর মোম গলিয়ে জ্যাম ঢেকে দিতে হবে এবং ছিপি এঁটে দিতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৫। বিশেষ নির্দেশনা

- রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শীটিং পরীক্ষা করতে হবে।
- তালের গোলা হতে তিতা কষ অবশ্যই বের করে নিতে হবে।
- জবটি সাতবার করতে হবে।

## জব নং-০২

১। জবের নাম: **তালের জিলাপি প্রস্তুতকরণ**

২। পারদর্শিতার মানদণ্ড:

২.১ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস্ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.২ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।

২.৩ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে তালের জিলাপি তৈরি করবে।

২.৪ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।

২.৫ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি )

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক

উপকরণ

| | |
|---|---|
| • ঘন তালের গোলা | ২ কাপ |
| • দুধ | ২ লিটার |
| • ছানা | ১ কাপ |
| • ময়দা | ৩ টিবিল চামচ |
| • চিনি | ২ টেবিল চামচ |
| • ঘি | ২ টেবিল চামচ |
| • এলাচ গুঁড়া | সামান্য |
| • বেকিং পাউডার | সামান্য |
| • সিরার জন্য চিনি | ৫ কাপ |
| • পানি | ৬ কাপ |
| • গুঁড়া দুধ | ২ টেবিল চামচ |

৪। **কাজের ধারা**

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।

- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করতে হবে।
- চিনি ও পানি একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে গাদ কাটিয়ে এবং গুঁড়া দুধ মিশিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে রাখতে হবে।
- তরল দুধ জ্বাল দিয়ে নেড়েচেড়ে ঘন করে নিতে হবে।
- ময়দা, ঘি ও বেকিং পাউডার ২ টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে রাখতে হবে।
- ছানা হাতের তালু দিয়ে মসৃণ করে ডলে এবং পূর্বে রাখা তালের গোলা, এলাচ গুঁড়া ও বাদাম দেওয়া ময়দা সব একসঙ্গে মাখিয়ে জিলাপির আকার করে নিতে হবে।
- তেল দুই কাপ ও ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে গরম চুলায় কম আঁচে জিলাপির লাল রং করে ভেজে সিরায় ছাড়তে হবে।
- সব জিলাপি সিরায় দেয়ার পর চুলায় ২০-২৫ মিনিট ফুটিয়ে তারপর ৫-৬ ঘন্টা সিরায় ডুবিয়ে রাখতে হবে।
- সিরা থেকে উঠিয়ে পরিবেশন করতে হবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। বিশেষ নির্দেশনা

- জবটি ছয়বার করতে হবে।

## জব নং-০৩

১। জবের নাম: **নারিকেলের দুধ প্রস্তুতকরণ**

২। পারদর্শিতার মানদন্ড:

৩.১ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস্ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৩.২ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।
৩.৩ ছোবড়া পরিষ্কার করে নারিকেল ভেঙে ভিতরের পানি সংগ্রহ করবে।
৩.৪ নারিকেল কোরানি দিয়ে কুরিয়ে সংরক্ষণ করবে।
৩.৫ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে নারিকেলের দুধ তৈরি করবে।
৩.৬ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।
৩.৭ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ

- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক

উপকরণ

ঝুনা নারিকেল, কোরানি, ব্লেন্ডার, প্লেট, সসপ্যান, ছাঁকন বা ছাঁকার কাপড়, পানি, গ্লাস, দা ইত্যাদি।

## ৪। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস্ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করতে হবে।
- উন্নতমানের বড় আকারের একটি ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করতে হবে।
- দা বা বঁটি দিয়ে নারিকেলের ছোবড়া ভালো করে তুলে ফেলতে হবে।
- দা দিয়ে নারিকেল ভেঙে ভিতরের পানি সংগ্রহ করতে হবে।
- নারিকেল দ্বিখন্ডিত হলে প্রতিটি খন্ড নারিকেল কোরানি দিয়ে কুরিয়ে একটি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- একটি সসপ্যানে পানি হালকা গরম করে সমস্ত নারিকেল কোরা ঢেলে দিতে হবে।
- ভালো করে কুরানো নারিকেল হাত দিয়ে কচলে অথবা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডিং করতে হবে এবং পূর্বের সংগ্রহকৃত নারিকেল পানিতে মিশাতে হবে।
- কিছুক্ষণ পর ছাঁকনি বা ছাঁকার কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ মিশ্রণটিকে ছেঁকে নিতে হবে।
- জগে সম্পূর্ণ নারিকেলের ছাঁকা দুধ নিয়ে তার সাথে পরিমাণমতো চিনি, এসেন্স ও কালার দিয়ে সুস্বাদু পানীয় তৈরি করা যেতে পারে।
- নারিকেলের পরিস্রুত সাদা দুধ দিয়ে বিভিন্ন খাদ্য রান্না করে খাদ্যকে আকর্ষণীয় ও উপাদেয় করা যায়।
- ছাঁকার পর যে অংশটুকু থেকে যাবে তা দিয়ে বিভিন্ন পিঠা, বিস্কুট বা কেক তৈরি করা যাবে।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৫। বিশেষ নির্দেশনা

- নারিকেলের দুধ বের করার জন্য পানি কুসুম গরম হতে হবে।
- শাঁস পুরু ও পরিপক্ব হলে দুধ বেশি পরিমাণ ও ঘন হবে।
- জবটি ছয়বার করতে হবে।

## জব নং-০৪

১। জবের নাম: **নারিকেলের নাড়ু প্রস্তুতকরণ**

২। পারদর্শিতার মানদন্ড

৪.১ কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস্ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

৪.২ প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করবে।

৪.৩ ছোবড়া পরিষ্কার করে নারিকেল ভেঙে নারিকেল কোরানি দিয়ে কুরিয়ে নিবে।

৪.৪ কোরানি নারিকেলে গুড় মেখে নিবে।

৪.৫ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত প্রণালি অনুসারে নারিকেলের নাড়ু তৈরি করবে।

৪.৬ অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে ।

৪.৭ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি)

- হ্যান্ড গ্লাভস
- সেফটি অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি সুজ
- হেয়ার নেট
- সেফটি/প্রটেকটিভ মাস্ক

### উপকরণ

নারিকেল, দা বা বঁটি, কোরানি, চিনি বা পাটালি গুড়, এলাচ, কড়াই ইত্যাদি।

### ৪। কাজের ধারা

- কার্যস্থানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম *(PPE-Personal Protective Equipment)* পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।
- কাজের জায়গা প্রস্তুত করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী টুলস্ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ, পরিমাপ ও ওজন করতে হবে।
- উন্নতমানের বড় আকারের একটি ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করতে হবে।
- দা বা বঁটি দিয়ে নারিকেলের ছোবড়া ভালো করে তুলে ফেলতে হবে।
- দা দিয়ে নারিকেল ভেঙে দ্বিখন্ডিত হলে প্রতিটি খন্ড নারিকেল কোরানি দিয়ে কুরিয়ে একটি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

- এরপর গুড় মেখে নিতে হবে।
- কড়াই চুলায় বসিয়ে গুড় মাখানো নারিকেল জ্বাল দিতে হবে।
- নারিকেল হতে তেল বের হয়ে গুড় গলে যাবে।
- মিনিট দশেক জ্বাল দেবার পর নারিকেলের সুগন্ধ বের হলে কড়াই থেকে নামাতে হবে।
- নামাবার পূর্বে এলাচ গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে।
- গরম থাকতে থাকতে নাড়ু পাকাতে হবে।
- বেশি শুকিয়ে গেলে আবার একটু গুড় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- নাড়ু চিনি দিয়েও করা যায়।
- অব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী টুলস্/ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ৫। বিশেষ নির্দেশনা

- কড়াইয়ের জ্বাল শেষের দিকে কম আঁচে রাখতে হবে।
- পাটালি গুঁড় দিয়ে করলে নাড়ুর রং সুন্দর হবে।
- জবটি সাতবার করতে হবে।

## অনুশীলনী-০৫

## অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাল সাধারণত কোন মাসে পাকে?
২. তালের শাঁস থেকে কী তৈরি করা যায়?
৩. তাল মিছরি কী?
৪. তালের গোলা কতক্ষণ চালুনির উপর রাখলে কষ চলে যায়?
৫. তালের জ্যাম তৈরির কোন সময় পেকটিন যোগ করতে হয়?
৬. জেলিতে শতকরা কত ভাগ ফলের রস থাকে?
৭. জেলিতে প্রিজারভেটিভ হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?
৮. তালের মালপোয়া চিনির সিরায় কত মিনিট রাখতে হয়?
৯. কোন অংশকে নারিকেলের সস্য বলে?
১০. কখন ডাবের পানি মিষ্টি হয়?
১১. ডাবের পানি কোন ঔষধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
১২. নারিকেলের কোপ্রা কী?
১৩. ম্যারিনেট অর্থ কী?
১৪. নাড়ু পাকানোর সময় জ্বালানো নারিকেল মিশ্রণ শুকিয়ে গেলে কি করতে হয়?

১৭. ক্যান্ডি কত প্রকার ও কী কী?

১৮. শক্ত ক্যান্ডি কাকে বলে?

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাল মিছরি কী কাজে লাগে?

২. তালের তৈরি বিভিন্ন খাদ্যের নাম লেখ।

৩. চিত্র এঁকে নারিকেল বীজের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দেখাও।

৪. কোপ্রা এর পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

৫. নারিকেলের তৈরি ঝাল ও মিষ্টি খাবারের নাম লেখ।

৬. নারিকেল দিয়ে মুরগির গ্রিল তৈরিতে কী কী উপকরণ লাগে?

৭. তাল মিছরির উপকারিতা কি?

৮. ডাবের পানি দ্বারা শরীরের কোন কোন রোগ নিরাময় হয়?

৯. নারিকেল থেকে কী কী খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়?

১০. নারিকেল সহযোগে তৈরি কয়েকটি মিষ্টি খাবারের নাম লেখ।

১১. ক্যান্ডি তৈরির মিশ্রণে নারিকেল দুধ, চিনি ও ভাতের মন্ডের অনুপাত কত?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. তালের গোলা কীভাবে তৈরি করা হয়? তালের বড়া তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. তালের মালপোয়া ও রোল তৈরির প্রণালি লেখ।

৩. তাল থেকে জ্যাম ও জেলি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. তালের জিলাপি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. তালের ভাপা পিঠা ও কেক তৈরির প্রণালি লেখ।

৬. নারিকেল দিয়ে মুরগির গ্রিল ও নারিকেল সবজি তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

৭. নারিকেলের হতে চিড়া, নাড়ু, বরফি ও সন্দেশ তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

৮. নারিকেল হতে ক্যান্ডি তৈরির প্রণালি লেখ।

২০২৪

# সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি


- এগ্রোবেসড ফুড-১ ও ২ কৃষিবিদ মো. মোসারফ হোসেন, ২০২১
- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ- মো. আব্দুর রাজ্জাক
- ফুড প্রিজারভেশন- মো. আবু আবদুল্লাহ, বিটিইবি
- ফুড মাইক্রোবায়োলজি- মো. আবু আবদুল্লাহ, বিটিইবি
- ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ- মো. আব্দুর রাজ্জাক
- Snack Food- R. Gordon Booth
- রান্না খাদ্য পুষ্টি - অধ্যাপিকা সিদ্দিকা কবির
- ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ-১ এ এম জহিরুল ইসলাম, হক পাবলিকেশনস্-ঢাকা।
- ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ-২ এ এম জহিরুল ইসলাম, হক পাবলিকেশনস্-ঢাকা।
- ফুড কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাশুরেন্স- এ এম জহিরুল ইসলাম, হক পাবলিকেশনস্-ঢাকা।
- ফুড প্রিজারভেশন-১ সুরেশ চন্দ্র মন্ডল, হক পাবলিকেশনস্-ঢাকা।
- কৃষি তথ্য সার্ভিস- এ আই এস
- কৃষি প্রযুক্তি হাত বই- বারি- ২০০৫
- প্রতিষ্ঠিত আর্টিক্যাল ও জার্নাল- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
- ইন্টারনেট/Internet etc.
- সয়াবিন থেকে খাবার তৈরি- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
- বাংলাদেশে মুগ ডাল চাষ- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
- বাংলাদেশে মাষকলাইয়ের চাষ- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
- বাংলাদেশে তেলবীজ ফসলের চাষাবাদ- মানিকলাল দাশ
- খাদ্য ও পুষ্টি- দে এবং বসু, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ভারত
- বাংলাদেশে খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল- মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস
- মাশরুম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল- মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী, ঢাকা
- আখ চাষ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা- অর্থকরী ফসল, ডিএই
- মসলা জাতীয় ফসল- কৃষিবিদ মোসারফ হোসেন
- মসলার চাষ- মৃত্যুঞ্জয় রায়
- খাদ্যভিত্তিক পুষ্ট প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল-বারটান, ঢাকা
- বাংলাদেশে ভুট্টা উৎপাদন ও ব্যবহার-বারি (বি.এ.আর.আই), গাজীপুর
- ভুট্টা মানে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ- মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
- বিধাতার দান আলু-কামাল উদ্দিন আহমেদ ও বেগম মমতাজ কামাল
- বাঙ্গালীর সেরা রান্না-সুবর্ণা চৌধুরী
- নারিকেল উৎপাদন ও ব্যবহার- কৃষিবিদ গিয়াস উদ্দিন
- বাংলাদেশের গুদামজাত শস্যের অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ- মোহাম্মদ হোসেন
- গম বীজ ও উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা-বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
- কৃষিকথা, কার্তিক-১৪১৬ সংখ্যা
- খাদ্য প্রক্রিয়জাতকরণ-১ (কৃষি ডিপ্লোমা)- মোঃ মোসারফ হোসেন, হক পাবলিকেশন্স, ঢাকা ।
- খাদ্য রান্না ও স্বাদ রহস্য- এইচ.এম. সোলায়মান
- Oil seeds in Bangladesh – A.K Kaul and M.L Das
- Bangladesh Sugar crop Knowledge Bank (মিষ্টি জাতীয় ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার)
- বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ
- The Agro News
- ডিএমপি নিউজ
- Nutrition Bee


সমাপ্ত

কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্ণফুলী টানেল বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

এগ্রোবেসড ফুড-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

| |
|---|
| তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন |
| নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন |

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য